আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ও আমি

”বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন”

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

বড় বেদনা ছাড়া কি বড় কাজ হয়? বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের জর্নালে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছিলেন, 'কেন্দ্রের ভবনের ইটের দেয়ালগুলোকে আমরা কোনোদিন প্লাস্টার করব না। এই কেন্দ্র যে একদিন আমাদের রক্ত দিয়ে তৈরি হয়েছিল—এই ইটগুলো তার সাক্ষী হয়ে থাক।'

ইট তো ক্ষয়ে যাবে, কিন্তু সুলিখিতভাবে ধরে রাখা গেলে একটি বড় স্বপ্ন ও সংগঠনের চলমান ইতিহাসটি টিকে যেতে পারে কালের আক্রমণ অগ্রাহ্য করে। সেই কাজটি নানাভাবেই করে যাচ্ছিলেন এ-সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ—জর্নাল লিখে, সাক্ষাৎকার দিয়ে, নানা জায়গায় নানা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করে। এমনকি কেন্দ্রের পরিচিতিপত্র, ঘোষণাপত্রের মধ্যেও রয়ে গেছে এই কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠাপুরুষের স্বপ্ন ও ভাবনার বিবরণ। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কথা, লেখা, ভাবনা ও সক্রিয়তার সমাবেশ এই গ্রন্থ।

একবার পড়তে শুরু করলে আর থামা যায় না। এই বইয়ে একই সঙ্গে পাওয়া যাবে অসাধারণ কথক ও বাগ্মীর বিস্তার করা সম্মোহনী জাল, একজন স্বপ্নবান মানুষের উদ্দীপনাসঞ্চারী চিন্তা, এক বেদনার্ত প্রেমিক-হৃদয়ের গোপন রক্তক্ষরণের বিবরণ। এই বইয়ের মূল্যবান সম্পদ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের চমৎকার ভাষাশৈলী যা একই সঙ্গে মননশীল, ঋজু, প্রসাদগুণময় এবং হাস্যরসদীপ্ত!

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সম্পর্কে তাঁর ভেতর-বাহিরের পুরোটা বিবরণের জন্যে এই বই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কেন্দ্র বিষয়ে অনুৎসাহিত পাঠকও বইটি পড়ে ঋদ্ধ হতে পারবেন জীবন, সময়, স্বদেশ ও জগৎ নিয়ে এই চিন্তাবিদের বিচিত্রগামী ভাবনার আলোয় আলোকিত হয়ে। এই বই একই সঙ্গে ব্যক্তিগত, সাংগঠনিক ও সর্বজনীন।

আনিসুল হক

প্রকাশনার ছয় দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখক
প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৩
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫২২৭ ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowla@accesstel.net

প্রচ্ছদ
দীপক রায়ের স্কেচ অবলম্বনে
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
ময়মনসিংহ রোড ঢাকা

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৩৪ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা ১১০০

দাম
তিনশত টাকা মাত্র

ISBN 984 410 546 3

BISHWASAHITYA KENDRA O AMI (A Memoirs) by Abdullah Abu Sayeed. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Dhruba Esh. Price : Taka Three Hundred only.

উৎসর্গ
দুঃখযাত্রার সহযাত্রীদের

ভূমিকা

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে একটু একটু করে, অনেক দিনে। এই দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মুখে যেসব অনুভূতি নানা সময় মনকে উথালপাতাল করেছে তার কিছু কিছু ভাবনা আমি সুযোগ-সুবিধামতো জর্নাল আকারে লিখে রেখেছিলাম। আজ লক্ষ্য করছি এগুলোর সংখ্যা কম নয়—বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য বোঝার ব্যাপারে এগুলো সাহায্যে আসতে পারে।

এছাড়াও নানা সময়ে বেশ কিছু সাক্ষাৎকারও আমাকে দিতে হয়েছে কেন্দ্রের ওপর। এগুলো দিয়েছি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। এদের অধিকাংশই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, যেগুলো করেছিলাম তার অনেকগুলো আবার হারিয়েও গেছে। এগুলোর মধ্যেও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সম্বন্ধে আমার বেশ কিছু ভাবনা আছে ।

বহু বছর ধরে নানা অনুষ্ঠানে হাজারো বিষয়ের ওপর আমি বক্তৃতা করেছি। এসবের মধ্যে কিছু কিছু বক্তৃতা কখনো কখনো টেপ করা হয়েছিল। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বিভিন্ন কর্মসূচি ও পাঠচক্রের উদ্বোধন বা পুরস্কার, বিতরণী অনুষ্ঠানে দেওয়া গোটাকয় বক্তৃতা এগুলোর মধ্যে রয়েছে। এগুলোর মধ্যেও কেন্দ্র সম্বন্ধে আমার বেশ কিছু ব্যক্তিগত অনুভূতি আমি বলেছি।

মোটামুটিভাবে এ ধরনের কিছু লেখা নিয়েই এ বই। লেখাগুলোর ভেতর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মূল ভাবনার একটা অস্ফুট রূপরেখা রয়েছে বলে মনে করি। তবে তার চেয়েও বেশি যা রয়েছে তা হল এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-সাধের কথাবার্তা।

চারপাশের অনেক প্রতিষ্ঠানের মতো আমাদের প্রতিষ্ঠানের ধারণাটা খুব একটা বাস্তব বা চক্ষুগ্রাহ্য নয়। তাই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ধারণাকে ঘিরে একটা বিমূর্ত ব্যাপার আছে। মানুষের আত্মিক বিকাশ একটা অস্ফুট রহস্যময় ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। আমার কাজ করছি সেই ব্যাখ্যাতীত ও অবাস্তব বিষয় নিয়ে। উন্নত হাঁস মুরগি বা গবাদিপশুর ব্যাপার হলে বিষয়টা অত কঠিন হত না। কিন্তু মানুষের চেতনার সমৃদ্ধি অত বাস্তব বা স্পর্শগ্রাহ্য ব্যাপার নয়। রাতারাতি এ ঘটিয়ে ফেলার উপায়ও নেই। আলোকিত মানুষ কী, একী কোনো স্বপ্নের না বাস্তবের নাম, কেন আমরা তাদের খুঁজছি, জাতীয় ভিত্তিতে তাদের স্ফুরণ ঘটানো আদৌ কি সম্ভব, জাতীয় ক্ষেত্রে কী ভূমিকা তারা রাখবে—এসব ধাঁধা-জাতীয় প্রশ্নের জবাব দেওয়া

সোজা নয়। এমন একটা বিমূর্ত চিন্তাকে প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে গেলে আরও হতবুদ্ধিকর অবস্থায় পড়ার কথা। আমরা তা পড়েছিও। মানুষকে ব্যাপারটা বোঝাতে না পারায় প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে অসম্ভব অসুবিধা হয়েছে। তবে সুখের কথা দেশের মানুষ একটু একটু করে আমাদের আজ বুঝতে পারছে। অন্তত এটুকু বুঝছে, এ কোনো অলীক বা অবাস্তব কল্পনা নয়। এ একটা বাস্তব ও মূর্ত জিনিশ এবং জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের জায়গায় এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের যুগে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জেগে উঠেছে। বহু বেদনাবিদ্ধ মানুষ নানাপথে এই জাতির সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ অন্বেষণ করছেন। আমরা এর মুক্তির কথা ভেবেছি আলোকিত মানুষের জন্মের ভেতর দিয়ে। আমাদের কাজের সাফল্য ব্যর্থতাকে আমি গুরুত্ব দিই না। আমি শুধু এর স্বপ্নের অভ্রান্ততায় নিশ্চিত হতে চাই। এ স্বপ্নে যদি ভুল না থাকে তবে আমাদের পরেও এই আলোকায়নের বর্তিকা জাতি নিজের দরকারেই বহন করবে এমন কথা আমি ভাবি।

আমরা এই জাতির দারিদ্র্য নিঃস্বতা আর অপ্রতুল সম্পদের ভেতর থেকে সম্পূর্ণ একটি দেশজ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেগে উঠতে চেষ্টা করেছি। দীর্ঘ একুশ বছর আমরা এগিয়েছি পুরো বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া, কেবল সমাজের সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে। এখন বৈদেশিক সাহায্য সাময়িকভাবে নিলেও এর পরিমাণ সীমিত এবং খুব অল্পকালের জন্যই আমরা তা নেব। দাতাসংস্থাহীনভাবে কেবল দেশের সম্পদের ওপর নির্ভর করায় আর্থিক সংকট আমাদের অগ্রগতি পিছিয়ে দিয়েছে। তবে এ জন্যে অন্তত আমার হতাশা নেই। এতে প্রতিষ্ঠানের সচ্ছলতা আসেনি, কিন্তু চরিত্র তৈরি হয়েছে। আমাদের কর্মীদের চরিত্রশীল অস্থি-ই এ প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা।

এ বই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অগ্রযাত্রার গল্প নয়, নিতান্তই বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত কিছু ভাবনার সমষ্টি। কেন্দ্রের দুঃখযাত্রার পুরো গল্প নিয়ে একটা বই লেখার ইচ্ছা আছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী একুশের বইমেলায় বইটি উপস্থিত করার চেষ্টা করব।

বইয়ের পরিশিষ্ট অংশে শ্রী শঙ্খ ঘোষ, জনাব আবেদ খান ও জনাব আনিসুল হকের একটি করে লেখা সংযোজিত হয়েছে। লেখাগুলো বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ওপর রচিত বলে এবং আমার ভাবনা ও আমার সঙ্গে কথোপকথনের ভিত্তিতে লেখা বলে এগুলোকে এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ঢাকা
১.২.২০০৭

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

সূ চি প ত্র

সূচনা ১১

জ র্না ল ১১
কেন্দ্রের মূল ভাবনা ১৭
কেন্দ্রের ভাবনা ও আমি ৫৪
ব্যক্তিগত ভাবনা ৭৬
কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথোপকথন ৮৫
কেন্দ্রের সংগঠক ৯৩

সা ক্ষা ৎ কা র
আলোকিত মানুষের স্বপ্নদ্রষ্টা ১০১
আলোকিত মানুষ ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১১৪
সাহিত্যজীবন ও শিল্প ১২৫
কেন্দ্রের টুকিটাকি ১২৬
সর্বাঙ্গীণ জীবন-পরিবেশ ১২৮
কেন্দ্রের প্রতিটি অঙ্গনে যোগ্য মানুষ ১৩২
আনন্দময় মিলনকেন্দ্র ১৩৫
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে ১৩৭
আগ্রাসী লাইব্রেরি আন্দোলন ১৪৩
সমাজ ও রাজনীতি ১৪৭
শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা থেকেই জেগে উঠেছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৫০
বিচিত্র প্রসঙ্গ ১৫২
পাক্ষিক প্রকৃতি ১৫৫

ব ক্তৃ তা
চাই বড় মন, বৃহতের সংস্পর্শ ১৫৯
সম্পূর্ণতর জীবনে বাঁচো ১৭৪
লাইসেন্স দিয়ে বাঘ মারা ১৮১
ব্রাহ্মণের বাড়ির কাকাতুয়া ১৮৭
একটুখানি পাশ দিয়ে ১৯৯
ছোট একটু সোনালি স্পর্শ ২১০
নানা প্রসঙ্গ ২১৫
আমগাছের তলার অবসর ২২২
বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে কিছু কথা ২২৯
চাই স্বপ্নে-ভরা আনন্দময় শৈশব ২৩৫
চাই মহৎ পাগল ২৪২
চলো আলোর দিকে, সৌন্দর্যের দিকে ২৪৬

রূ প রে খা [কেন্দ্রের পরিচিতি] ২৫৫

প রি শি ষ্ট
একলক্ষ আলো হাতে
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ২৭২
প্রবাসী আনন্দবাজার থেকে ২৮১
স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয় ২৮৫

সূচনা

১. কেন্দ্র-প্রকাশিত প্রথম পরিচিতি-পত্রিকা থেকে

গত কয়েক দশকে আমাদের মূল্যবোধ ও শিক্ষার অঙ্গনে যে-ব্যাপক অধঃপতন ঘটেছে, তা আমাদের জাতির ভবিষ্যৎকে এক ভয়াবহ শূন্যতার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। প্রকৃত অর্থে উচ্চমূল্যবোধসম্পন্ন, আলোকিত, শক্তিমান ও সংগ্রামী মানুষ আমাদের সমাজ থেকে-যে শুধু বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তা-ই নয়, এই সার্বিক কালো রাহুগ্রাসের ভেতর আমাদের জাতীয় সৃজনশীলতার পুনরুজ্জীবনও আজ অনেকখানি তমসাচ্ছন্ন। তাছাড়া এই অধঃপতিত সময়ে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিকনির্দেশক হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন এমন মানুষের বিকাশও এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রও আজ প্রায় একই রকম হতাশা ও নৈরাজ্যের শিকার। সব ক্ষেত্রেই গত কয়েক দশকে শিক্ষা, জ্ঞান ও মেধার অধিকারী মানুষের সংখ্যা ভয়াবহভাবে হ্রাস পেয়েছে। যে-দুয়েকটি কম্পমান ক্ষীণ দীপশিখা এখনো চারপাশের ব্যাপক অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে বেঁচে আছে তাঁদের নীরব হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্গন শূন্য ও নীরক্ত হয়ে আসবে। বলা বাহুল্য, এমন একটি দুঃখজনক অন্ধকারকে প্রতিবাদহীনভাবে মেনে নেয়া অপরাধ। এই আশঙ্কিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে, অবিলম্বে উচ্চশিক্ষা এবং মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন, কার্যকর, শক্তিমান এবং সংশপ্তক মানুষ সৃষ্টির পরিবেশ তৈরি করে এই শূন্যতার আশু মোকাবিলা না করলে আমাদের দেশ ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন অরাজকতার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারে।

এই সার্বিক অবক্ষয়ের মুখে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথার্থ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম এমন উচ্চচেতনাসম্পন্ন, সংগ্রামী ও আলোকিত মানুষ উপহার দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র' নামে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। সেইসঙ্গে আমাদের আরও একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। এই কেন্দ্রটিকে গড়ে তোলা

হচ্ছে একটি সম্পন্ন মিলনকেন্দ্র হিসেবে—বিশ্বসংস্কৃতির বহতা হওয়ার উজ্জীবিত এবং শিল্প ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উজ্জ্বল ব্যক্তিবর্গের নিরন্তর সম্মিলন ও সাহচর্যে উন্মুখর একটি স্থান হিশেবে। এককথায় যাঁরা সংস্কৃতিবান, রুচিশীল, ঋদ্ধ মানুষ—যাঁরা অনুসন্ধিৎসু, সৌন্দর্যপ্রবণ, সত্যান্বেষী; যাঁরা জ্ঞানার্থী, সক্রিয়, সৃজনশীল; বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তাঁদের পদপাতে, মানসবাণিজ্যে, বন্ধুতায়, ঋজুতায় সচকিত একটি অঙ্গন।

- বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কোনো গৎ-বাঁধা ছক-কাটা প্রাণহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি সপ্রাণ সজীব পরিবেশ—জ্ঞান ও জীবন-সংগ্রামের আনন্দ-দ্বৈরথে নিরন্তর অবগাহন সেরে সম্পূর্ণতর মনুষ্যত্বে ও উন্নততর আনন্দে জেগে ওঠার এক অবারিত পৃথিবী।
- আজকের স্বদেশ ও স্বজাতির এক চরম সংকট মোকাবিলা করার জন্যেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। শুধুমাত্র তাঁরাই এখানে আমন্ত্রিত যাঁরা তাঁদের শ্রম, ত্যাগ ও প্রতিভার কষ্টার্জিত ফসলকে জাতির জন্যে উৎসর্গ করতে সংকল্পবদ্ধ। ব্যক্তিস্বার্থে উদ্বুদ্ধ সুবিধাবাদ এখানে অবাঞ্ছিত।

  আমাদের জাতি আজ দুঃখী ও নিঃস্ব। এই জাতি তার উদ্ধার ও সার্থকতার জন্যে আপনার আত্মোৎসর্গের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এসে আপনি আপনার সহজাত ধী ও প্রতিভাকে বিকাশের উচ্চপর্যায়ে উন্নীত করে তার ফসল আপনার দেশকে দিন—যেদিক থেকে, যে-ক্ষেত্র থেকে সম্ভব।
- নিতান্ত অসম্পূর্ণ আয়োজনে, সীমিত পরিসরে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সূচনা। হয়তো একদিন, পূর্ণতররূপে বিকশিত হয়ে, এই কেন্দ্র সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে দাঁড়াবে; অথবা হয়তো ঝরে যাবে—যেমন ঝরে যায় বসন্তেরই অসংখ্য অচেনা আগন্তুক ফুল—চারপাশের রক্তিম মদির বসন্ত-উৎসবের নীরব একপাশে। ভবিতব্য কী লিখেছে তা নিয়ে অহেতুক কপোল মেঘলা করে লাভ নেই। আমরা শুধু কাজ করেই যেতে পারি—লাভালাভের ঊর্ধ্বে, একাগ্র, পরাভবহীন—শুধুমাত্র কাজই কেবল।

১৯৮২

২. কেন্দ্র-প্রকাশিত দ্বিতীয় পরিচিতি-পুস্তিকা থেকে

বড় মানুষ, সম্পন্ন-মানুষেরাই শুধু পারে একটি বড় দেশ আর বড় জাতিকে গড়ে তুলতে। আমাদের সম্মুখে আগামীদিনের যে-মহান বাংলাদেশ অপেক্ষমাণ তার সুযোগ্য নির্মাণের জন্য আজ আমাদের প্রয়োজন অনেক সমৃদ্ধ মানুষের। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মনে করে আগামীদিনের সম্পন্ন বাংলাদেশকে গড়ে-তোলার

পূর্বশর্ত হিশেবে আজ ওইসব মানুষের গড়ে তোলা আমাদের জন্য অপরিহার্য; সেইসব মানুষ, যাঁরা উচ্চমূল্যবোধসম্পন্ন, আলোকিত, শক্তিমান, কার্যকর এবং সংশপ্তক। এই দুঃখী জাতির উদ্ধার তাঁদের আত্মোৎসর্গের দিকে তাকিয়ে আছে।

ওইসব 'উচ্চায়ত' মানুষ গড়ে-ওঠার পরিবেশ উপহার দেবার দায়িত্বেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিয়োজিত।

আজ অনেক আলোকিত মানুষ চাই আমাদের—চাই অনেক সম্পন্ন মানুষ; না হলে এই মুখহীন কালো অবক্ষয়ের হাত এড়িয়ে এই জাতিকে শক্তি ও সম্ভবনার দরোজায় উত্তীর্ণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে। ওই মানুষদের আজ চাই আমাদের বিপুল সংখ্যায়; এককে দশকে নয়—সহস্রে লক্ষে। আর শুধু সংখ্যায় হলেই চলবে না, তাদের হতে হবে সমবেত, একত্রিত, আয়োজিত। তাদের গ্রথিত করতে হবে শক্তিশালী সংঘবদ্ধতায়। ওই সংঘবদ্ধতার ভেতর দিয়েই শুধু তাদের উত্থান ঘটতে পারে 'জাতীয় শক্তি' হিশেবে। আমাদের দেশের সব জায়গায় আজ কেবল অশুভের সংঘবদ্ধতা। ভালো মানুষেরা আজ বিভক্ত এবং পরাজিত। যোগাযোগরহিত অবস্থায় তারা যে-যার আলাদা ঘরে একা বসে কাঁদছে। পরস্পরকে খুঁজে পাচ্ছে না।

দেশের শক্তিমান মানুষদের সংঘবদ্ধ করে গড়ে তুলতে না-পারলে আমাদের সব শুভ উদ্যম ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সারাদেশে অর্থপূর্ণ ও 'সম্পন্ন' মানুষ গড়ে তোলা এবং সংঘবদ্ধ শক্তি হিশেবে তাদের একত্রিত করাই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য।

ধীরে ধীরে বাংলাদেশের জেলা-শহরগুলো পেরিয়ে এখন থানায় থানায় গড়ে উঠছে এক-একটি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। আজ সারাদেশে এর সংখ্যা দুইশতাধিক। দুই হাজার সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি থানায় আমরা এই কেন্দ্রকে ছড়িয়ে দিতে চাই।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আজ আর শুধুমাত্র একটি 'প্রতিষ্ঠান' নয়। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আজ একটি 'আন্দোলন'—আলোকিত জাতীয় চিত্তের একটি বিনীত নিশ্চয়তা। মানবজ্ঞানের সামগ্রিক চর্চা এবং অনুশীলনের পাশাপাশি জীবনের বহুবিচিত্র কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে পরিপূর্ণ শক্তি ও মনুষ্যত্বে বিকশিত হবার একটি জাগ্রত পৃথিবী।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লক্ষ্য আগামীদিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। তাই আগামীদিনের নাগরিকদের—অর্থাৎ আজকের তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদের সমৃদ্ধ মানুষ হিশেবে গড়ে-তোলার দায়িত্বেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রধানত নিয়োজিত। তারাই আজ এই উৎকর্ষের ভোজে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত।

১৯৯০

জর্নাল

কেন্দ্রের মূল ভাবনা

১

আজ চারপাশ থেকে ঘিরে-আসা গাঢ় অন্ধকারের ভেতর আমাদের যা সবচেয়ে বেশি দরকার তার নাম 'আলো'। সামান্যতম হলেও, ভিক্ষার মতো তুচ্ছ আর অসম্মানজনক হলেও—ছোট্ট একমুষ্টি আলো।

২

একটা গল্প শুনেছিলাম কিছুদিন আগে। গল্পটা অদ্ভুত। গল্পটা পাঁচ-ছয় বছরের একটা ছেলেকে নিয়ে। ছেলেটা যেমন দুর্দান্ত আর ডানপিটে, তেমনি বুদ্ধিমান। কখন কী অঘটন ঘটিয়ে বসে এ নিয়ে বাসার সবাই তটস্থ।

ছেলেটার বাবা যে-ঘরটায় পড়াশোনা করেন, তার দেয়ালে ছিল একটা ছোট্ট সাইজের মানচিত্র। মানচিত্রটা নেহাতই মামুলি, কিন্তু পেশাগত কারণে ওটা ছাড়া ভদ্রলোকের একমুহূর্তও চলে না।

একদিন সকালে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই দেখলেন, দেয়ালে মানচিত্র নেই। বুঝতে তাঁর বাকি রইল না, সেটা কোথায়। ছুটে গেলেন ছেলের ঘরে। যা আশঙ্কা করে গিয়েছিলেন, দেখলেনও তাই। ছেলের অসামান্য প্রতিভার ছোঁয়ায় মানচিত্রটা ততক্ষণে ছেঁড়া কুটি কুটি হয়ে ছড়িয়ে আছে ঘরের মেঝের ওপর।

কী করে এই মানচিত্র জোড়া দেয়া যায় এখন? রাগে হতাশায় দপদপ করতে থাকে ভদ্রলোকের মাথার শিরা। ক্ষোভের মাথায় ছেলের দুই গালে দুই চড় কষে খেঁকিয়ে উঠলেন : 'ছিঁড়লি তো মনের সুখে! পারবি, পারবি এখন ছেঁড়া কাগজগুলো জোড়া দিয়ে আগের ম্যাপটা বানাতে?' বলে নিরুপায়ের মতো ফিরে

গেলেন নিজের ঘরে।

ঘণ্টাখানেকও যায়নি, ভদ্রলোক ঘরে বসে কাজ করছেন; হঠাৎ ছেলে এসে হাজির। হাতে আগের সেই হুবহু মানচিত্র। তার অপকর্মের ফসল টুকরো ছেঁড়া কাগজগুলো জোড়া দিয়ে ম্যাপটা ফের বানিয়ে তুলেছে সে। ছেলের বয়স বড়জোর পাঁচ-ছয়। মানচিত্র তার তো চেনার কথা নয়! এমন নিখুঁত করে কীভাবে জোড়া লাগল সে-মানচিত্রটা! অবাক হয়ে ভাবলেন ভদ্রলোক।

'মানচিত্রটা চিনতি তুই?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'না।'

'তাহলে ঠিকঠাক জোড়া লাগালি কী করে?'

'বারে, মানচিত্রটার উল্টোপিঠে ইয়াবড় একটা মানুষের ছবি ছিল যে! দেখনি তুমি? ছেঁড়া টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে সেই মানুষটাকে আস্তে আস্তে বানিয়ে ফেলেছি, উল্টোপিঠের মানচিত্রটা তার সঙ্গে আপসাফ জোড়া লেগে গেছে।'

গল্পটা এখানেই শেষ।

শুনে মনে হয়েছিল, আমাদের জাতির ছেঁড়া, ভেঙে-পড়া মানুষটাকে যদি জোড়া দিয়ে এমনি ঠিকমতো গড়ে তোলা যায়, তবে আমাদের মানচিত্র অর্থাৎ দেশটাও তো এমনিতেই গড়ে উঠতে পারে। আমরা সারাদেশের সবখানে সেই মানুষকেই তো আজ গড়ে-তোলার চেষ্টা করছি। দেশ কি এর সাথে একদিন গড়ে উঠবে না?

৩

ছেলেবেলায় এক ভদ্রলোককে দেখতাম আমাদের পাড়ায়। বন্ধুরা ফিসফিসিয়ে বলত, জানিস, উনি কিন্তু পির। তা পির হোন বা না-হোন, ভদ্রলোক আমাকে একটা আশ্চর্য কথা শুনিয়েছিলেন একবার; যা প্রায় পিরসুলভ। বলেছিলেন, 'ধরো, অলৌকিক শক্তিতে তোমাকে এমন একটা ঘরের ভেতরে ঢোকানো হল যার দরোজা, ঘুলঘুলি, জানালা কোনোকিছুই কোনোদিন ছিল না, এখনো নেই। অথচ এখান থেকেই তোমাকে বাইরের পৃথিবীটা দেখতে হবে। ধরো, তোমার হাতে আছে একটা ধারালো শাবল আর একটা হাতুড়ি। এখন বাইরের পৃথিবীটা কী করে দেখবে বলো তো?'

'শাবল দিয়ে দেয়ালে একটা ছিদ্র করব।' আমি বলেছিলাম।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'বেশ তাই হোক। এবার মনে-মনে দেয়ালটায় ছোট্ট একটা ছিদ্র করেই ফেল-না! করেছ? এবার বলো তো কী দেখছ ছিদ্রটার ভেতর দিয়ে?'

'একটা সবুজ মাঠের খানিকটা জায়গা, একটা গাছের নুয়ে-আসা আধখানা ডাল, একটা ছাগলের কিছুটা অংশ—এমনি অল্পস্বল্প কিছু।' উত্তর দিলাম।

'এবার, ছিদ্রটাকে আরো বড় করে ফেল তো।'

'ফেললাম।'

'এবার কী দেখছ? আগের চেয়ে বেশি কিছু কি?'

'হ্যাঁ, একটা পাহাড়ের পুরো আধখানা, নিচের ঢালু সবুজ উপত্যকা, নীল আকাশের বেশখানিকটা অংশ, সেখানে শাদা তুলোর মতো মেঘেরা ভাসছে, পাহাড়ের তলে একটা ছোট শহরের বেশ খানিকটা, এমনি আরো অনেক কিছু।'

'এবার এক কাজ করো।' বললেন ভদ্রলোক, 'ঘরের ছাদে গিয়ে দাঁড়াও। কী দেখছ এবার?'

'নীল আকাশ, সারা পৃথিবী, সবকিছু। কোথাও কোনো দেয়াল নেই। বাধা নেই। চারধার আদিগন্ত অন্তহীন।'

কথা থামিয়ে তিনি শুধু বলেছিলেন, 'এরই নাম দৃষ্টিভঙ্গি। বড় অবস্থান থেকেও দেখলেই পৃথিবী বড়।'

বড় হয়ে গল্পটার অর্থ ভালো করে বুঝেছি। ছোট জিনিশকে ঘরের ভেতর থেকে দেখা যেতে পারে, কিন্তু বড়কে, বিশালকে দেখতে হলে ওই ছাদের ওপর যেতেই হবে। আমাদের কেন্দ্রের লক্ষ্য, জীবনকে সেই ছাদের ওপর নিয়ে যাওয়া—সেখানকার বড় পৃথিবীটায়।

৪

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আসল লক্ষ্য কী, এ নিয়ে নানান লোকের কাছে নানান কথা বলি। কিন্তু আমি তো জানি এই কেন্দ্রের সামনে আজ যদি সত্যিকার করণীয় কিছু থাকে তবে তা হচ্ছে দুটো : এক, আজকের তরুণদের অর্থাৎ আগামীদিনের মানুষদের বড় করে তোলা; দুই, তাদের সংঘবদ্ধ জাতীয় শক্তিতে পরিণত করা।

ভালো সময় বলতে কী বুঝি আমরা? ভালো সময় মানে সেই সময় যখন ভালো মানুষেরা সংঘবদ্ধ আর খারাপেরা বিভক্ত এবং পরাজিত। এর উল্টোটা হলেই তাকে আমরা দুঃসময় বলি।

আমাদের দেশে সব জায়গায় আজ অশুভের সংঘবদ্ধতা। কোথাও একটা দুর্বৃত্ত হাঁক দিলে মুহূর্তে সব দুর্বৃত্ত মুহূর্তে সংঘবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে ভালো মানুষেরা আজ বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগহীন—যে-যার আলাদা ঘরে শুয়ে একা একা কাঁদছে। পরস্পরকে খুঁজে পাচ্ছে না।

তারা পরস্পরের কাছে অপরিচিত আগন্তুক এবং প্রত্যেকের চারপাশে একরাশ অন্ধকার। তাদের মাঝখানকার এই বিচ্ছিন্নতার দেয়াল ভেঙে দিতে হবে।

তাদের সকলকে একত্রিত করতে হবে—'একত্রিত, সমবেত, আয়োজিত'।

এতগুলো বছর তাদের একত্রিত করার উপায় বের করতেই শেষ হয়েছে।

আমরা এখন পথ জেনে ফেলেছি। এখন সংগ্রাম গন্তব্যের জন্যে।

কাজ এখন একটা : প্রদীপ উঁচিয়ে রাখা। 'ভাই হে, তোমাদের মশালগুলো যেন পলকের জন্যেও না-নেভে।'

১৬.১০.৮৩

৫

গতবছর একটা আলোচনামালার সূত্র ধরে বারোটা রাজনৈতিক দল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এসে তাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ব্যাখ্যা করে গেল।

আমি প্রতিটা দলের নেতাদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেছি। আমাদের জাতীয় জীবনে কেন্দ্রের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে তাঁদের বারে বারে স্মরণ করিয়ে বলেছি : কেবল রাজনীতি দিয়ে দেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আজ সারাজাতির মতো রাজনৈতিক মুক্তিরও একটা পথ : মানুষের গুণগত সমৃদ্ধি।

বলেছি : রাজনীতি তো মানুষেই করে! যে-মানুষেরা জাতির রাজনৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখবে তাদের উন্নতমান যদি নিশ্চিত করতে না-পারেন তবে রাজনীতির উন্নতমানকে নিশ্চিত করবেন কীভাবে?

ক্ষুদ্র মানুষ দিয়ে কি বড় জাতি গড়ে তোলা যায়?

বলেছি : আপনারা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের হাতকে শক্ত করে দিন। আমরা জাতির হাত শক্ত করে দেব। সম্পন্ন-মানুষেরাই কেবল একটি সম্পন্ন-জাতির নিশ্চয়তা।

১৯৮৭

৬

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লক্ষ্য কিন্তু সামান্য। তা হল, 'আরও একটু ভালো'। জীবন, সৌন্দর্য, বাস্তবতা ও সংগ্রামের নিরন্তর কর্ষণের ভেতর থেকে শক্তিমান মনুষ্যত্বে জেগে-ওঠার মূলকথাও কিন্তু এটিই : 'আরও একটু ভালো'।

যদি জীবনে একজন দারোগাও হতে হয়, তাহলে যেন 'আরও একটু ভালো' দারোগা হই। যাঁরা বাস্তব পৃথিবীর লোক তাঁরা সবাই জানেন একটা খারাপ দারোগা তার ছোট্ট একটা জীবনে কত মানুষের কত দুঃখকষ্ট আর দুর্ভোগের কারণ। উল্টোদিকে একজন ভালো দারোগার কাছে কত মানুষের কত সুখ, আশ্রয়, নিরাপত্তা।

প্রগতি বা প্রতিক্রিয়া এই দু'দলের কারো ব্যাপারেই কোনো দায় নেই কেন্দ্রের। আমাদের লক্ষ্য একটাই : মানুষের গুণগত সমৃদ্ধি।

দেশের বুদ্ধিমান, মেধাবী, সৃজনশীল তারুণ্যকে বিকাশের একটা অবারিত আকাশ দেয় এই কেন্দ্র, আর বলে : যদি প্রগতিশীল হও তবে 'আরও একটু ভালো' প্রগতিশীল হয়ো, প্রতিক্রিয়াশীল হলেও 'আরও একটু ভালো' প্রতিক্রিয়াশীল।

এই পৃথিবী 'আরও একটু ভালো'র কাছেই চিরকাল নিরাপদ; কোনো মতবাদ বা বিশ্বাসের কাছে নয়।

২৯.১১.৮৯

৭

আমি সংগঠনে বিশ্বাস করি—বিশ্বাস করি দলে। শক্তিমান সমমনা মানুষদের যূথবদ্ধতায়।

আমাদের দলের সভ্যেরা হবে সমমনের কিন্তু সমমতের কিছুতেই নয়। এখানেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য। ওইসব প্রতিষ্ঠানের মূলে আছে একটা অভিন্ন বিশ্বাসের ভিত্তি—সমস্ত মানুষ সেই বিশ্বাসের একক ধারা-প্রবাহে নতজানু। কিন্তু আমাদের শক্তিমান মতপার্থক্যই আমাদের শক্তি। আমরা কিছুতেই একে অন্যের মতো নই। এই উজ্জ্বলিত আত্মবিশ্বাসই হাজার হাজার প্রদীপের মতো আমাদের সবাইকে শবেবরাতের রাতের বিপুল উৎসব-সভায় আলোকিত করে রাখে।

চিন্তার জগতে দল গড়ে ওঠে, ভেঙেও যায়। হয়তো ভেঙে যাবার জন্যেই গড়ে ওঠে। এই ভাঙা-গড়া কেউ রোধ করতে পারবে না। আমরা কেউ কারো উঞ্ছবৃত্তিতে আগ্রহী নই। আমাদের দলও তাই ভেঙে যাবে।

দশটা বছর এমনকি পাঁচটা বছর—নয়তো আরো অল্প সময়ের জন্যেই ভেসে থাকবে আমাদের এই ভালোবাসার সাম্পান। কিন্তু উদ্দীপনামদির এই কয়েকটা দিনের ভেতর সম্ভাবনার যে-উচ্চতম শীর্ষকে আমরা পলকের জন্যে দেখতে পাব, সেই অসম্ভব স্পর্শের পিপাসায় জীবনের পরবর্তী দিনগুলোকে আত্মবিস্মৃতের মতো পার করে, একসময় নিঃশব্দে বিদায় নেব আমরা।

৮.১১.৮৭

৮

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় গড়ে উঠছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। কেন্দ্রগুলোকে গড়া হচ্ছে এক-একটি উন্নত পরিবারের মতো করে—বড় স্বপ্নে, উদ্যমে, বড় জীবনের আবেগে স্পন্দমান একটা সম্পন্ন জগতের আদলে। এখানে সভ্যেরা একই সঙ্গে পাচ্ছে দুটো জিনিশ। এক. শ্রেষ্ঠ বই পড়ার ভেতর দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবন ও চিত্তের সঙ্গে বসবাসের সুযোগ; দুই, উৎকর্ষময় বিকাশের উপযোগী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচির সজীব পরিবেশে বিচিত্র সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা আর আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে জেগে-ওঠার সপ্রাণ পরিবেশ। এ সবকিছুর উদ্দেশ্য একটাই : বড় একটা জীবন স্বপ্নের সামনে তাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া। একটা অনুভূতিশীল হৃদয়কে,

জীবনের সূচনামুহূর্তে, এমনি একটা বড় স্বপ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারাটাই বড় কথা। বাকিটা সে নিজেই পারে। যেসব রকেটকে চাঁদে পাঠানো হয় সেগুলোকে পৃথিবী থেকে বাইরে পাঠানোর জন্য একবারই একটা জোর উৎক্ষেপণের দরকার; এরপর সে নিজেই চলে যায়। চাঁদকে যদি আমরা 'সব পেয়েছি'র প্রতীক ভাবি তাহলে বলা যায় জীবনকে সেই 'সব পেয়েছির দেশে' পৌছানোর জন্যে জীবনের সজীব প্রভাতে মানুষকে এমনি একটা বড় উজ্জীবনে জাগিয়ে দেয়াটাই জরুরি। মানুষ অপরিসীম ক্ষমতাশালী। যাত্রা শুরুর সামান্য পাথেয় পেলে সে বিশ্বজয় করতে পারে।

আমাদের কিশোর-তরুণদের চিত্তের এই ছোট্ট জাগৃতিটুকুই আমাদের লক্ষ্য। সারাজীবন তাদের পেছনে লেগে থেকে একটা দাসের জীবনে তাদের নিক্ষেপ করে লাভ নেই।

এর পাশাপাশি আরও একটা চেষ্টা আছে আমাদের। অশুভেরা আজ সারাদেশে সবচেয়ে শক্তিশালীভাবে সংঘবদ্ধ। আমাদের চেষ্টা কীভাবে দেশের শুভ-মানুষদের সংঘবদ্ধ করা যায়—তাদের জ্বলিত করে তোলা যায় একটা শক্তিশালী জাতীয় শক্তি হিশেবে।

পাঁচটা দুষ্ট ছেলে একখানে হলেও তো তারা খুঁজে বেড়ায় কোথায় কার গাছে কচি ডাব ফলেছে, কীভাবে সেগুলো হাতিয়ে নেওয়া যাবে। আজ আমরা সারাদেশে ভালো ছেলেমেয়েদের এই-যে দলের পর দল গড়ে তুলছি—বড় স্বপ্নে, বড় জীবনাগ্রহে উদ্বুদ্ধ সব দল—একটা দুটো নয়, শত শত—এরাও কি তেমনি তাদের স্বপ্নের মতো বড়কিছু, ভালোকিছু উচ্চতর কিছু খুঁজে বেড়াবে না? এদের সবার মিলিত উদ্যম আর পিপাসা—এসব কি শুধু পথের ধুলোয় হারিয়ে যাবার জন্যে?

১৯৮৩

৯

রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একটা পার্থক্য আছে। কেন্দ্রের নিজস্ব কোনো মতাদর্শ নেই। কেন্দ্র কাউকে কোনো মতাদর্শে দীক্ষিত করে না। কেন্দ্রের যদি কোনো মতাদর্শ থেকে থাকে তবে তা একটাই—মনুষ্যত্বের সমৃদ্ধি।

এই আলোকায়ন কোনো দল বা মতের একক সম্পত্তি নয়। সমস্ত দল-মত-আদর্শের সর্বোত্তম বিকাশের অনুকূলে সমানভাবে প্রযোজ্য একটি চেতনা।

কেন্দ্রের বক্তব্য একটাই : প্রথমে শিক্ষা, পরে দীক্ষা। প্রথম কাজটির ভেতর দিয়ে কেন্দ্র চিত্তকে আলোকিত করে দেয়। কিন্তু দীক্ষা সত্তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার জেগে-ওঠা আলোকিত হৃদয় যে-আদর্শকে দেশ জাতি এবং পৃথিবীর দুঃখের শ্রেষ্ঠতম প্রত্যুত্তর বলে বিবেচনা করে, সেই আদর্শে সে স্বদীক্ষিত হয়। সব

দীক্ষার মধ্যে এই দীক্ষাই শ্রেষ্ঠ। এই দীক্ষা চক্ষুষ্মান। এই দীক্ষা সম্পূর্ণই তার নিজের। এখানে কেন্দ্রের কোনো ভূমিকা নেই।

ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মতো কেন্দ্র 'আগে দীক্ষা পরে শিক্ষার' নীতিতে বিশ্বাস করে না। কেননা সেক্ষেত্রে শিক্ষা দীক্ষার দাসত্ব করতে থাকে। চক্ষু হারিয়ে শিক্ষা তখন নিজের সার্বভৌমত্ব হারায়। জ্ঞান তখন দৃষ্টিমান বিশ্বাসকে জন্ম দেয় না, বরং অপরিশুদ্ধ বিশ্বাসের ভৃত্য হয়ে পড়ে। এভাবে পৃথিবী অন্ধকার সময়ের করায়ত্ত হয়।

কেন্দ্র এই অন্ধকারের অবসান চায়। কেন্দ্র মনে করে চিত্তকে সমৃদ্ধ করার উপায় হচ্ছে : চিত্তকে দীপান্বিত করা।

১৯৮৯

১০

সংস্কৃতশাস্ত্রে কথিত আছে : 'গুরু দ্বিবিধ'। উত্তম গুরু তিনিই যাঁর গৃহে প্রবেশ করার দিন শিষ্যের মনে হবে, 'এই গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে পদমাত্র ফেলিতে পারিতেছি না।' কিন্তু যেদিন শিষ্য সেই গুরুগৃহ ত্যাগ করবে সেদিন তার মনে হবে : 'এই গুরু এক্ষণে আমার জন্যে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।' অর্থাৎ এই গুরু শিষ্যকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল, স্বাবলম্বী ও স্বাধীন করে বিদায় দেন। অন্যদিকে নিকৃষ্ট গুরু তিনিই যিনি শিষ্যকে স্বাধীন করার পরিবর্তে প্রতিদিন পরাধীন থেকে পরাধীনতর করতে থাকেন। ফলে একসময় শিষ্য এমন করুণ অবস্থায় পড়ে যে তার মনে হয় 'গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে নিশ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত সুসম্পন্ন করিতে পারিতেছি না।' এই গুরু শিষ্যকে মুক্তি না-দিয়ে দাসত্ব দেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিতে চায় সেই উন্নত গুরুর ভূমিকা। উন্নত গুরুর মতোই কেন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সত্তার সহজাত শক্তি ও প্রতিভাকে বিকাশের উঁচুপর্যায়ে উন্নীত করে তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিতে চায়। তারপর সেই সত্তার পথ তার নিজের। সে তখন 'নিজেই নিজের প্রদীপ'।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অঙ্গনে কোনো এক বা একাধিক গুরুর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। এই প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ-সন্তানদের সমবেত ঋদ্ধিই এখানকার 'গুরু'।

১৯৮৭

১১

আমি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে লাইব্রেরি বাড়ানোর পক্ষে নই। কী হবে নতুন লাইব্রেরি বানিয়ে? কে পড়বে? কোথায় পাঠক? যেসব জাগ্রত-হৃদয় আর্ত পিপাসা নিয়ে আজ লাইব্রেরির দরোজায় এসে দাঁড়াবে—সেইসব জ্বলন্ত উদ্দীপ্ত মানুষ কোথায় আজ এদেশে?

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথমপর্যায়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম একটা বড় লাইব্রেরি গড়ে তোলার। যা হবে এখানকার জ্ঞানপিপাসু ঋদ্ধ মানুষদের আলোকিত মিলনক্ষেত্র। না, কেবল লাইব্রেরি নয়; চিত্রশালা, চলচ্চিত্রশালা, সংগীত-লাইব্রেরি, অভিনয়-মঞ্চ, মিলনায়তন, ক্যাফেটেরিয়া—আরও যা-কিছু ভাবা যেতে পারে—সব। ঢাকার এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে-তোলার প্রাথমিক কাজে হাতও দিয়েছিলাম একসময়। পাঁচবছরের সমস্ত শ্রম আর যত্ন ব্যয় করেছিলাম এর পেছনে। গড়ে উঠেছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লাইব্রেরি, সংগীতশালা, শ্রবণ-দর্শন বিভাগ, মিলনায়তন, ক্যাফেটেরিয়া—গাছপালা, দালান আর লনের একটা নিটোল পরিচ্ছন্ন পরিবেশ—জাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একটা ছোট সুস্মিত পূর্বপুরুষ।

কিন্তু অল্পদিনেই বোঝা গেল মানুষ জন্মাবার আগেই যদি তার ঘর তৈরি হয়ে যায় তবে সেখানে সাপ ব্যাঙ আর সরীসৃপ বসবাস করে। সুসমৃদ্ধ বিশাল একটা লাইব্রেরি নাহয় বানালাম, কিন্তু ওটা তো দেশের বর্তমান প্রয়োজন নয়। কে পড়তে আসবে সেখানে? কষ্টে পরিশ্রমে একটা সমৃদ্ধ আর্ট গ্যালারি নাহয় গড়ে তোলা হল, কিন্তু চিত্রকলার প্রবুদ্ধ রসাস্বাদনকারী কোথায়? ক'জন আসবে শ্রবণ-দর্শন বিভাগে—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র কিংবা সংগীত উপভোগের জন্যে? সেইসব প্রগাঢ় নাট্যগোষ্ঠী কিংবা নাট্যশিল্পবোদ্ধারা কোথায় যাঁরা সমৃদ্ধ হৃদয় নিয়ে ভিড় জমাবে নাট্যমঞ্চের চারপাশে?

আমাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ কিছুদিনের মধ্যেই দুরপনেয় বিপর্যয়ের মুখে অবসিত হল। অবসরলিপ্সুদের উদ্দেশ্যহীন ভিড়, দলাদলি আর রুচিহীন খেউড়ে একটা ক্লেদাক্ত পরিবেশের ভেতর নোংরা হয়ে উঠল জায়গাটা।

আজও আমি এদেশে নতুন লাইব্রেরি খোলার পক্ষপাতী নই। কার প্রয়োজনে লাগবে এ? কে মূল্য দেবে? আজ আকস্মিক খোঁড়াখুঁড়ির ফলে বিক্রমপুরের অজ পাড়াগাঁর দশ হাত মাটির নিচ থেকে যদি পালযুগের কোনো বিখ্যাত ভাস্কর্য বের হয় তাতে চারপাশের নিরক্ষর গ্রামবাসীর কী এসে যায়? একটা বিরাট ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরি রয়েছে শহরের মাঝখানে—চারপাশে মূর্খের রাজত্ব—কী তার অর্থ?

আমার আশঙ্কা, আমাদের সমাজে হয় কোনোদিন জ্ঞান প্রবেশ করেনি, নয়তো, করে থাকলেও আমাদের সঙ্গে এখন তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে।

লাইব্রেরি তৈরির আগে ওই লাইব্রেরিতে কারা আসবে আজ প্রথমে তাদের জন্য দেবার কথা ভাবতে হবে। ইশকুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আজ আর তাদের জন্ম দিচ্ছে না। কিছু পরিমাণে তাদের গড়ে-তোলার পরই কেবল হাত দেয়া যেতে পারে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার কাজে, আগে নয়।

এইজন্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আমরা লাইব্রেরিকে গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে নামিয়ে এনেছি—প্রধান গুরুত্ব পেয়েছে 'দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রম'।

ইংরেজ বেনিয়ারা একদিন যেভাবে এদেশের মানুষকে 'চা' ধরিয়েছিল, ঠিক সেভাবেই দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে আজ 'বই' ধরাতে হবে আমাদের। বই-ধরানোর প্রক্রিয়া হবে চা-ধরানোরই মতো। শুধু উদ্দেশ্য হবে আলাদা। হাজার হাজার বইপড়া কর্মসূচির আয়োজন করে আজ সারাদেশের ছেলেমেয়েদের পড়ার আনন্দে মাতিয়ে তুলতে হবে। আর সেইসঙ্গে যুক্ত করতে হবে মনের বিকাশের উপযোগী সুন্দর আর রঙিন সব সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। ভালো-ভালো পুরস্কারের প্রলোভনের সামনে ফেলে তাদের জয়ের পিপাসাকে দীপিত করতে হবে। কিন্তু তা কেবল বইপড়ার বা সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মতো একটা উচ্চায়ত দরকারেই। এভাবেই নিজেদের অজান্তে তারা গৃহীত হয়ে যাবে বইয়ের অমেয় অনির্বচনীয় জগতে। বইয়ের ভেতর দিয়ে বিকাশের দিকে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা শ্রেয় ও মহানের জন্য আর্ত হয়ে উঠবে। তখনই আসতে পারে কেবল নতুন লাইব্রেরি তৈরির প্রসঙ্গ।

আজ দেশের লাইব্রেরিগুলোর দুরবস্থা অনেকেরই জানা। এগুলোতে বইয়ের পাঠক প্রায় শূন্যের কোঠায়। যে দু-চারজন এখনো টিকে আছে তাদেরও অধিকাংশই শুধুমাত্র নিম্নশ্রেণীর উপন্যাসের পাঠক। এই বেদনাদায়ক ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণ লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষকে করতে হয় এক হৃদয়বিদারক পন্থায় : পাঠকদের টেবিলে বিনোদনসর্বস্ব নোংরা পত্রপত্রিকা সাজিয়ে রেখে সেগুলো ঘিরে জড়ো-হওয়া রুচিহীন লোকজনদের লাইব্রেরি-ব্যবহারকারী বলে পরিচয় দিয়ে।

মনে রাখতে হবে লাইব্রেরি কেবল কতকগুলো সুন্দর সুশোভন বইয়ের সমষ্টি নয়। এমনকি বিপুলসংখ্যক বইয়ের সমষ্টিকেও লাইব্রেরি বলে না। লাইব্রেরির প্রধান সম্বল অন্তত একজন উজ্জীবিত হৃদয়সম্পন্ন মানুষ—যিনি ডাক দেন।

আমরা সবাই জানি নামাজ দিনে পাঁচবার পড়তে হয়। কখন কোন্ নামাজ পড়তে হয় তাও আমাদের জানা। তবু মসজিদের মিনার থেকে প্রতি নামাজের আগে আর্ত উচ্চকণ্ঠে একটি উদ্বুদ্ধ মানুষকে ডাক দিতে হয়। বলতে হয় : 'এসো—নিদ্রার চেয়ে প্রার্থনা শ্রেয়।' লাইব্রেরিতেও তেমনি একজন মানুষকে আহ্বান জানাতে হয়। সবাইকে ডেকে বলতে হয় : এসো, এখানে এসো। এখানে তোমাদের বৃদ্ধি, বিকাশ, আলোকসম্মত মুক্তি। হ্যাঁ, এখানেই—আর কোথাও নয়।' ওই মানুষটি গ্রন্থাগারিক হতে পারেন—হতে পারেন অন্য কোনো প্রাণিত মানুষ। এই মানুষ একজনের জায়গায় অনেকজনও হতে পারেন। তাই আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু যে-লাইব্রেরিতে ওইসব উদ্বুদ্ধ আহ্বানকারী নেই—মুয়াজ্জিন নেই—সেটা লাইব্রেরি নয়।

আমাদের সমাজের আজ সেই বেদনা-জাগ্রত মানুষটি কোথায়—যে ডাক দেবে?

১৯৯০

১২

দেশের মানুষ আজ উন্নততর যান্ত্রিক চাষাবাদে বিশ্বাস করে, উচ্চফলনশীল ধান-গমের কথা বলে, উন্নত হাঁস-মুরগি এমনকি গবাদিপশুর দাবিতে জাতীয় আন্দোলনের জন্ম দেয়, কিন্তু এসবের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে-মানুষ—সেই মানুষের বিকাশের ব্যাপারে কথা বলে না।

১৩

ট্রাফিক সিগনালে লালবাতি জ্বলে উঠেছে, আপনি গাড়ি থামিয়ে একা-একা অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ দেখলেন একটা জুলজুলে ভিখিরি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভিখিরির স্পর্ধা সারাগায়ে বিছুটি ঘষে দেবার মতো।

'দিবেন সাব, পাঁচশোডা টাকা দিবেন?' সে বলল।

বিরক্তিতে আপনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা :

'দেন না সাব পাঁচশো টাকা।'

'এত টাকা দিয়ে কী করবি তুই!' আপনার তেড়িয়া কণ্ঠের ভয়ঙ্কর হুঙ্কার।

'স্যার, আমি ক্ল্যাসিক্যালে খুব ভক্ত স্যার। ওস্তাদ রবিশংকর ঢাকায় আসছেন। যাদুঘরে কনসার্ট। যাওনের খুব ইচ্ছা। সবচাইয়া কম টিকিটের দাম পাঁচশো টাকা। দিবেন সাব টাকাডা?'

বেয়াদব-লোকটার স্পর্ধায় আপনি যেভাবে অসুস্থ হয়ে উঠবেন, একইভাবে অসুস্থ হয়ে ওঠে দাতা সংস্থারা যখন আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্যে তাদের কাছে আমরা টাকার জন্য দরবার করি। যে-দেশের মানুষ জনসংখ্যা-সমস্যায়, অনাহারে-অপুষ্টিতে তিলে-তিলে শেষ হচ্ছে; যাদের রোগে পথ্য নেই, অস্তিত্বের নিশ্চয়তা নেই, দু'বেলা খাবারের ব্যবস্থা নেই—সে-দেশের মানুষ সাংস্কৃতিক অধিকারের প্রসঙ্গ তুললে কে-না খেপে উঠবে।

কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির জন্যে আর্থিক দরকারের প্রসঙ্গটা সবার কাছে কেন এত অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় বুঝতে পারি না। একটা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আর সাংস্কৃতিক ঋদ্ধি সবসময় কি একরেখায় চলে। আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ, আমরা দরিদ্রতম। তবু আমাদের সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথের মতো একজন মহিমান্বিত মানুষকে উপহার দিয়েছে যা আমেরিকা আজও পারেনি। এমন একটি সংস্কৃতিকে সুরক্ষার জন্য আর্থিক দরকারের প্রসঙ্গ শুনতে অত উদ্ভট লাগবে কেন? আমরা গরিব এইজন্যে? আমেরিকান সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে আর্থিক বরাদ্দের প্রসঙ্গ কি তাদের কাছে এমন সৃষ্টিছাড়া শোনায়?

কী কঠিনই না ছিল এই পরিস্থিতিতে দেশের ভেতর থেকে তিল তিল করে টাকা জোগাড় করে এই কেন্দ্র তৈরি করা!

১৪

আমার বন্ধুবান্ধবেরা প্রায়ই বলে : 'কী বানালে তোমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রটাকে বাংলামোটরের এই ছোট্ট গলির ভেতর? এমন একটা জিনিশ এরকম জায়গায় মানায় নাকি? দূরে কোথাও যাও না—সাভার কিংবা আরো দূরে—প্রকৃতির নির্জন পরিবেশের ভেতর—জ্ঞানচর্চার উপযোগী শান্ত কোনো নিভৃত জায়গায়—বড়সড় একটা এলাকা নিয়ে—দেখবে, স্বপ্নের মতো একটা জিনিশ হবে।'

আমি জবাবে বলি, 'সাভারে যাওয়া তো দূরের কথা, রাজধানীর ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে না হয়ে এতদূরে এই বাংলামোটরে যে বানাতে হয়েছে প্রতিষ্ঠানটাকে, এজন্যেই আমি বরং দুঃখিত।'

অনেকদিন পর্যন্ত সত্যিসত্যি চেষ্টা করেছি মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় কোথাও কেন্দ্রের জন্যে একটা জায়গা নিতে—জাতির কর্মমুখর বাস্তবতা এবং হিংস্র উদ্যমের মূল প্রাণকেন্দ্রে। সচিবালয়ের ব্যাপারটা অসম্ভব বলেই হয়তো ওই জায়গাটার কথা ভাবিনি। আমাদের এই কেন্দ্র থেকে পাঠ নিয়ে একদিন যাদের এই জাতিকে পরিচালনা করতে হবে, আমি বিশ্বাস করি, তাদের উত্থিত হতে হবে এই জাতির সর্বময় রাষ্ট্রপ্রক্রিয়ার সংঘাতরক্তিম ভিত্তিমূল থেকে। না, হাসির কথা নয়, আমার ওইসব বন্ধুবান্ধবদের অনেকবার আমি বলেছি : 'সচিবালয়ের ভেতর এককোণে কোথাও আমাকে সামান্য একটুকরো জায়গা দিতে পারো তোমরা?'

জীবন-সংগ্রামের বাস্তব আক্রমণ থেকে দূরে, প্রকৃতির শান্ত নির্জন পরিবেশে, জীবনবিচ্ছিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা আমার পছন্দ নয়। শান্তিনিকেতনের মতো তাপোবন আদর্শে গড়ে-তোলা শিক্ষাপ্রণালী একালের নিষ্ঠুর রক্ত-সংঘাতের যুগে খানিকটা অচল বলেই আমার ধারণা।

[আজকের পাশ্চাত্যের গ্রামগুলোর কথা আলাদা। ওগুলো একেকটা বড় আকারের শহর ছাড়া কী? আপাতদৃষ্টে সেখানে যাকে প্রকৃতির কোলের স্নিগ্ধ শান্ত কুঞ্জবন বলে মনে হচ্ছে সেখানেও আধুনিক সভ্যতার সর্বশেষ বাসনগুলো ক্রুর ছোবল উঁচিয়ে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।]

কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সহজ অনাড়ম্বর জীবনে নিবেদিত অধ্যাপকবৃন্দ, সুস্থিত মূল্যবোধ, সাধনা ও নিষ্ঠা—সব মিলে রবীন্দ্রিক পৃথিবীর একটা শেষরশ্মি যেন এখনো বেঁচে আছে সেখানে। তবু প্রশ্ন : বাঙালি-জীবনের সংগ্রাম আর অগ্রযাত্রার ইতিহাসে শান্তিনিকেতনের অবদান সত্যি কতটুকু?

এই জায়গাটায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত একক ভূমিকা কি ওই বিশাল প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক আয়োজন আর প্রচেষ্টার চেয়েও অনেক বড় নয়?

ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে, শান্তিনিকেতন গড়ে-তোলার শ্রমস্রস্ত দিনগুলোয় রবীন্দ্রনাথ হয়তো এমনি এক স্বপ্নের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ ছিলেন যে প্রকৃতিলালিত এই নির্জনতার কোলে, উপনিষদীয় জীবনচর্যার এই নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তির ভেতর তাঁরই মতো প্রবুদ্ধ মানুষদের জন্ম একদিন সংঘটিত হবে এই প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে। সময় তা ভুল প্রমাণ করেছে। আমার মনে হতে চায়, তাঁর এই চিন্তার চাইতে তাঁর সময় অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তিনি নিজেও কি দ্বন্দ্ব-বিস্রস্ত নাগরিক বাস্তবতার সন্তান নন? মৌন সমাহিত উপনিষদীয় পৃথিবী তো তাঁর জীবনের বিকাশ-পর্বের পরিবেশ ছিল না। তাঁর বাস্তবতা ছিল বরং উল্টো। কলকাতার নাগরিকতা, ইউরোপের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার হিংস্র উদ্দাম গতিধারা ফিরে ফিরে তাঁর জীবনাগ্রহকে প্রেরণা দিয়েছে। এমন অবস্থায় কী করে ভাবা যেতে পারে শান্তিনিকেতনের শান্ত নির্বিরোধ জীবন-পরিবেশ তাঁর মতো শক্তিমান, সংগ্রামদীপ্র, পরাক্রান্ত মানুষদের উত্থান ঘটাবে?

শান্তিনিকেতনের প্রথমযুগ থেকেই এর ছাত্রছাত্রীরা জাতির চলমান বাস্তবতার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে কমবেশি ব্যর্থ হয়েছে। সমাজের সঙ্গে দুঃখজনক বিচ্ছিন্নতাই শেষপর্যন্ত হয়েছে এদের অধিকাংশের বিধিলিপি। সামাজিক সংঘাত এবং দ্বান্দ্বিকতার রক্তযাত্রার ভেতর থেকে যারা জন্মাচ্ছে না, পরিপার্শ্বকে আক্রমণ করে বিজয় ছিনিয়ে নেবার যুদ্ধে নিজেদের শস্ত্রভাণ্ডারকে তাদের অপর্যাপ্ত মনে হবারই কথা। তাছাড়া সমাজকে তাদের অনুকূলে মুখ ফেরাতে বাধ্য করার হিংস্র শক্তিমত্তাতেও এরা দুর্বল থেকে যায়। এদের ব্যাপারেও ঘটেছে প্রায় তা-ই। একটা উচ্চায়ত জীবনের ললিত স্বপ্নকে আজীবন বুকের ভেতর বয়ে বেড়িয়ে, এক পৃথিবী নিঃসঙ্গতার ভেতর, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজেদের আদর্শকে সর্বোচ্চ ভেবে, শক্তি-প্রভাবহীনভাবে এরা নীরবে একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়।

শান্তিনিকেতনের একজন মুক্তদৃষ্টিসম্পন্ন কৌতূহলী প্রবীণ অধ্যাপকের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে কথা হয়েছিল একদিন। এ-ব্যাপারে তিনি আরও বিশদ শুনতে আগ্রহী হলে কাছাকাছি তুলনা হিশেবে বাংলাদেশের ক্যাডেট-কলেজগুলোর প্রসঙ্গ তুলে আমি তাঁকে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। সবাই জানেন, আমাদের দেশে ক্যাডেট কলেজ নামে সামরিক-প্রবণতাসম্পন্ন একধরনের চৌকশ বেসামরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে এবং বিরাট অর্থব্যয়ে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। দেশের সামরিক মহিমার প্রতিভূ এই বিদ্যালয়গুলোকে সম্প্রতি জনচক্ষে তুলে ধরা হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিশেবে।

ভবিষ্যৎ সামরিক বাহিনীর জন্য ভালো অফিসার গড়ে-তোলাই এগুলোর মূল লক্ষ্য। স্কুলগুলোয় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাকাল সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী। ধরে নেয়া হয়েছে, শৈশবের এই অনুভূতিময় দিনগুলোয় যদি ছাত্রছাত্রীদের নিয়মানুবর্তিতার ভেতর দিয়ে সুষ্ঠু শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটিয়ে গড়ে তোলা যায় তবে তাদের চরিত্রে এমন কিছু যোগ্যতার সমাবেশ ঘটবে, যা ভবিষ্যতের সামরিক জীবনে তাদের সুযোগ্য অফিসার হতে সাহায্য করবে। যারা সামরিক বাহিনীতে যেতে পারবে না কিংবা যেতে চাইবে না তারাও এই শিক্ষাব্যবস্থার উপকার পেয়ে উন্নত ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিশেবে গড়ে উঠবে। আমি নিজেও এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বেশকিছু অভিনন্দনযোগ্য দিক দেখতে পাই। এখানে ছাত্রছাত্রীদের যে-শৃঙ্খলা, সুশিক্ষা এবং সুস্থিত মূল্যবোধের ভেতর দিয়ে গড়ে-তোলা হয়, তা প্রশংসনীয়।

কিন্তু এখানেও সেই আগের সমস্যা। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে তৈরি করা হচ্ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন সুদূর জায়গায়—দেশের রক্তাক্ত, নগ্ন বাস্তবতা থেকে দূরে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের জাতির শক্তি ও নিঃস্বতা, ভূমিষ্ঠতা ও পতন, বৈচিত্র্য ও অগ্রযাত্রা—সবকিছু সম্বন্ধেই অনবহিত থেকে যাচ্ছে। চারপাশের প্রকৃতির নিরীহ নির্বিরোধ জগতের মধ্যে তারা বড় হয়। এখানে সুস্থিত মূল্যবোধ আছে, কিন্তু তা কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে। এখানে নিয়মানুবর্তিতা আছে, কিন্তু তাকে একধরনের পাশবিকতা বলাই চলে। শিক্ষার্থীদের তরুণমনের বৈচিত্র্য, কৌতূহল, প্রতিভা, স্বাতন্ত্র্য—সবকিছু দলে পিষে সবাইকে একটা ভেদাভেদহীন একাকার মানুষ করে ফেলাতেই এই শিক্ষাব্যবস্থার উৎসাহ। হৃদয়ের ওপর এই অমানবিক অত্যাচার এই বিদ্যায়তনগুলোকে কিশোর-শিক্ষার্থীদের জন্য এক-একটা উদ্ধারহীন নির্যাতনশালা করে রেখেছে।

প্রায় প্রতিবছরই শোনা যায় পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর-আশি জনের একেক দল ছাত্র একসঙ্গে হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছে কলেজ থেকে। তারপর পঞ্চাশ-একশো মাইল হেঁটে বা বাস-লঞ্চ-নৌকায় চেপে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ফিরে গেছে যে-যার বাড়িতে। এই বেদনাদায়ক ইতিবৃত্তের এখানেই শেষ নয়। কলেজ-কর্তৃপক্ষ ওই হতভাগ্য ছাত্রদের বাড়ি ঘেরাও করে আইনের আশ্রয়ে আবার তাদের ওই নির্মম বন্দিশালায় ধরে নিয়ে যায়।

এসব ঘটনা অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে প্রভুর বাড়ি থেকে পালিয়ে-যাওয়া আমেরিকার নিগ্রো ক্রীতদাসদের ধরার পর গলায় বেল্ট লাগিয়ে ফের প্রভুর বাড়িতে ফিরিয়ে নেবার রোমহর্ষক স্মৃতিকেই মনে পড়িয়ে দেয়। কী ধরনের নির্মম আর অত্যাচারী শিক্ষাপদ্ধতি এই ঘটনাগুলোর উৎস তা সহজেই অনুমেয়। শিশুমনের ওপর এই পাশবতা কি কোনো উন্নত বা আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থা হতে পারে

কোনো উন্নত মানুষের জন্ম দিতে পারে? অথচ আমাদের দেশের সামগ্রিক শিক্ষা-পরিস্থিতি আজ নৈরাজ্য আর অবক্ষয়ের মধ্যে এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যে অভিভাবকেরা উপায়হীন হয়ে এই অমানবিক শিক্ষার কাছে সন্তানদের পাঠানোকে বিরাট সৌভাগ্য বলে মনে করছে।

আমি সেই অধ্যাপক-মহোদয়কে বিনীতভাবে বললাম : আজকের দিনে ভালো শিক্ষার জন্যে দুটো উপাদানের সহযোগ খুবই জরুরি। এক, দেশের কঠিন বাস্তবতার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিকশিত করে তোলা; দুই, উদার পরিবেশের মধ্যদিয়ে তাদের স্বাধীনভাবে বেড়ে-ওঠার সুযোগ দেয়া। শান্তিনিকেতন বা আমাদের ক্যাডেট-কলেজগুলোর বিচ্ছিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা প্রথম শর্তটিকে প্রায় পুরোপুরি অগ্রাহ্য করছে। তাছাড়া আমার ধারণা এই দুটো শিক্ষাপদ্ধতির অবয়ব জুড়েই একটা নির্মম অত্যাচার নীরবে সক্রিয় রয়েছে। ক্যাডেট-কলেজগুলোর যে-অত্যাচার তা স্থূল—সেটা বর্বরতার অত্যাচার। শান্তিনিকেতনে তা অনেক মার্জিত এবং সূক্ষ্ম—মাধুর্যের অত্যাচার।

আমার কথা শুনে অধ্যাপক-মহোদয় অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে, কথাটার তাৎপর্য হঠাৎ যেন এইমাত্র বুঝতে পেরেছেন, এভাবে হেসে বললেন : 'সত্যি, ব্যাপারটা কখনো এভাবে ভেবে দেখিনি তো।'

তাঁর বিনয়ের বিগলিত প্রাচুর্য দেখেই বুঝতে পারলাম আমার বক্তৃতাটা তাঁর কাছে পুরোপুরি মাঠে মারা গেছে।

১৯৯০

১৫

অনেক আগে একবার লিখেছিলাম : 'নিরপেক্ষ মানে সবার বিপক্ষ'। লিখেছিলাম কিন্তু ব্যাখ্যা দিইনি। আজ ব্যাখ্যাটা বলি।

ধরা যাক একজন লোক পাশের পাড়ার বৈশাখী মেলায় ঢুকে নানারকম নাহক খবরদারি শুরু করেছিল। তাতে সে-পাড়ার কেউ চটে গিয়ে তার কানদুটো আচ্ছা করে মুচড়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা লোকটির জন্য অসহনীয় মানসিক নির্যাতনের কারণ হয়েছে। অসম্মানে আত্মগ্লানিতে সে ঘুমোতে পারছে না। নিদ্রাহীন রাত্রি তার কাটছে অকথ্য যন্ত্রণায়। এমন ঘৃণ্য মনে হচ্ছে নিজেকে যে, নিজের প্রিয় শরীরটাকেও লাগছে ফুলে-ওঠা ভারাক্রান্ত পশুর মতো পূতিগন্ধময়। অস্তিত্বময় প্রতিশোধের আগুন নিয়ে ঘুম-ছুট হয়ে সে নিঃসঙ্গ রাত্রে পায়চারি করে একা-একা। কিন্তু সব নিষ্ফল। ও-পাড়ার সেই দুর্বৃত্তটা এমন আসুরিককমে শক্তিশালী যে তাকে শায়েস্তা করার কোনো ব্যবস্থাই নেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রতি সকালে ছোলা খাওয়াসহ তার হাজারখানেক ডনবৈঠক দেবার যেসব ভয়াবহ খবর মাঝেমধ্যে

কানে আসে, জুডো-কারাতিতে তার জাত্তব সাফল্যের যেসব তথ্য মেলে তা হতাশাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

এমনি সময় একদিন পাড়ার রাস্তা দিয়ে ডাকাতের মতো অতিকায় একটা লোককে হেঁটে যেতে দেখল সে। হ্যাঁ, তাকিয়ে দেখার মতো স্বাস্থ্য বটে তার। যেমন বলিষ্ঠ তার পেশি তেমনি আসুরিক দেহের বাঁধন। স্বাস্থ্যের অমিত উজ্জ্বলতা তার শরীর থেকে বিদ্যুতের মতো যেন ছিটকে পড়ছে!

অভাবিত আবিষ্কারের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লোকটা। হ্যাঁ, হবে, তার অসম্মানের দাঁতভাঙা প্রতিশোধ একে দিয়েই হবে। এমন প্রচণ্ড স্বাস্থ্যবান আর শক্তিশালী মানুষ ছাড়া কাকে দিয়েই-বা ঘায়েল করা সম্ভব ওই দাঁতাল জন্তুটাকে!

জ্যোতির্ময় দেবতাকে যেন সামনে দেখতে পেয়েছে এমনি প্রত্যাশা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল লোকটা। এগোতে এগোতেই মনে হল অদ্রলোককে সে যেন চেনে। পত্রিকায় তার ছবি দেখেছে। মনে পড়ল, বাংলাদেশের বক্সিং জগতের দুর্ধর্ষ কৃতী পুরুষ তিনি, ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান।

তার পুরো সমস্যাটা বক্সারের কাছে তুলে ধরল সে। সবশেষে বলল, এখন তার প্রার্থনা একটাই : প্রতিশোধ। তার অসহনীয় যন্ত্রণাদায়ক অসম্মানের উপযুক্ত দাঁতভাঙা প্রতিশোধ। সে যেভাবে তার কানদুটো মুচড়ে দিয়েছে ঠিক একইভাবে লোকটার কানদুটোও জনসমক্ষে শুধু মুচড়ে দেয়া। তবে তা তাঁর মতো শক্তিশালী মানুষের পক্ষেই সম্ভব। ভাগ্যের ইচ্ছায় স্বর্গের দানের মতো তিনি হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি অনুগ্রহ করে প্রতিশোধে সাহায্য করলেই যন্ত্রণার আগুন থেকে সে নিষ্কৃতি পায়।

অদ্রলোক মনোযোগের সঙ্গে তার সব কথা শুনলেন এবং তার এই বেদনাদায়ক অবস্থার জন্যে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করলেন। কিন্তু এরপরেই যা বললেন তা হৃদয়বিদারক। বললেন, যদিও নিজের স্বাস্থ্য ব্যবহার করে তাকে এই বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয় এবং তাঁর কনুইয়ের সামান্য একটু ধাক্কাই এর জন্য যথেষ্ট এবং তা করতে পারলে তিনি যারপরনাই আনন্দিতও হতেন, কিন্তু অসুবিধা এই যে, ব্যাপারটি হবার নয়। কেননা তিনি শারীরিক শক্তির উন্নতির জন্য বছরের পর বছর যে-সাধনা করে চলেছেন তা দেশের ভেতর দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের লক্ষ্যে নয়। তাঁর লক্ষ্য আগামী অলিম্পিকে বাংলাদেশের জন্যে বক্সিঙে একটি বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণপদক ছিনিয়ে আনা এবং এই জাতীয় গৌরবের লক্ষ্যেই তাঁর স্বাস্থ্যের যাবতীয় শক্তিকে তিনি ব্যবহার করতে চান।

একথা শুনে প্রতিশোধদগ্ধ লোকটা কি খুশি হবে যে-অমিত শক্তিকে তার স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করে এমন অভাবিত লাভ হতে পারত, এমন একটা খোঁড়া-যুক্তির হঠকারিতায় তা থেকে তাকে বঞ্চিত করার হতাশায় ক্ষোভে সে

হয়তো ক্রুদ্ধই হয়ে উঠবে। হয়তো এতটাই ক্ষুব্ধ হবে যে তার সবটা আক্রোশ তখন প্রথম লোকটাকে ছেড়ে দ্বিতীয় লোকটার ওপরেই পড়বে। প্রথম লোকটার কথা বেমালুম ভুলে সে হয়তো ছলে-বলে-কৌশলে দ্বিতীয় লোকটার অলিম্পিকে যাওয়া বন্ধ করার জন্যে মানবজন্মের যাবতীয় শক্তি ব্যবহার করতে শুরু করবে।

এভাবেই নিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায় সবার বিপক্ষ। নিজের শক্তিকে অন্যের স্বার্থে ব্যবহৃত হতে দিতে আপত্তি করলেই সে বিপক্ষ। তোমার শক্তি আছে অথচ আমার স্বার্থে তা পাওয়া যাচ্ছে না, এটা অসহ্য। জাতির এমনকি মানবজাতির যতবড় দরকারেই তাকে ব্যবহার করতে চাও, রেহাই নেই।

নিরপেক্ষ-যে সবাইকে বিপক্ষ করে তোলে তার আর-একটা বড় কারণ আছে। সব কালে সব দেশে যুধ্যমান দল মূলত দুটো। বাকিগুলো এদের গাঢ় বা ফিকে ছোপ। দু'দলেরই বিশ্বাস—সত্যের ধারক তারা। মিথ্যা যা সব ওই বিরুদ্ধশিবিরে। সুতরাং তাদের বক্তব্য : যদি সত্য হও তবে আমাদের দলে এসো, কেননা সত্য আমাদের পক্ষে। না হলে যাও ওই আপাদমস্তক মিথ্যার দলে। ওই-যে দূরে নদীর ধারে কিছু লোক নিজেদের সত্য ভাবার আত্মতৃপ্তি নিয়ে কুচকাওয়াজ করছে, ওদের কাতারে গিয়ে নাম লেখাও। বিপরীত দলের বক্তব্যও তাই : যদি সত্য হও তবে আমাদের দলে এসো, কেননা সত্য আমাদের পক্ষে। না হলে ওই-যে দূরে রাস্তা বরাবর একদল মূর্খ নিজেদের সত্য ভাবার আত্মতৃপ্তি নিয়ে আস্ফালন করছে তাদের দলে গিয়ে নাম লেখাও। যদি মিথ্যা হয়ে থাকো, ওদের সাথে ধ্বংসই তোমার নিয়তি! কিন্তু এ-দলেও নয় ও-দলেও নয়, দু'দলের মাঝখানে নিঃশব্দে হাঁটাহাঁটি করে কে হে তুমি দু'দলেরই সন্দেহ বাড়াচ্ছ? যে-দলে যাবার ঝটপট সেদিকে সটকে পড়ো, নাহয় তো পৃথিবী থেকেই বিদায় নাও। ওভাবে দু'দলের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে দু'দলকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য তোমাকে ঘুরঘুর করতে দেয়া যাবে না।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রেরও একই অবস্থা। আমাদের নিরপেক্ষতা বা সত্যপেক্ষতা, সবাইকে আমাদের বিরুদ্ধদলে ঠেলে দিয়ে, সবার থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। আমরা স্বার্থরক্ষা করি সমগ্র জাতির, কোনো দলের নয়। তাই কোনো দল আজ আমাদের পক্ষে নেই। আর নানান দল নিয়েই যেহেতু জাতি, তাই পুরো জাতি আজ আমাদের বিরুদ্ধে। আজকের বাংলাদেশে তাই আমাদের যাত্রা এমন নিঃসঙ্গ। তবু এ-জাতির একটা ব্যাপার কোনোদিনই আমাদের বিরুদ্ধে নয়—সেটা জাতির ভবিষ্যৎ। আমাদের সব চেষ্টা যত্ন শ্রম সেই চিরায়ত বাংলাদেশের জন্যে। আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র একদিন সমগ্র বাংলাদেশ হবে।

১৬

কেন্দ্রের সব মিলে অন্তত পঁচিশটা বছরের আয়ু দরকার। দশ বছর গেছে, আরও অন্তত পনেরোটা বছর।

যদি এর মধ্যে কেন্দ্রের ঈপ্সিত 'সেই আলোকিত মানুষদের' জন্ম ঘটে তাহলে কেন্দ্র এমনিতেই অপ্রয়োজনীয়। যদি না ঘটে তাহলেও কেন্দ্র নিষ্প্রয়োজন। পঁচিশ বছরেও যে পারেনি, পাঁচশো বছরেও সে পারবে না।

এর পরেও বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন হয়ে কী লাভ। টিকিওয়ালা স্বামীজিদের মেরুদণ্ডহীন পবিত্রতার লোল অচলায়তন হয়ে?

১৯৮৯

১৭

ধরা যাক ট্রেনে পাশাপাশি বসে দুই অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক দূরের রাস্তায় রওনা হয়েছেন। ঘণ্টা-দুই কেটে গেছে তবু তাদের মধ্যে কথা নেই। দুজনেই উদাস-চোখে বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ ট্রেন উঠল ভৈরব-ব্রিজে। মেঘনার কালো পানির জলজ-জগতে সার-সার নৌকার অপরূপ শোভাযাত্রার ওপর চোখ পড়তেই এক প্রৌঢ়ের চোখে ভেসে উঠল 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে এই জায়গাটার বর্ণনা। সেই জলের অপরূপ পৃথিবী—যার ওপর দিয়ে নায়ক মেঘনার অজানা সুদূর পথে পাড়ি জমিয়েছিল আর ফেরার পথে ডাকাতের হাতে নিষ্ঠুরভাবে তরুণী-বউ হারিয়ে মানসিক ভারসাম্য খুইয়েছিল। মনে-মনে দেখা এতদিনের দৃশ্যগুলো একমুহূর্তে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে দেখে এক অপার্থিব পুলকে যেন উপচে উঠলেন তিনি। ভেতরের সেই খুশিগুলোকে কারো সহৃদয় অনুভবের কাছে উজাড় করে দেবার আকুতিতে প্রায় আত্মবিস্মৃত হয়ে পাশের ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে বলেই উঠলেন, 'দেখেছেন কী আশ্চর্য নদী, হুবহু তিতাস একটি নদীর নামের সেই মেঘনা।'

'আরে আপনিও তাই ভাবছিলেন নাকি এতক্ষণ! আমি তো ভাবছিলাম একা আমিই বুঝি! দেখুন তো কী কাণ্ড!' বলে উদ্ভাসিত হাসিতে বলক দিয়ে উঠলেন যেন। 'আরে, পড়েছেন তাহলে আপনিও উপন্যাসটা! কী অদ্ভুত ছবিই-না আছে মেঘনার এই জায়গাটার।' বলতে বলতে বইটার আরো ভালো-ভালো জায়গা নিয়ে আলাপ-আলোচনায় সরগরম হয়ে উঠলেন তাঁরা। তাদের সে-উচ্ছ্বাস এমন যে কম্পার্টমেন্টের বাকি প্যাসেঞ্জাররা নিজেদের ভেতর চোরাহাসি বিনিময় করে বুঝে নিল আজ ভালোই খেপেছে দুই বুড়ো।

বোঝাই গেল প্রৌঢ় দুজনেই পড়তে ভালোবাসেন। কাজেই তাঁদের এই উদ্দীপনা কেবল একটা বইকে ঘিরেই সীমিত থাকল না। আরও বহু বই নিয়েই

তাঁরা একইরকম মত্ত অবস্থায় পথের বাকি সময়টা উড়িয়ে দিলেন। কল্পনা করতে বাধা নেই যে, এমনিভাবে মনের আনন্দ বিনিময় করতে করতে ট্রেনের মধ্যেই তাঁদের মধ্যে হয়তো এমন বন্ধুত্ব গড়ে উঠল যে এর সূত্র ধরে কিছুদিনের মধ্যে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে তারা রীতিমতো বেয়াই-ই হয়ে গেলেন।

বই জিনিশটা এমনি। একইরকম স্বপ্ন, খুশি আর রূপের জগতে আমাদের এরা জাগিয়ে রাখে, একইরকম সৌন্দর্য আর বসন্তদিনের অধিবাসী করে দেয়। এজন্যে একই বইপড়া মানুষ আসলে একই ভুবনের মানুষ—একই আনন্দ আর রূপের উদ্দীপনার জগতে পরস্পরকে বুঝতে-পারা, অনুভব করতে-পারা, কথোপকথন করতে-পারা মানুষ। এজন্যে সারাদেশে সবখানে আমাদের স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের সবাইকে আমরা গড়ে তুলছি একই বইয়ের ভেতর দিয়ে; তাদের মন ও বয়সের উপযোগী সেরা বইগুলোর ভেতর দিয়ে। বইগুলো সবই উপভোগ্য। এগুলোর ভেতর দিয়ে তারা উত্তীর্ণ হয় আনন্দের জগতে। একই সঙ্গে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বপ্নময় দীপ্তিময় মূল্যবোধ। বইগুলো তাদের আহ্বান করে উন্নত জীবনের দিকে। আমরা চাই বইগুলোর মধ্যদিয়ে আমাদের কেন্দ্রের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে যেন বেড়ে ওঠে একই হৃদয়ের একই স্বপ্নের একই আদর্শ আর মূল্যবোধের একটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী হিসেবে। পরস্পরকে বুঝতে-পারা, অনুভব করতে-পারা, সাহায্য ও জয়ী করতে-পারা সহযাত্রী ও বন্ধু হিশেবে—জাতির প্রয়োজনীয় ও অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিশেবে।

এখন প্রশ্ন : এসব বইয়ের বাইরে তারা কি কিছুই পড়বে না? নিশ্চয়ই পড়বে। কিন্তু সেগুলো তাদের নিজেদের আনন্দে বেছে-নেয়া, নিজ নিজ আলাদা উৎকর্ষের জন্যে খুঁজে নেওয়া বই। এই উৎকর্ষের ভেতর দিয়ে তাদের বিকাশ ঘটবে পূর্ণতর মানুষ হিশেবে। ওই পড়ারও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গড়ে-তোলা হচ্ছে সবখানে, কিন্তু তা আমাদের দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের ভেতর দিয়ে নয়, দেশভিত্তিক লাইব্রেরি কার্যক্রমের ভেতর দিয়ে, ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির ভেতর দিয়ে। দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের লক্ষ্য : দেশ; দেশভিত্তিক লাইব্রেরি কার্যক্রমের লক্ষ্য : পৃথিবী। কিন্তু দেশ যেহেতু বিশ্বের পূর্বশর্ত, তাই দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের গুরুত্ব এই মুহূর্তে আমাদের কাছে বড়।

১৮

একটা বাঘের বেঁচে থাকার জন্যে জঙ্গলের মধ্যে গড়ে দশ-বর্গমাইল জায়গা দরকার হয়। এর কম হলে সে বাঁচে না। ওই সীমিত পরিসরে তার সহজাত জীবন এবং শক্তিমত্তার প্রসার ঘটে না, খাদ্যের সাশ্রয় হয় না, জৈবিক ও মানসিকভাবে ক্লিষ্ট হতে-হতে সে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এজন্যেই দশ-বর্গমাইলের মধ্যে কোথাও দুটো

বাঘ এসে পড়লে হয় একটাকে জীবন হারাতে হয়, নয়তো প্রাণ নিয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়।

আমি এর আগে একবার লিখেছিলাম—আমাদের দেশে জনসংখ্যা আছে, মানুষ নেই। মানুষ নেই মানে কি বাংলাদেশ জনশূন্য? না। বারো কোটি মানুষের দেশকে এ-কথা বলা দেশকে অপমান করারই শামিল। আসলে আজ আমাদের যা নেই তা 'মানুষ' নয়, 'মানুষের মতো মানুষ'—প্রাচীন গ্রামীণদের ভাষায় 'গাছ-মানুষ'—যাঁরা গাছের মতো স্থির প্রশাখাবহুল আর সমুন্নতভাবে দাঁড়িয়ে মানবজন্মের দুঃখ ও দায়িত্বকে ধারণ করেন। নেই সেই 'বাঘ-মানুষ', শক্তির ধারকত্বপূর্ণ দুর্জয় আর পরাক্রমবান ব্যক্তিত্ব, যাদের আগ্রাসী উদ্দাম জাতীয় ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে।

আচ্ছা, ওই দশ-বর্গমাইলের হিশেবে কটা 'বাঘ-মানুষ' দরকার আজকের বাংলাদেশের জন্য? এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের জন্যে? নিশ্চয়ই পাঁচ হাজার ছয়শোর বেশি নয়। ওই সামান্য কজন মানুষের খোঁজেই তো আজ কেন্দ্রের এতসব কাণ্ডকারখানা আর আয়োজন। এমন দেশ-ছাপানো জনসমাগম!

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : গাছে আম হয় কটা, কিন্তু মুকুল আসে কত! মুকুলের এই কোটি কোটি অবিশ্বাস্য সম্ভারকে অন্তহীনভাবে কেবলি স্বাগত জানাতে হবে। না হলে ওই নিটোল সুঠাম হাতে-গোনা ফলগুলো পাব কী করে? মাও-সে-তুং-এর মতো আমরাও বলি : শত ফুল ফুটুক।

দেশব্যাপী কেন্দ্রের চত্বরগুলোয় আজকের এই-যে বাঁধভাঙা মানুষের জোয়ার, এই-যে অতিকায় বিশাল কোলাহলমুখর আয়োজন—এসব তো শেষপর্যন্ত কয়েকটি পরিপূর্ণ মানুষেরই জন্যেই।

১৯

কেন্দ্রে আমরা 'গাধা পিটিয়ে মানুষ' করি না। আমরা মনে করি কেউ যদি সত্যিসত্যি গাধা হয় তবে সে যেন উন্নততর গাধাই হয়, ছাগল হলে বড় আকারের ছাগল। কেউ যদি বাংলার পাঁচ হয় সে যেন বিশালতর একটা পাঁচ হয়। গাছ হলে বটবৃক্ষ। একাকার হওয়ায় নয়, স্বাতন্ত্র্যে আর বিকাশে আমরা বিশ্বাসী। ছোট হয়ে থাকারই আমরা কেবল বিরুদ্ধে।

১৯৯০

২০

একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথন :

প্রশ্ন : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তুলে আপনারা কি এদেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের উৎখাত করতে চান?

উত্তর : না, আমরা কাউকে ধ্বংস বা উৎখাত করতে চাই না। আমরা উন্নত বৃক্ষ রোপণ করতে চাই, যে-বৃক্ষ অন্তর্গত শক্তি আর স্বভাবগুণে অন্যদের চেয়ে উঁচু হয়ে নিজেদের ঘন সবুজ পাতাবহুলতার নিচে তাদের ক্ষুদ্র তৎপরতাকে ঢেকে দেবে।

২১

আমরা টাকা দিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তুলিনি। এখানেই দেশের আর দশটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য। এটাই আমাদের গৌরব। একটা সুন্দর পরিবারের মতো আমরা বেড়ে উঠেছি, আমাদের ভিত্তি ছিল ভালোবাসা। আমাদের টাকা ছিল না, তাই আমাদের চরিত্র ছিল। স্বেদ, শ্রম আর বেদনার ভেতর দিয়ে এই চরিত্র তৈরি হয়েছে। অশ্রু আর দুঃখের অস্থিতে গড়ে উঠেছে আমাদের এই কেন্দ্রের দধীচি। তাই তার অস্থিতেই তৈরি হচ্ছে বজ্র।

আমরা জানতাম টাকা আমাদের দরকার আছে, কিন্তু তা যেন কিছুতেই আমাদের যোগ্যতাকে ছাড়িয়ে না যায়। যোগ্যতা যখন একশো হবে তখন যেন আমাদের হাতে একটা টাকা আসে। তাহলে ওই এক টাকায় আমরা একশো টাকার কাজ করতে পারব। আমরা বিশ্বাস করেছি যোগ্যতা চলবে বাড়ির প্রভুর মতো আগে আগে; টাকা আসবে পেছনে পেছনে, তার অনুগত কুকুরের মতো। এই যোগ্যতা আমরা তৈরি করতে চেয়েছি। আমরা জানতাম এই যোগ্যতা যদি আমরা তৈরি না করি তবে আমরা হয়তো টাকা আনতে পারব কিন্তু বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তৈরি করতে পারব না।

আমি চিরকাল টাকাকে ভয় পাই। টাকা ভালোবাসাবিরোধী। প্রেমকে সে অপমান করে, চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। টাকা দিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো এমন সজীব একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের টাকা ছিল না বলে আমরা বন্ধু পেয়েছিলাম। টাকা আসলে সেই বন্ধুরা ক্রেতা হয়ে যেত।

আজ কেন্দ্রের দিকে অনেকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ভালোবাসা দিয়ে আমরা যে অসাধ্য প্রাসাদ তৈরি করেছি, তা দেখে অবাক হয়েই তাঁরা আসছেন। কিন্তু ভালোবাসা দিয়ে যাকে আমরা গড়েছি, ভালোবাসা দিয়েই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। টাকার বাক্সে আমাদের দরকার কী।

১৯৯০

২২

সেদিন 'বিচিত্রা'র একজন সাংবাদিক বললেন : আপনার প্রতিষ্ঠান আপনার চেয়ে শক্তিশালী হয়ে আছে—এটা ঠিক হচ্ছে না। সৃষ্টি স্রষ্টার চেয়ে বড় হতে পারে না। পৃথিবীতে যে সবচেয়ে শক্তিশালী সে সবচেয়ে বড় নাও হতে পারে। দেশের প্রধান

সেনাপতি দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ, কিন্তু সবচেয়ে বড় নয়। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে যে-আলোর পৃথিবী রয়েছে, তা তার নেই। আপনার চারপাশে আলোর সেই বৃত্ত কোথায়? বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা হিশেবে আপনার ভাবমূর্তি এখনো জাতীয়ভাবে প্রদীপ্ত নয়। শিক্ষক, সাহিত্য-সংগঠক বা টিভি-ব্যক্তিত্ব—এসবকে পিছে ফেলে এই কেন্দ্রের প্রধান হিশেবে আপনার পরিচয় দেশের মানুষের কাছে এখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। কেন্দ্রের স্রষ্টা হিশেবে আপনার প্রচারের ব্যাপকতা কেন এত কম? সৃষ্টি তো স্রষ্টার অংশ। সে কেন আপনার চেয়ে বড় হয়ে থাকবে? প্রতিষ্ঠানের দুঃখে বিপর্যয়ে এতবড় একটা জিনিশকে বাঁচাবে কে? কেন্দ্রের স্বার্থেই কেন্দ্রের চেয়ে আপনার বড় হয়ে ওঠা দরকার।

আমি জানি, দেশের পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে প্রতিটা প্রচারমাধ্যমের অঙ্গনে আমার যতটুকু ব্যক্তিগত পদচারণা রয়েছে তা দিয়ে কেন্দ্র এবং তার ভাবমূর্তিকে জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তোলা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। তাহলে কেন তা থেকে নিজেদের গুটিয়ে রাখার এত সচেতন চেষ্টা?

কার লেখায় যেন পড়েছিলাম : বাঙালিরা জন্মায় নিঃশব্দে, বেঁচে থাকে নিঃশব্দে, এমনকি খ্যাতিমান হয় নিঃশব্দে। অবাক হয়েছিলাম কথাটা পড়ে। নিঃশব্দে খ্যাতিমান হয় এ কেমন কথা? খ্যাতি আর নৈঃশব্দ তো পরস্পরবিরোধী। পরে বুঝেছি, হয়—আর কোথাও এ না হলেও অন্তত এদেশে হয়। ভালোকিছু করতে গেলে এমনকি বিখ্যাত হতে গেলেও লুকিয়ে, নিঃশব্দে সবার অজান্তে চোরের মতোই তা হতে হয়। বিদেশে ফুটবলখেলায় গোল করার পর কিংবা অভাবনীয় কোনো ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখানোর পর চারপাশের লক্ষ লক্ষ ভক্তের মুহুর্মুহু করতালির সামনে যেভাবে খেলোয়াড়েরা আকাশের দিক লাফিয়ে উঠে হাত ছুড়ে বিজয়গৌরব প্রতিষ্ঠা করে, এদেশে সেটা সম্ভব নয়। এখানে খারাপ কাজই কেবল বুক ফুলিয়ে করা যায়, ভালো কিছু নয়। এদেশে যে-কোনো সাফল্যের চেহারাই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো। সাফল্যের অপরাধে নতজানু ও গলবস্ত্র হয়ে সবার সামনে বিনীতভাবে এখানে বলতে হয় : 'মূঢ় আমি, নির্বোধ আমি, সর্বতোভাবে বোধশক্তিহীন। কোনো যোগ্যতা নেই। যতটুকু সাফল্য হয়েছে তা নেহাতই আপনাদের দয়ায়। আপনারা আমাকে দোয়া করবেন।' একথা বলতে পারলে তবেই কেবল এদেশে স্বীকৃতি। কোটি কোটি ব্যর্থ আর হীনমন্যতাক্লিষ্ট মানুষের এই দেশে কোনো সাফল্যকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দিত করার ইতিহাস বিরল হওয়ারই কথা।

এদেশে মানুষ উৎভূমিক (Vertical) উন্নতিতে বিশ্বাস করে না। পরিপার্শ্বের সঙ্গে নির্মম যুদ্ধে জিতে কেউ নিজেকে সামান্য সোজা করে একটু দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছে কি সবার চোখ পড়ে যাবে সেদিকে :

'মাথাটা যেমুন একটু উঁচা উঁচা দেখন যায়। পালিশ কইরা দিতে হয় তাইলে।' সাহুওরা সম্মতি জানিয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়ে।

প্রথম থেকেই টের পেয়েছিলাম এদেশে ভালো কিছু করতে হলে করতে হবে অজান্তে, অলক্ষে। তার বিকাশ খাড়া বা উৎভূমিক (vertical) হলে চলবে না, হতে হবে অনুভূমিক (horizontal)। নিঃশব্দ সাফল্যই এদেশের একমাত্র শর্ত। একারণেই রাজধানীর ভেতর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে উঁচু করে তৈরির চেষ্টা করিনি। একই জিনিসকে সারাদেশে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিয়েছি। ঢাকায় একটা উঁচু মনুমেন্ট গড়ে-তোলার চেয়ে সারাদেশকে ছোট ছোট তুলসীতলার অজস্র প্রদীপে ভরে দেয়া ভালো। চারপাশের হাজার হাজার ঈর্ষা আর হীনতার ক্ষিপ্ত-চোখ ফাঁকি দিয়ে আমাদের এগোতে হচ্ছে। সাংবাদিককে বললাম : পত্রপত্রিকা বেতার-টেলিভিশন বা ওই জাতের অন্যান্য প্রচারমাধ্যমের সাহায্য নিয়ে আমাদের মতো আলোকপ্রত্যাশী একটি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি গড়ে-তোলা উচিত নয়। ওই অকর্ষিত প্রচারমাধ্যমগুলো পণ্যকে জৌলুশ দিতে পারে, মানুষের অন্তর চেতনাকে নয়। যে-মাধ্যমের ভেতর দিয়ে আমাদের পরিচয়কে সারাদেশের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে, তাকে হতে হবে আরও সূক্ষ্ম, সতর্ক, গভীর, ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদি। আমাদের কর্মসূচিগুলোর ভেতর দিয়ে সারাদেশে যেসব হাজার হাজার আলোকিত চিত্ত আর চিন্ময় বিকাশের দিকে পাপড়ি মেলছে তাদের আত্মার উজ্জীবিত শব্দই একদিন আমাদের ঈপ্সিত প্রচারমাধ্যম হয়ে জাতির কাছে কথা বলবে।

১৯৯১

২৩

কেন্দ্রের পাড়াতে আমার এক মামাতো বোনের বাসা। একদিন হাঁটতে হাঁটতে সেখানে গিয়ে দেখলাম, বাসাসুদ্ধ হুলস্থুল, কাজের মেয়েটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে নিয়ে কথা বলতে বলতেই হঠাৎ সে কোথা থেকে এসে হাজির। মেয়েটার বয়স দশ-এগারো। মামাতো বোন ওকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠল, 'গিয়েছিলি কোথায়?'

মেয়েটা আমাকে কখনো দেখেনি, কিন্তু বাসার সবার কাছ থেকে আমার ডাকনাম শুনেছে। সবার কথাবার্তা থেকে ও বুঝে নিয়েছে যে আমিই পাড়ার ঐ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রটার মালিক(?)।

মামাতো বোনের ধমকের উত্তরে সে নির্বিকারভাবে জবাব দিল, 'লালুভাইয়ের মুড়ির দোকানে গিয়েছিলাম।' বলা বাহুল্য, লালু আমারই ডাকনাম। আমার বোনের পরিবারে ঐ নামেই আমি পরিচিত।

কিন্তু বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লালুভাইয়ের মুড়ির দোকান কেন? হিসাব সোজা।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে একটা ক্যাফেটেরিয়া আছে, সেখানে অনেককিছুর মতো গরম ভাজা মুড়ি কিনতে পাওয়া যায়, প্রায়ই তাকে তা কিনতে পাঠানোও হয়। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মালিক লালুভাই, কাজেই ঐ দোকানের মালিকও নিশ্চয়ই তিনি, তাই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লালুভাইয়ের মুড়ির দোকান।

বলাবাহুল্য, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অনেক পরিচয়ের মধ্যে এটাও একটা।

একেকজনের কাছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একেক পরিচয়। কারো কাছে এ একটা লাইব্রেরি, কারো কাছে ভালো ভালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জায়গা, কারো কাছে গাছপালা ছাওয়া একটা সবুজ পরিবেশ, কারো কাছে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বই-পড়ানোর প্রতিষ্ঠান, কারো কাছে 'নাস্তিকদের হেডকোয়ার্টার'—এমনি অনেক কিছু। কেন এই বিভ্রান্তি? কেন মানুষের কাছে আমাদের কাজগুলোকে আজও আমরা ঠিকমতো পরিচিত করতে পারিনি? কেন সবার কাছে আজও আমাদের প্রত্যয়গুলো স্পষ্ট নয়?

এর কারণ একটাই : প্রচারের অভাব। আমরা কাজ করছি কিন্তু তার খবর পত্রিকায় পাঠাতে উৎসাহী নই। আমরা এগিয়ে গেছি ক্যামেরার চোখ এড়িয়ে, লোকচক্ষুকে আড়াল করে। এটা করতে নেই। সবকিছুরই কমবেশি অবহিতির দরকার আছে। সবকিছুকেই তুলে ধরতে হয়। না হলে তার আসল পরিচয় ঝাপসা হয়ে পড়ে। অতিকথনের মতো অল্পকথনও অশিল্প।

তুলে ধরতে হবে মানে এ নয় যে দশটা মাইক্রোফোন ভাড়া করে ঢাক পিটিয়ে প্রচারাভিযানে নামতে হবে। তুলে ধরতে হবে মানে অবহিত করতে হবে। আমরা কী করছি তা মানুষের গোচরে রাখতে হবে। বলতে হবে : আমরা এই সুযোগগুলো সবার জন্যে খোলা রেখেছি। আপনারা আপনাদের দরকারমতো এসে এগুলো নিন। এতে আপনাদের ভালো হবে। আমাদের সুযোগগুলো সবাইকে পৌঁছানোর জন্যেই তো আমাদের এইসব কর্মকাণ্ড। ঠিকমতো অবহিতির অভাবে যদি সে সুবিধাগুলোর কথা দেশের মানুষ জানতেই না পারল, তারা যদি সেগুলো ব্যবহারের জন্যে এগিয়েই না এল তাহলে তো আমাদের সব উদ্যোগই বৃথা।

সবই বুঝি, তবু কেন্দ্রের ভেতর প্রচারের উৎসাহ বাড়ে না। উৎসবের জোয়ার জাগে না। উজ্জ্বল রঙিন পোস্টার-ফেস্টুনে পৃথিবী ঢেকে ফেলার উৎসাহ মঞ্জরিত হয় না, কেবল একটানা কাজের স্রোত শান্ত নিঃশব্দ ধারায় বয়ে যায়। যেন সে একটা একটানা নিয়মবাঁধা বিনীত নিরবচ্ছিন্ন নদী, কুলকুল শব্দ তুলে একমনে অনন্তের দিকে বয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমাদের উদাসীনতা যে কতবেশি তার একটা প্রমাণ দিই। আজ অব্দি আমরা কেন্দ্রের ওপর কোনো ডকুমেন্টারি তৈরি করিনি। এর ওয়েবসাইটও খুলিনি। কেন্দ্রের কোনো শাখায় একটা সাইনবোর্ড পর্যন্ত লাগানো হয়নি। পাঁচ-পাঁচশো শাখা! প্রত্যেকটা শাখা বরাবর বড় রাস্তার

ওপর একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলেও তো বাংলাদেশ ভরে যায়। দেশের এনজিও-গুলো তো সবাই এই সাইনবোর্ডের ঝাণ্ডা উঁচিয়েই টিকে আছে! আমরা তবে কেন করি না?

যেসব মানুষ প্রতিষ্ঠান তৈরি করে তাদের চরিত্রের শক্তি এবং দুর্বলতা দুটোই প্রতিষ্ঠানের গায়ে স্পষ্ট রেখায় ফুটে থাকে। প্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দ তাদের ঐসব দোষ বা গুণগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমার স্বভাবের কিছু ভালো দিক যে কেন্দ্রের জন্যে লাভজনক হয়নি তা নয়, কিন্তু সেইসঙ্গে এমন কিছু দুর্বল দিক কেন্দ্রকে প্রভাবিত করেছে যাতে সব পুণ্য একসঙ্গে ভেস্তে যাবার জোগাড় হয়েছে। দুটো জায়গায় আমার দুর্বলতা প্রকট। আমার ভেতর অর্থের বা প্রচারের আকুতি নেই। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে কেন্দ্রের ওপর। প্রথমটার অভাবে কেন্দ্র গরিব হয়ে রয়েছে, দ্বিতীয়টার অভাবে অপরিচিত। একজন মানুষ নিজস্ব ইচ্ছা বা খুশিতে গরিব হয়ে থাকতে পারে বা অন্যের চোখের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের গরিব বা অপরিচিত থাকার অবকাশ নেই! প্রতিষ্ঠানকে তো মানুষের উপকারে আসতে হয়। সে কী দিতে চাচ্ছে এটা তো মানুষকে অবহিত করতে হয়। এ না হলে ঐসব মানুষ তার কাছে থেকে প্রয়োজনের মুহূর্তের তৃষ্ণার জল নিতে আসবে কী করে? আর খুববেশি গরিব থেকে গেলে ভালোমতো উপকারই বা কী করে করা সম্ভব তার পক্ষে!

তবু কেন্দ্রের অপরিচিত থেকে যাবার আসল কারণ, আমার ধারণা, এসবের কোনোটাই নয়। আসলে কেন্দ্রের মূল ভাবনা আর কর্ম-প্রক্রিয়াটাই এমন বিমূর্ত আর প্যাঁচালো যে চট করে মানুষকে তা বোঝানো কঠিন। আমি হিসাব করে দেখেছি একজন মানুষকে এর আগাগোড়া ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করাতে প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময় লাগে; তাও যদি আমি নিজে সে-ব্যাপারে শক্তিক্ষয় করি। আজ সারাদেশের সবখানে আমরা উদ্যমশীল, সংস্কৃতিবান ও সুযোগ্য ব্যক্তিদের নেতৃত্বে যে পাঁচশো ছোট ছোট শাখা বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলেছি সেসব কেন্দ্রে মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ বইগুলোর পড়াশোনা এবং সজীব সাংস্কৃতিক পরিবেশের ভেতর থেকে আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে উচ্চায়ত মূল্যবোধ, উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং অমেয় চেতনার বিকাশ ঘটছে সেই সমৃদ্ধ চেতনা ও মনুষ্যত্ব দিয়ে তারা যখন কর্মজগতে প্রবেশ করবে তখন একটা সমৃদ্ধতর বাংলাদেশকে নির্মাণ করবে—কী করে এমন একটা সুদূর, দীর্ঘমেয়াদি আর অনিশ্চিত ব্যাপার মানুষকে বোঝানো সম্ভব। কী করে এই ফলাফলের নিশ্চয়তা দেব? একদিন এর ফলশ্রুতিতে দেশে যেমন অনেক অনন্যসাধারণ ঘটনা ঘটতে পারে তেমনি আবার সবকিছু তো ভণ্ডুলও হয়ে যেতে পারে। সব মানুষ তো যুগের বা জাতির বেদনার প্রত্যুত্তর দেয় না, কেউ কেউ দেয়। কে সেই উত্তর দেবে, কার কাল আর পরিপার্শ্ব তাকে আনুকূল্য

দেখাবে, কে এই বিপুল স্রোতপ্রবাহের ভেতর বিলুপ্ত হবে, কে বেঁচে উঠবে—কী করে সেইসব রহস্যময় আর অজানিত ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করব? কী করে এন.জি.ও-দের মতো ছিমছাম বার্ষিক মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করব? বিসর্জন নাটকে রঘুপতি যা বলেছিল এ তো তাই : 'বহে যাহা মর্মমাঝে রক্তময়/ বাহিরে তা কেমনে দেখাব?' আমাদের গোটা কাজটা তো এমনি এক অবান্তর রহস্যলোক নিয়ে খেলা। আকাশই এর সীমানা। এ যদি কোনো বস্তুনির্ভর ব্যাপার হত, উন্নত চাষাবাদ বা উন্নত হাঁস-মুরগি বা গবাদি পশু পালনের ব্যাপার হত; উন্নতির রেখাচিত্র এঁকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারতাম কী আমাদের অর্জন। কিন্তু হৃদয়লোকের এই রহস্যময়, দুরূহ, জটিল আর অনিশ্চিত সম্ভাবনার ওপর কী করে দৈববাণী করি?

১৯৯৯

১৪

সরদার আশরাফউদ্দীন বাবুলের গান সবসময়েই আমাকে একটা গভীর মধুর অনুভূতিতে আপ্লুত করে। একজন আদিম মানুষের জন্মান্ধ ও বন্যশক্তি আছে তাঁর ভেতর, সেইসঙ্গে সুকৃত পরিশীলন। তিনি পল্লিগান করেন। আমার ধারণা ফরিদা পারভিন না হলেও অনেক ভালো পল্লিসংগীত গায়কের কাছাকাছি গায়ক তিনি। কেন্দ্রে দুবার তাঁর একক সংগীতানুষ্ঠান শোনার সুযোগ আমার হয়েছে। অবিশ্বাস্য সেই অভিজ্ঞতা! অনুষ্ঠান ঘণ্টাখানেক চলার পরেই মনে হতে শুরু করল সমস্ত অনুষ্ঠান-ঘরটা জুড়ে স্বর্গ যেন ধীরে ধীরে এক অনির্বচনীয় মাধুরী হয়ে নেমে আসতে শুরু করেছে। একটা অনন্য সৌন্দর্যের ছোঁয়ায় সবাই কেমন যেন সুস্মিত হয়ে উঠছি। একবার অনুষ্ঠানের শেষদিকে তিনি সবাইকে এমন একটা সংগীতের স্বর্গীয় প্রজ্বলনের মধ্যে জ্বালিয়ে তুলেছিলেন যে আমি পাগলের মতো ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলাম।

সর্দার বাবুল আমাদের 'আলোকিত মানুষ চাই' কথাটার খুব ভক্ত। সেদিন আমার সঙ্গে গাড়িতে যাচ্ছিলেন তিনি। গাড়ি চালাচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ নিজে থেকেই বলতে লাগলেন, 'আপনাদের 'আলোকিত মানুষ চাই' কথাটা আমার খুব পছন্দ, স্যার। আলোর চেয়ে বেশি দরকারি আজ আর কী থাকতে পারে এদেশে? আমাদের সবখানে যখন এত অন্ধকার।' তাঁর কথা শেষও হয়নি, এমন সময় পাশেই রাস্তার ওপর একজন লোক হঠাৎ 'ওয়াক থু' করে রাস্তার ওপর কিছুটা থুতু ফেলল। বাবুল সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'অন্ধকার দেখলেন স্যার!' এরপর মিনিটখানেকও যায়নি, হঠাৎ দেখা গেল, রাস্তার উল্টোদিকে কিছু লোক দলবেঁধে মারামারি শুরু করেছে, তাদের ঘিরে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোকের জটলা আর

ছোটাছুটি। সর্দার বাবুল বললেন, 'দেখেন স্যার অন্ধকারটা।'

বাবুল বলে চললেন, 'অন্ধকার কোথায় নেই আজ আমাদের দেশে বলেন? পরীক্ষার হলে, সন্ত্রাসে, রাজনীতিতে, দুর্নীতিতে, কোথায় নেই? এমন অন্ধকারের মধ্যে আলোকিত মানুষ না হলে কি চলবে?'

১৯৯৯

২৫

আজ অন্তত একশোটা সস্তা রুচিহীন বিনোদনসর্বস্ব টিভি-চ্যানেল আমাদের ড্রয়িংরুম দিয়ে ঢুকে বেডরুম রান্নাঘর হয়ে বাড়ির ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, অথচ বইকে বাড়ি থেকে একশো মাইল দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা চিৎকার করছি : 'মানুষ বই পড়তে চাচ্ছে না'। এ কি বইয়ের প্রতি ন্যায়বিচার হল?

২৬

বছরকয়েক আগে অধ্যাপক 'র' আমাকে রসিকতা করে বললেন : আপনি যদি কিশোর-তরুণদের মতো বয়স্কদেরও পড়াতে পারেন তবে আপনার নাম আমি অমুক পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেব।

পুরস্কারের নাম শুনে চমকে উঠলাম। জানতাম তিনি বাংলাদেশ থেকে ঐ পুরস্কারের মনোনয়ন দেবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। জবাবে তাঁকে বললাম : বুড়োদের পড়াতে যাব কোন্ দুঃখে স্যার? আমি মানুষ সামান্য বলে আমার কি সময়েরও দাম নেই? কেন তাদের পড়াব? তারা তো কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। ঐ পড়াশোনার ভেতর দিয়ে তারা যা আহরণ করবে তার ব্যবহার করবে কখন? করলেও নির্বীজ বার্ধক্য দিয়ে মানুষকে তারা দেবেটা কী? এই উৎকর্ষ তো সমাজে সঞ্চারিত হবে না। তাছাড়া এই বয়সে বই থেকে তারা আহরণই বা করবে কী? তাদের হৃদয় তো মৃত। মস্তিষ্কের নিউরোন তাদের ঝরে গেছে, গ্রহণ-ক্ষমতা নির্জীব। কোন্ সপ্রাণ সম্পদ আহরণ করবে তারা? পৃথিবীকে দেবার জন্য তো দরকার রক্তিম তাজা হৃদয়। আহরণের জন্যও। সে হৃদয় তাদের কোথায়? আমরা বুড়োরা তো বাংলাদেশের অতীত। আমি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকালকে চাই। চাই কিশোর-তরুণদের। সেইসব কচি, অনুভূতিময়, উৎসুক, স্বপ্নেভরা মুখগুলোকে—যারা আসছে। সেইসব মুখ যারা কৌতূহলী, গ্রহণক্ষম, অনুসন্ধিৎসু; যারা উন্মুখ, উৎকর্ণ, সজাগ। যাদের ভেতর স্বপ্নের বীজ, সৌন্দর্যের ছোঁয়া একবার জ্বালিয়ে দিতে পারলে আগামী পঞ্চাশ বছর ধরে তা দেশকে আলোকিত করে রাখবে।

২০০৪

২৭

আমার খুবই একজন পরিচিত মানুষ, দারিদ্র্যবিমোচন ধরনের একটা বেসরকারি সংস্থার ডাকসাইটে কর্ণধার, একদিন ঠেস দিয়ে বললেন : আপনারা তো 'তৃণমূল' নন। মানে, আপনারা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লোকেরা তো গ্রাম-পর্যায়ের দুঃখী মানুষের কষ্ট দূর করায় অংশ নেন না, কেবল আলোকিত মানুষের অবাস্তব ভাববিলাসে সময় কাটান। এককথায় মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীদের জন্য কাজ করেন। আমাদের মতো জনমানুষের দুঃখমোচনে জীবন দিন, তবেই না বুঝব আপনারা সত্যিকার জনসেবা করছেন।

ভদ্রলোক নিজে একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ। তাই সুযোগ পেয়ে বললাম : এত যে তৃণমূল তৃণমূল করছেন, আপনি নিজে কোন্ তৃণমূল? সাতপুরুষ ধরে বাবুগিরি করে এখন এসেছেন তৃণমূলের বাণী শোনাতে। তৃণমূলদের আন্দোলন কি কোনোকালে তৃণমূলেরা করেছে? দারিদ্র্য আর দুর্দৈবের হাতে নিষ্পেষিত মানুষদের পক্ষে তা কি সম্ভব? চিরদিনই তো এ করেছে আপনাদের মতো সুখ-প্রত্যাখ্যানকারী একদল আত্মোৎসর্গিত সচ্ছল মানুষ। কিন্তু আপনারা তো প্রকৃতি থেকে আসা বেদনাজাগ্রত কিছু মুষ্টিমেয় লোক। সংখ্যায় কজন আপনারা? এই ছোট্ট সংখ্যা দিয়ে কি জাতির এতবড় সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে? দেশে আপনাদের মতো মানুষ তো চাই আজ হাজারে লক্ষে। কেবল প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিলে কি তাদের পাওয়া যাবে? সারাদেশে আপনাদের গড়ে তোলার জন্যে তো চাই বিরাট আকারের কারখানা। এজন্যেই আজ সারাদেশে আমাদের এই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। আমাদের চিনতে ভুল করেছেন আপনি। আমরা এলিটিস্ট নই। তবে আপনাদের সঙ্গে একটা পার্থক্য আছে আমাদের। আপনাদের মতো আমরা সরাসরি 'তৃণমূলের' দুঃখ দূর করি না। আমরা সেইসব মানুষ গড়ে তোলার চেষ্টা করি যারা একদিন সারাদেশের তৃণমূলদের দুঃখ নিরসনের জন্য সংগ্রাম করবে।

তাঁকে বললাম : দেখুন, পৃথিবীতে বিভিন্ন জিনিশ তৈরির বিভিন্ন ধরনের কারখানা রয়েছে। যেমন ধরুন পাটকল। এ দিয়ে তৈরি হয় পাটের জিনিশপত্র—চট, বস্তা, কার্পেট। পোশাকশিল্পের কারখানা থেকে তৈরি হয় হরেক রকমের পোশাক-আশাক। গাড়ির কারখানায় তৈরি হয় গাড়ি, অস্ত্রের কারখানায় অস্ত্র, ওষুধের কারখানায় ওষুধ। কিন্তু এগুলো তো হল পণ্য-উৎপাদনের কারখানা। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ভোগ্যপণ্য উৎপাদিত হয় এদের থেকে। কিন্তু এদের পাশাপাশি আর-একধরনের কারখানা তো আছে যাদের বলা হয় কারখানা তৈরির কারখানা। এদের কাজ পাটকল, চটকল, গাড়ির কারখানা, কম্পিউটার কারখানা, অস্ত্রকারখানা, ওষুধ কারখানা—এমনি তাবৎ রকমের কারখানা বানানো। এদের নাম ভারী-শিল্প। আমরা হলাম সেই কারখানা তৈরির কারখানা। জাতি নির্মাণের

ভারী-শিল্প। যারা তৃণমূলদের জন্য বেদনাবিদ্ধ হবে, প্রাণ দেবে, তাদের রক্ষা করবে—এই মানুষদের জন্ম দেবার জন্যই তো আমরা।

২০০৪

২৮

অনেকে মনে করেন বুদ্ধি আর চিন্তা এক জিনিশ। আসলে তা নয়। বুদ্ধি চিন্তা নয়, চিন্তার উপাদান। বুদ্ধিকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করা গেলে চিন্তা হবে সেই ফুল দিয়ে গাঁথা মালা। চিন্তা একটা দার্শনিক ব্যাপার। এ একটা মনন- জাগতিক জিনিশ। এর অভাবে মানুষ চিরদিন শিশু থেকে যায়। কেবল মানুষ না, অনেক সময় একটা গোটা জাতিও এরকম থেকে যেতে পারে। এমন অনেক জাতি আছে যাদের বয়স দু-তিন হাজার বছর হয়ে গেছে কিন্তু আচরণ করে শিশুর মতো। আমার ধারণা আমাদের জাতির হালও অনেকটা এমনি। আমাদের প্রায় প্রতিটি মানুষের ভাবনা ও আচরণ শিশুদের মতো। এই জাতির মনকে চিন্তার সহযোগে সাবালক করতে হবে। করে তুলতে হবে দর্শনমনস্ক। বয়স্ক। তাই চাই মননের আধার—বই। প্রতিটি বাড়ির প্রতিটি দরজাই বই। সারাদেশের সবখানে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি।

২০০৪

২৯

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শাখাগুলো নিয়ে অনেকের মধ্যে বেশ ভুল ধারণা আছে। যখন তারা আমাদের পাঁচশো শাখার কথা শোনে তখন তাদের সামনে বিদেশি সাহায্যে চলা বেসরকারি সংস্থাগুলোর শাখার ছবি ভেসে ওঠে। একটা পরিপাটি অফিস, মিলনায়তন, ছিমছাম লাইব্রেরি আর দৃষ্টিনন্দন বাগান নিয়ে গড়ে-ওঠা এক-একটা কেন্দ্র—যেখানে পড়াশোনা আর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একটা নিরবচ্ছিন্ন স্রোত সুস্থির ধারায় বয়ে চলেছে।

না, আমাদের শাখাগুলো আদৌ এরকম নয়। আমাদের কেন্দ্র কোনো গৎবাঁধা প্রতিষ্ঠান নয়। এ একটা আন্দোলন। আন্দোলন ঘরের ভেতর হয় না, হয় রাস্তায়। তাই আমাদের ঘরের আকুতি নেই। ঘরে কার্পেটের পুরুত্ব যত বাড়ে, স্থূল ভোগের ভারে আন্দোলন তত মুখ থুবড়ে পড়ে। তাই কার্পেট বা ঘর থেকে আমরা দূরে। আমরা জানি টাকাকড়ি দালান অফিস এসব দিয়ে দিনগত পাপক্ষয় করার মতো একটা প্রতিষ্ঠান হয়তো বানানো যায় কিন্তু জাতির জীবনকে জাগানো যায় না। তাই ভৌত অবকাঠামোসর্বস্ব করে আমরা আমাদের শাখাগুলোকে তৈরি করিনি। আমরা নির্ভর করেছি যোগ্য মানুষের ওপর—শাখার সংগঠকদের আর তাদের বন্ধুদের

উদ্যম, বেদনা আর আত্মোৎসর্গের ওপর। উদ্যম নিয়েই তারা বের করে নেবে কোথায় কোন স্কুলে, কলেজে, মিলনায়তনে সপ্তাহে সপ্তাহে তারা সমবেত হবে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করবে, বই দেওয়া-নেওয়া করবে—সবার বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য, উষ্ণতা আর মানস-বাণিজ্যের ভেতর দিয়ে উচ্চতর জীবনের স্বপ্ন দেখবে।

অনেকেই অনেক সময় আমাকে জিজ্ঞেস করে : এত যে তোমরা শাখা শাখা করো, বলো যে আগামী বাংলাদেশের ভিত্তি তৈরি হচ্ছে এগুলোর ভেতর দিয়ে—কী আছে তোমাদের এই শাখাগুলোয়? সঠিক কী কী সুযোগসুবিধা? এগুলোর সবচেয়ে দামি সম্পদই বা কী?

আমি হেসে বলি : এগুলোর সম্পদ একটাই—'এক ট্রাঙ্ক বই'। এক ট্রাঙ্ক সুনির্বাচিত, স্বপ্ন-আনন্দে ভরা বই। আর ভালো কিছু মানুষ—উদ্বুদ্ধ উৎকণ্ঠিত হৃদয়বান—যারা নানান কর্মসূচির ভেতর দিয়ে কেন্দ্রের তরুণ সদস্যদের স্বপ্ন দেখায়, জাগায়।

একেকবার ভেবেছি কেবল শাখাগুলো কেন, আমাদের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রটারই তো নাম হতে পারে 'এক ট্রাঙ্ক বই'। এর চেয়ে বেশি আমরা শেষপর্যন্ত কী! আলোকস্নাত উদ্দীপ্ত কিছু মানুষকে বাহক করে আমরা একরাশ উজ্জ্বল কিছু বই ছাড়া কী-ই আজ পর্যন্ত পৌঁছোতে পেরেছি আমাদের সন্তানদের হাতে!

২০০৪

৩০

কেন্দ্রকে আজো ঠিকমতো গুছিয়ে তোলা গেল না, তবু মনে হয়, হয়তো কেন্দ্র শেষ অব্দি বেঁচে থাকবে। হয়তো এর সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের জন্য টিকবে।

কেন্দ্রের গঠনগত এই বৈশিষ্ট্যটির কথা প্রথম আমার মাথায় আসে মেকিয়াভেলির 'দ্য প্রিন্স' পড়ে। বইটির একজায়গায় তিনি দু-ধরনের রাষ্ট্রের রূপরেখা তুলে ধরেছেন। একধরনের রাষ্ট্রের কথা বলতে গিয়ে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন তুর্কি সাম্রাজ্যের। বলেছেন বিশাল এই সাম্রাজ্য যেমন পরাক্রমশালী আর দুর্ধর্ষ এর সৈন্যবাহিনী, তেমনি অপরাজেয় ও দুর্বার এর শক্তিমত্তা। একে ধ্বংস করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু একটা জায়গায় এ খুবই নাজুক। এর সর্বময় ক্ষমতা পুরোপুরি এককেন্দ্রিক। কাজেই এর ক্ষমতার শীর্ষে যদি কোনোরকম চিড় ধরিয়ে দেওয়া যায় (যেমন সম্রাটের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি বা প্রধান মহিষীর বিরোধ) তবে এ ভেঙে পড়তে পারে। আর-একধরনের রাষ্ট্রের উদাহরণ হল ফ্রান্স। তুর্কি সাম্রাজ্যের মতো এই রাষ্ট্রের ক্ষমতা অত কেন্দ্রীভূত নয়। রাজা এখানে তুলনামূলকভাবে দুর্বল। কিন্তু দেশ জুড়ে রয়েছে তাঁর বহু শক্তিশালী সামন্ত। তাদের প্রত্যেকের রয়েছে নিজ

নিজ সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী ও শাসনব্যবস্থা। ফলে কোনো বিদেশি শক্তির পক্ষে ফরাসি দেশ দখল করে নেওয়া অত সহজ নয়। রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছোতে তাকে এতগুলো যুদ্ধ করতে হবে যে আসল যুদ্ধের আগেই সে দুর্বল হয়ে পড়বে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কাঠামো গড়ে তোলার সময় আমি কেন্দ্রের এলাকাকে শক্তিশালী গড়ে তুলতে চেষ্টা করিনি, ফরাসি আদলে এর শক্তিকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। এর প্রতিটি শাখাকে গড়ে তুলেছি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে। করেছি একটা ভয় থেকে। ভয়টা হল, মূলকেন্দ্র যদি কোনোদিন না-ও থাকে তবু যেন স্বয়ম্ভূ কেন্দ্র হিশেবে এই শাখাগুলো বেঁচে থাকতে পারে—নিজেদের শক্তিতে, নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে। শাখাগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে এদের আমরা দুর্বল করতে চাইনি। স্বাধীনতা আর দায়িত্ব দিয়ে সবাইকে সাবালক হতে উৎসাহিত করেছি। মূলকেন্দ্রের সঙ্গে এর যে যোগাযোগ তা একধরনের বাস্তব সহযোগিতার যোগাযোগ, নিয়ন্ত্রণের নয়। শাখাগুলোকে আমরা কেন্দ্রের ওপর আশ্রিত করে বড় করিনি, চোখ-রাঙানি দিয়ে আত্মবিশ্বাস নষ্ট করিনি, বরং কেন্দ্র থেকে সামান্য সাহায্য পেলে, এমনকি না-পেলেও যাতে একা একা নিজেদের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে সেই ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছি।

এটা করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের মূলকেন্দ্রকে আমাদের দুর্বল করে ফেলতে হয়েছে। পাশাপাশি জোরদার করে তুলতে হয়েছে শাখাগুলোর শক্তিকে। এই শাখাগুলোকে করতে হয়েছে ব্যক্তিনির্ভর, একনায়কতন্ত্রী। কিন্তু তা সম্পন্ন মানুষের একনায়কতন্ত্র, মানবিক উদার গণতন্ত্রী ও মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের একনায়কতন্ত্র; অকর্ষিত, মূঢ় বা জববদস্তিমূলক মানুষের নয়। এজন্য আমাদের শাখাগুলোতে কোনো কমিটি নেই, সেখানে আছে খলিফা—আদর্শিক ও সাংগঠনিক নেতা। মাত্র একজন মানুষের ওপর আমরা গোটা শাখার সর্বময় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি। গণতন্ত্র খুব ভালো জিনিশ, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা গণতন্ত্রের পুরোপুরি যোগ্য হয়েছি, একথা হয়তো বলতে পারব না। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি যে মূল্যবোধ সেখানে আমাদের দুর্বলতা রয়েছে। গণতন্ত্র তাই দেশে ঠিকমতো কার্যকর হচ্ছে না। যে প্রতিষ্ঠানেই আজ কমিটি আছে সেখানেই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আর রক্তক্ষরণে সংগঠনের শক্তিটাই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা কোনো কমিটি করিনি। তার বদলে খুঁজেছি একজন সৎ, উদ্যমশীল ও সংস্কৃতিমনা মানুষের নেতৃত্ব। যেখানে তাকে পেয়েছি সেখানে সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে তার ওপর শাখা-পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছি। যেখানে ঐ মানুষটিকে পাইনি, সেখানে আমরা শাখা খুলিনি। এতে প্রায় কোথাও আমরা ঠকিনি। ঐ মানুষটির শুভবুদ্ধি মানবিকতা ও আত্মার ঋদ্ধি সংগঠনকে রক্ষা করেছে।

ভালোমানুষের বন্ধুরাও সাধারণত ভালোই হয়। তাই আমাদের ঐ মূল্যবোধসম্পন্ন সংগঠকটির বন্ধুবান্ধবেরাও ভালো। তিনি তাঁর সেই সৎ ও

সংস্কৃতিমনা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে সংগঠনটি গড়ে তোলেন। অনেক ভালো মানুষের সহযোগে সংগঠনটির ভিত আরও মজবুত হয়।

আমাদের জাতির মানুষ ব্যক্তিগতভাবে বহুক্ষেত্রে বহু যোগ্যতা দেখিয়েছে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে আজও তেমন কোনো বড় সাফল্য দেখাতে পারেনি। আমি তাই সব ক্ষেত্রের মতো সংগঠনের ব্যাপারেও 'ব্যক্তি'র যোগ্যতার ওপর নির্ভর করাকেই বেশি নিরাপদ মনে করি। ব্যক্তি যোগ্য হলে পুরো দলটাকেই তিনি ওপরের দিকে টেনে তুলতে পারেন।

দেশে আমাদের উৎকর্ষ কার্যক্রমের শাখা পাঁচশোটি। এর মধ্যে অল্পকিছু শাখায় যে সংগঠক ব্যর্থ হননি তা নয়। তবে অবাক ঘটনা সংগঠক (যা ঐ শাখাগুলোর মূল ভিত্তি) ব্যর্থ হলেও ঐ শাখাগুলোর একটিও মরেনি। এটা হয়েছে ওগুলোর চেতরকার আদর্শবাদী আবহাওয়ার জন্যে। আমাদের শাখাগুলো কেবল কার্যক্রমই চালায় না, ঐ কার্যক্রমের ভেতর দিয়ে উচ্চতর চেতনা আর অঙ্গীকারসম্পন্ন তরুণতরুণীদেরও জন্ম দেয়। এরাই শেষ অব্দি একে রক্ষা করে। কলা বা বাশঝাড়ে যেমন মূল গাছ বা বাঁশটাকে কেটে ফেললেও তার পাশ থেকে নতুন গাছ বা বাঁশ গজিয়ে উঠে আবার বাগান ভরে দেয়, তেমনি সংগঠকের শূন্যতা দেখা দিলেও শাখার তরুণদের ভেতর থেকে অন্যরা কাঁধ উঁচিয়ে দিয়ে আবার একে সক্রিয় করে তোলে। এই শাখা থেকে একদিন এরা উপকৃত হয়েছে, জীবনের সমৃদ্ধি পেয়েছে—তাদের মতো অন্যরাও যেন তা পায়—এ স্বপ্ন থেকেই এরা মরিয়া হয়ে এ কাজ করে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এগিয়ে চলেছে এই শাখাগুলোর হাত ধরে। স্বপ্নের প্রেরণার স্কুলিঙ্গের মতো পাঁচশো শাখার পর দেশের ২৫০০টি ভালো স্কুল এবং ৫০০ কলেজে এবার শাখা খোলার কাজ এগিয়ে চলছে। স্কুলগুলোতেও কমিটি নেই, আছেন কেবল স্কুলের হেডমাস্টার আর তাঁর সেই অনুপ্রাণিত শিক্ষকটি; যিনি এটি পরিচালনা করেন। কলেজেও তাই। গাছের মতো আমরা এর মূলকাণ্ডের ওপর ভর দিয়ে ডালে ডালে নিজেদের ছড়াচ্ছি না, বটগাছ যেমন ডাল থেকে নেমে আসা অসংখ্য ঝুরিতে ঝুরিতে ভর দিয়ে চারপাশে বহুদূর অব্দি ছড়িয়ে যায়, আমরাও তেমনি আমাদের শাখাগুলোর ওপর ভর দিয়ে নিজেদের ছড়িয়ে চলেছি। মূল বটগাছটা কেটে ফেললেও যেন ঐ গাছ না মরে বরং বৃদ্ধ মূলগাছটির বার্ধক্য আর অসুস্থতার ছোঁয়া থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে শাখানির্ভর বিশাল গাছটি যেন আরও নতুন তেজ আর সপ্রাণতা নিয়ে বেঁচে থাকে, আমাদের লক্ষ্য সেদিকেই। আমরা চাই আমাদের কেন্দ্রের মূলকাণ্ডটি মরে গেলেও এই শতধাবিস্তৃত শাখাগুলো নিজেদের সার্বভৌম বেদনার শক্তিতেই বেঁচে থাকুক। মূলকেন্দ্রের সর্বোচ্চ দায়িত্ব হবে, বাস্তব সহযোগিতার হাত যতটা সম্ভব প্রসারিত রাখা।

২০০৪

৩১

বই সবাই পড়তে পারে না। কেবল মেধাবীরা পারে। এখানে বই বলতে আমি 'ভালো বই'কে কেবল বোঝাচ্ছি—সেই বই যা মানুষকে ভাবায়, তাকে তার চেয়ে বড় করে তোলে। ফুটবল মাঠের একলক্ষ দর্শক আর একলক্ষ পাঠক এক জিনিশ নয়। সত্যিকার পাঠক 'কোটিতে গুটিক'। একজন পাঠক কোনো সাধারণ মানুষ নয়। সে একজন চিন্তাশীল, মননশীল মানুষ; ছোট মাপের দার্শনিক। মানবজাতির দিকনির্দেশনা আসে তার কাছ থেকে। সভ্যতার সে পথিকৃৎ। এই চিন্তাশীলতার শক্তি না থাকলে কেউ পাঠক হতে পারে না। অনেকেই সস্তা উপন্যাস, গোয়েন্দা কাহিনী বা পত্রপত্রিকার পাঠককেও পাঠক মনে করেন। দেখতে এরা পাঠকের মতোই, কিন্তু আসলে এরা পাঠক নয়। কারণ ওসব বই পড়তে মননের শক্তির দরকার হয় না। ওর সঙ্গে জমজমাট হিন্দিছবির পার্থক্য নেই। তাই ওদের পাঠক না বলে দর্শক বলাই ভালো। বইয়ের ভেতর দিয়ে আসলে ফিল্মেরই সস্তা বিনোদনপরায়ণ জগৎকে এরা দেখে। এরা একধরনের চিন্তাহীন হালকা ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষ। আসল পাঠকের পক্ষেও ঐসব বই বা ফিল্ম দেখা সম্ভব, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। ওতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শিশু বা কিশোর হলেও তার একই অবস্থা হয়। চিন্তাশীল মানুষের জাগ্রত মাথা সবকিছুতে জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়ায়। তা না পেলে তারা হতাশাবোধ করে।

অনেকে মনে করেন টেলিভিশনের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে আজকাল বইয়ের পাঠক কমে গেছে। আমি কথাটা আদৌ মানি না। আমার ধারণা যেসব পাঠক বই ছেড়ে টেলিভিশনের দিকে ঝুঁকেছে আসলে তারা পাঠক ছিল না, ছিল রম্যতাপরায়ণ, চিন্তাশূন্য একধরনের সস্তা বিনোদনলোভী মানুষ। জীবনানন্দ দাশ এদেরই বলেছিলেন 'ভিড়ের হৃদয়'। টিভি নাটক বা ফুটবল খেলা দেখতে লাগে দুটো ইন্দ্রিয় : শ্রবণেন্দ্রিয় আর দর্শনেন্দ্রিয়। রেডিও বা গান শুনতে লাগে একটি ইন্দ্রিয়—শ্রবণেন্দ্রিয়। কিন্তু বই এদের থেকে আলাদা। ইন্দ্রিয় দিয়ে বইয়ের কাছে যাওয়া যায় না। এখানেই বই সবার ওপরে। বইয়ের জগৎটিকে তুলে ধরা হয় সাংকেতিক চিহ্নের ভেতর দিয়ে। বই পড়তে চোখ লাগে ঠিকই, কিন্তু তা বইয়ের জগৎকে দেখতে নয়, ওর অক্ষরগুলোকে পড়তে। বই পড়ার জন্য যা দরকার তার নাম 'মনন' বা 'চেতনা'। বইয়ের পড়ায় সরাসরি ইন্দ্রিয়ের সহযোগ না-থাকলেও বই আসলে পঞ্চেন্দ্রিয়েরই এক প্রদীপ্ত জগৎ। তবে রেডিও, টিভি, খেলা বা নৃত্যশিল্পের মতো বই ইন্দ্রিয়ের পথ ধরে আমাদের ভেতর আসে না, আসে চেতনার পথ ধরে। চেতনা এখানে ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। এর ভেতর দিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে সে আমাদের চোখের সামনে নিয়ে আসে। এই মনন বা চেতনাজগৎ রয়েছে খুব অল্প মানুষের মধ্যে, তাই ভালো বইয়ের পাঠক পৃথিবীতে এত কম।

বইয়ের ভালো পাঠককে অনেকে গ্রন্থকীট বলে। যেন তারা উইপোকা জাতের কোনো অস্থিমজ্জাহীন অক্ষম কীটবিশেষ। শব্দটা আমার কাছে খুবই অসম্মানজনক লাগে। যে মানুষ বইয়ের উদগ্রীব জগতে মশালের মতো জ্বলছে তাকে এমন একটা নাম দেওয়া কি ঠিক?

পঁচিশ বছর বইপড়ানোর আন্দোলন করে টের পেয়েছি 'ভালো বইয়ের' পাঠক কোনো দেশেই চার থেকে ছয় ভাগের বেশি নয়। ব্যাপারটা হতাশাজনক হলেও সত্য। সব সমাজেই এর চেয়ে বহু বেশি মানুষ বই পড়ে। ইংলান্ডে বা বলিভিয়াতে আজও শতকরা পঁচিশ থেকে তিরিশ এমনকি পঁয়ত্রিশ ভাগ মানুষ পর্যন্ত বই পড়ে। কিন্তু আগেই বলেছি এদের অধিকাংশই রম্য বা সস্তা বই, 'ভালো বই' বা জীবনের গভীর উপলব্ধির আলোতে দীপিত বই নয়।

কোনো দেশের জনসংখ্যার ছয় ভাগ পর্যন্ত মানুষও যদি সত্যিকার পাঠক হয় তবে বাংলাদেশে ভালো পাঠক হবার সম্ভাবনাসম্পন্ন মানুষ কতজন? বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি হলে এর সংখ্যা নিশ্চয়ই ছয় চৌদ্দ চুরাশি লাখের বেশি নয়। এখন ভালো বই পড়ার মতো সুশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা যেহেতু আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ বা এক-পঞ্চমাংশের বেশি নয়, তাই এই মুহূর্তে দেশে ভালো পাঠক হবার সম্ভাবনাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা সেই চুরাশি লাখের এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ১৬-১৭ লাখের বেশিও নয়। কাজেই বইকে যদি আমরা মাত্র ১৬/১৭ লাখ মানুষের কাছেও পৌঁছাতে পারি তাহলেও তো সারাজাতির কাছেই পৌঁছোনো হল।

কিন্তু কাজটা অত সোজা নয়। প্রথমে দেখি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এর কতটুকু করতে পারবে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বইপড়ানোর জন্য আমরা যে দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রম চালাচ্ছি তার আওতায় ২০০৮ সাল থেকে (প্রতি বছর তিন লাখ হিসেবে) প্রতি পাঁচবছরে হয়তো সবসুদ্ধ লাখ চারেক ছাত্রছাত্রীকে আমরা বই পড়াতে পারব। একইভাবে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি দিয়ে হয়তো প্রতি পাঁচবছরে তিন লাখ পাঠককে একটানা বইপড়ার ভেতর রাখা যাবে (যদি সারাদেশের সবখানে এই কর্মসূচি চালু করা যায়)। এভাবে পনেরো থেকে বিশ বছরের মধ্যে আমরা হয়তো দেশের ভালো পাঠক হবার সম্ভাবনা আছে এমন অধিকাংশ মানুষকে বইপড়ার আওতায় নিয়ে আসতে পারব।

কিন্তু এতই কি সোজা? কর্মসূচি দুটি দিয়ে হয়তো আমরা দেশের অনেক ভেতরের এলাকায় চলে যাব, কিন্তু সব জায়গায় বা সবার কাছে যেতে পারব কি? বিশ বছরে যে উনিশ-বিশ লাখ মানুষকে আমরা পাঠক হিশেবে গড়ে তোলার কথা ভাবছি তার মধ্যেও তো অনেক অপাঠক থেকে যাবে যারা এক-দুই বছর বা এক-দুই মাস পর পড়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে। তাছাড়া এই সময়ের

মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার হার বাড়বে, শিক্ষার মান বাড়বে, ভালো পাঠক হবার সম্ভাবনাসম্পন্ন বহু নতুন মানুষ জন্ম নেবে। তাদের অনেকেও বইপড়ার সুযোগ নিতে আসবে; যা তাদেরকে আমাদের দিতে হবে।

পঁচিশ বছরে আমাদের বইপড়া কর্মসূচি এগিয়েছে খুব ধীরপায়ে। ১৯৮৪ সালে উৎকর্ষ-কার্যক্রম শুরু হয়েছিল সাড়ে তিন হাজার সদস্য নিয়ে। এখন এর সংখ্যা দেড় লাখ। আড়াই লাখ ছাত্রছাত্রীকে আমরা এই বিশবছর বইপড়ার সুযোগ দিতে পেরেছি। এছাড়াও বহু মানুষ এ সুযোগ পেয়েছে। এখন সভ্যসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ঘটনাটা ব্যাপক আকারে ঘটছে। ঠিকঠাক এগোতে পারলে আগামী বিশ বছরে আমরা শেষপর্যন্ত লাখ বিশেক পাঠকের কাছে এই সুযোগ নিয়ে যেতে পারব বলে আশা করি। সংখ্যাটা খুব বেশি নয়, কিন্তু এই নিঃস্ব দেশে এটুকুই কি কম?

২০০৪

৩২

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিজস্ব কোনো মতাদর্শ নেই। আমরা অনেক সময়ই রসিকতা করে এই কেন্দ্রকে বলি 'পোস্ট অফিস'; বলি 'ক্লিয়ারিং হাউস'। উন্নত, ব্যাপক ও পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কার্যকর ও শক্তিমান মানুষ গড়ে-ওঠার এ নেহাতই একটা 'সুযোগ কেন্দ্র'। কাউকে কোনো বিশেষ মতবাদে দীক্ষিত করে তোলার অশুভ মতলব বা দুরভিসন্ধি স্পষ্টতই নেই এই কেন্দ্রের। একজন সভ্যের অন্তর্প্রবণতাকে পরিপূর্ণ যোগ্যতায় বিকশিত হবার সুযোগ দেয়াই এই কেন্দ্রের লক্ষ্য—তারপর যার-যার পথ তার নিজের।

এক ও অভিন্ন কোনো মতাদর্শে এই কেন্দ্রের সকল সভ্য বিশ্বাসী হচ্ছে—এরকম অবস্থা এই কেন্দ্রের মৃত্যুরই নামান্তর। এই কেন্দ্রের প্রতিটি সভ্যের মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির শক্তিমান পার্থক্যের ওপরেই এই প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ শক্তি নির্ভরশীল।

আগেই বলেছি, এই কেন্দ্রের নিজস্ব কোনো মতাদর্শ নেই। তবু যদি এই কেন্দ্রের মতাদর্শ সম্বন্ধে কেউ জানতে চায় তবে বলব তা একটিই : চিত্তের সমৃদ্ধি।

১৯৮৮

৩৩

দিনকয় আগে কেন্দ্রে এল একজন ঝকঝকে তরুণ-কবি। ঘটনাচক্রে সে আমার ছাত্র। কবি বলতে যা বোঝায় সে ঠিক তা-ই; শরীরের প্রতিটা রক্তকণিকা তার স্বপ্ন আর প্রেরণায় জ্বলন্ত। হাত নেড়ে-নেড়ে সে বলল : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে ছড়িয়ে

দিন সারাদেশে। হাজার হাজার প্রতিভা সৃষ্টি করুন—তাজা উপহারে সব প্রতিভা। দেশের প্রতিটা অঙ্গন আজ বড় শূন্য। আজ আমাদের অসংখ্য প্রতিভার দরকার।

আমি বললাম : প্রতিভা সৃষ্টি করার আশ্বাস কী করে দিই আমি। আমাদের এই কার্যক্রম তো কোনো সর্বজনীন জাতীয় অগ্নিকাণ্ড নয়। কোনো অসঙ্কল্প বিপ্লবও তো ঘটাতে বসিনি আমরা। প্রতিভা সৃষ্টি করব এতবড় কথার স্পর্ধা নেই। শুধু বলতে পারি : যদি কোনো 'প্রতিভা' আমাদের এই প্রক্রিয়ার স্পর্শ পায়, তবে সে উপকৃত হবে। যে-আলো ও ঐশ্বর্যের স্ফুলিঙ্গ সে এখান থেকে তার রক্তে শোষণ করবে তা তার ভেতর কমবেশি স্বর্গীয় প্রজ্বলন ঘটাবেই।

১৯৮৯

৩৪

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য দেশের মানুষকে বুঝিয়ে উঠতে শেষপর্যন্ত ব্যর্থই হলাম। বাস্তব জিনিশের মতো কোনো কিছুকে হাতে ধরে দেখিয়ে না দিতে পারলে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। আমাদের কর্মসূচিগুলোর ভেতর দিয়ে সারাদেশে কিশোর-তরুণদের ভেতর আজ ধীর নিঃশব্দে যে অমেয় চেতনার বিকাশ ঘটছে; আজ থেকে পঁচিশ, পঁয়ত্রিশ বা পঞ্চাশ বছর পর সেই চেতনা তাদের নানান কর্মযজ্ঞের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়ে সম্পন্নতর একটা বাংলাদেশের সৃষ্টি করবে, কী করে একথা একজন সাধারণ মানুষকে বোঝানো সম্ভব?

বেশিরকম বিমূর্ত-জিনিশকে বুঝে-ওঠা অনেকের পক্ষেই কঠিন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একেবারে যাত্রালগ্নে যখন সবাইকে আমাদের স্বপ্নের কথা বলতাম তখন তারা আমাদের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ করেই—'সব বুঝে ফেলেছি'র ভঙ্গিতে চিন্তাশীলের মতো এমনভাবে মাথা নাড়তে শুরু করত যে, স্পষ্ট বোঝা যেত তাদের বোঝানোর আমাদের পুরো চেষ্টাটাই মাঠে মারা গেছে। এরপর যখন কেন্দ্রের অল্পবিস্তর বিত্তসম্পদ হল তখন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলা সম্ভব হল এটা হচ্ছে কেন্দ্রের দালান, এটা লাইব্রেরি, এটা অফিস, এটা মিলনায়তন। দেখতাম কেন্দ্রকে বোঝানো আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কেন্দ্রের স্বপ্ন আবার বিপুলভাবে বেড়ে যেতে শুরু করলে, আবার হল আগেরই অবস্থা।

ছেলেবেলায় আব্বা কলকাতা থেকে একটা প্লাস্টিকের হাঁস এনে দিয়েছিলেন আমাকে। হাঁসটার পিঠের ওপর একটা শাদা বোতাম ছিল। সেটার ওপর চাপ দিলেই ভেতর থেকে একটা শাদা ডিম বেরিয়ে আসত। চিত্তের জাগৃতি তো এমনি একটা চালাকি বা চটজলদির ব্যাপার হতে পারে না। আর আসল হাঁসের ডিমই কি এমন ঝুপ করে পাওয়া সম্ভব? জীবজাগতিক বিকাশের কত দীর্ঘ অসহনীয় প্রতীক্ষা

আর পারম্পর্যের ভেতর দিয়েই তো তা কেবল একসময় একটা পরিপূর্ণ নিটোলতা নিয়ে আমাদের হাতে এসে ধরা দিতে পারে। এটা তো সর্বজনীন সামাজিক কোনো টিউবওয়েল নয় যে একদিক থেকে চাপ দিলাম আর সাথে সাথে অন্যদিক দিয়ে পানি ছলকে উঠল।

১৯৮৯

৩৫

যে-যুগে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মানে ছিল পাড়ার গ্যারেজের গায়ে হলুদ কাপড়ের ওপর লাল রং দিয়ে লেখা 'সবুজ সংঘ' 'তরুণ সংঘ'-জাতের সংগঠন—সেই যুগে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো এতবড় একটা আয়োজন সীমানা-লংঘন নয় কি?

১৯৮৯

৩৬

কেন্দ্রের সূচনা থেকেই আমি এর তরুণ-সভ্যদের কাছ থেকে চাঁদা নেবার বিরুদ্ধে। শুভানুধ্যায়ীরা অনেকেই ব্যাপারটা সমর্থন করেন না। তাঁদের যুক্তিও অকাট্য। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এতরকম সুযোগ পাবে, কেন তারা এর বিনিময় দেবে না? এতে কেন্দ্রের আর্থিক অসচ্ছলতাও তো কিছুটা কমে। ওরা কিছু দিলে কেন্দ্রের সঙ্গে ওদের অংশীদারিত্বের বোধও তো বাড়বে। টাকা সামান্য, কিন্তু না-নিলে ভিখিরি থেকে গভীরতর ভিখিরি করে দেয়া হবে তো ওদের। ওদের মর্যাদাবোধটাও নষ্ট করা হবে।

তবু আজও আমি সভ্যদের কাছ থেকে টাকা নেয়ার বিরুদ্ধে। কেবলি মনে হয়, টাকাকে বিনিময়ের ভিত্তি করলে আমরা মানুষে-মানুষে বিভেদ করে ফেলব, আমাদের সম্পর্ক হবে ক্রেতা-বিক্রেতার। বিত্তকে সুবিধার ভিত্তি করলে বিত্তশালীদের আমরা আরও সৌভাগ্যবান এবং বঞ্চিতকে আরও ভাগ্যহত করে দেব। কেবলি মনে হয়, সারাদেশে যদি একজন ছেলে বা মেয়েও আর্থিক অপারগতার কারণে এই কর্মসূচি থেকে বঞ্চিত হয়, তাতেও এই কর্মসূচি অপবিত্র হয়ে যাবে।

করদণ্ডের প্রব্রজাদের আমি করজোড়ে বলেছি, আমার জীবদ্দশা পর্যন্ত তারা যেন এই নির্বুদ্ধিতাটুকু সহ্য করেন। আশ্বাস দিয়েছি, এ ব্যাপারে আর্থিক লোকসানের দায়ভাগ আমার কায়িক শ্রম দিয়ে আমি পুষিয়ে দেব। দেশের মানুষ এখনো আমাকে চেনে। কেন্দ্রের জন্য টাকা চাইলে আজও তারা তা দিতে কুণ্ঠিত হবে না। ওই দিয়েই ঘাটতিটা পুষিয়ে যাবে। হয়তো এজন্যে আমাকে একটু বাড়তি খাটুনিই করতে হবে। কিন্তু একজন মানুষের এই অল্প-কষ্টের বিনিময়ে যদি এত ছাত্রছাত্রীকে সামাজিক বিভেদের অভিশাপ থেকে বাঁচানো যায়, সেটাই বা খারাপ কী?

২৬

দেখে ভালো লাগছে যে, কেন্দ্রের শাখাগুলোর ভেতর নানান জায়গায় নাটা সংগীত নৃত্য আবৃত্তি—এমনি নানান ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচি সংযোজিত হচ্ছে। আমি এই প্রবণতাকে অভিনন্দন জানাই। এতে কেন্দ্রের জীবনে বৈভব এবং সজীবতা আসবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ব্যাপারেও সতর্ক করি যে, এইসব কর্মসূচিতে শুধু তারাই যেন অংশগ্রহণের অধিকার পায় যারা কেন্দ্রের পড়াশোনাভিত্তিক নানান সমৃদ্ধিধর্মী কর্মকাণ্ডগুলোয় সক্রিয়ভাবে জড়িত। এর বাইরের কেউ নয়। অন্যথায় এই প্রতিষ্ঠান একটা অপরিণত মেরুদণ্ডহীন প্রতিষ্ঠান হয়ে যাবে। নাচ গান আবৃত্তির সংগঠনের অভাব নেই দেশে। তারা সেসব করুক। আমরা সেসব করব বাড়তি উৎকর্ষ হিশেবে।

আজ আমাদের জাতির সবচেয়ে বড় শূন্যতা হচ্ছে মননশীলতার শূন্যতা, তার দার্শনিকচিত্ততার শূন্যতা। এই শূন্যতা জাতির প্রতিটা অঙ্গনের মেরুদণ্ডকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে, এমনকি শিল্পসিদ্ধিকেও। এই শূন্যতাকে জরুরিভিত্তিতে পূরণ করতে হবে। জাতির দার্শনিক চিত্ততাকে শক্ত করার জন্যেই আমরা গড়ে তুলেছি এই প্রতিষ্ঠান। তাই কেন্দ্র মূলত মননধর্মী। এই এলাকার ওপরেই কেন্দ্রের প্রধান গুরুত্ব। একে পাশ কাটিয়ে কিছু করা মানে কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য থেকে বাইরে চলে যাওয়া।

১৯৯৮

কেন্দ্রের ভাবনা ও আমি

১

'কেন্দ্র'র দরজায় কার আশায় এই শীতে একা প্রতীক্ষা করে চলেছ মৃত্যুময়?'

'আমি বসে আছি একজন 'রাজা'র জন্যে, কিন্তু তার পদপাত এখনো অনিশ্চিত। যাত্রা হয়ত উদ্যত, কিন্তু বিঘ্নিত এখনো প্রত্যয়ের বিভ্রান্তিতে।'

'একে একে কত মানুষ আসে। বিস্বাদ মুখে এগিয়ে আসে অজীর্ণ রোগগ্রস্ত করণিক। তার মুখে চোখে সংশয় আর হীন আক্রোশ। গাদা গাদা নথি হাতে আসে বিরক্ত সহসচিব; তার ঘর ভ্যাপসা, অন্ধকারে গুমোট। আসে উপসচিব : উজ্জ্বল আত্মবিশ্বাসের ঝকঝকে প্রতীক। অনভ্যস্ত ভারিক্কির ঈষৎ অস্বস্তি নিয়ে যুগ্ম সচিব আসে। আসে অতিরিক্ত সচিব—উচ্চতম সাফল্যের ঈষৎ অনটনে সামান্য অসুখী। দৃপ্ত প্রত্যয়োজ্জ্বল সচিব বা রাজকীয় চাদর গলায় উড়িয়ে মন্ত্রীও আসে।'

'কিন্তু কোথায় সেই রাজা!'

'আমার সেই রাজা কোথায়?'

১৯৮৫

২

কেন্দ্রের ভবনের লাল ইটের দেয়ালগুলোকে আমরা কোনোদিন প্লাস্টার করব না। এই কেন্দ্র যে একদিন আমাদের রক্ত দিয়ে তৈরি হয়েছিল—ওই ইটগুলো তার সাক্ষী হয়ে থাক।

১৯৯০

৩

টিভিতে অনুষ্ঠান ছেড়েও ঝামেলা। প্রায় পাঁচটা বছর হল টিভি ছেড়েছি। তবু এখনো রাস্তায়, অফিসে, দোকানে, বাজারে, নিমন্ত্রণে, আলোচনাসভায় সবখানে—গ্রামোফোনের কাটা রেকর্ডের মতো ফিরে ফিরে হাজার অভিমানী গলার একই স্বর : কেন ছেড়ে দিলেন টিভি। আবার ফিরে আসুন। আবার আমাদের সেইসব আনন্দময় অনুষ্ঠান উপহার দিন।

কী করে এই ভিড়ের হৃদয়কে বলি : অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে দিন আপনারা আমাকে। একদিন আমার অনুষ্ঠানের জন্যে আপনারা আপনাদের হৃদয়ের রক্তগোলাপ আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেদিন আপনাদের আনন্দ দেবার সেই দায়িত্বে একাগ্রতায় আর সততায় আমি শ্রান্তিহীন ছিলাম। সেদিন শরীরের প্রতিটা রক্তবিন্দুর মধ্যে একটামাত্র আকাঙ্ক্ষাই নিদ্রাহীন ছিল : অনুষ্ঠান করতে করতে স্টুডিওর মেঝেতে যদি মরে পড়ে থাকতে পারি—সেটাই হবে আমার সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যু।

কিন্তু আজ অক্ষম আমি আপনাদের সেইসব রঙিন অনুষ্ঠান উপহার দিতে।

আমার হৃদয় আর সেদিনের মতো তারুণ্যদীপ্ত নয়।

বয়স আর দায়িত্বের ভারে আর বেদনায় মুহ্যমান আমি এখন। আজ আমার জাতির আগামী বংশধরদের সুখের প্রশ্ন আমাকে কোটি কোটি বিষাক্ত ডাঁশের মতো কামড়ে ধরেছে। আজ আমি জীবনের ন্যূনতম একটা অর্থ খুঁজে ফিরছি, টিভির রঙিন বিনোদনের জগতে তার উত্তর নেই। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে-তোলার এই ছোট্ট তুচ্ছ অবজ্ঞেয় বিষয়টা আজ আমার কাছে অনেক বড়—ব্যক্তিগত মহিমাকামিতার চেয়েও অনেক মূল্যবান। আপনাদের প্রীতি আর ভালোবাসার দানবীয় আলিঙ্গন সামান্য শিথিল করে, আমার এই ছোট্ট অর্থহীন ঘরটাতে, জীবনের অপচয় আর পণ্ডশ্রমের এই জগতে, নিশ্চিন্তে, আমাকে আজ একটু নিশ্বাস নিতে দিন আপনারা।

২৫.৮.৮৫

৪

মহাসড়কের বুকের ওপর দিয়ে বিরাট আকারের একটা আন্তঃনগর বাস যাচ্ছে। দু'পাশের জনপদকে উপেক্ষা করে, মাঠঘাট প্রান্তরের বুকের ওপর দিয়ে পরাক্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে সেই গাড়ি।

বাসের যাত্রীদের অনেকে যাত্রার বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমিতে বিরক্ত। কেউ কেউ গন্তব্যের উত্তেজনায় অস্বস্ত, স্বপ্নাতুর।

সামনের সিটে এক ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে খবরের কাগজ পড়ছেন। তার পাশেই আরেকজন শূন্য দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। ওদিকে একজন ষণ্ডামতো লোক আজকালকার রাস্তার দুর্ঘটনার কথা বেমালুম ভুলে সিটে বসেই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন—নিশ্চিন্তে। বাসের মাঝামাঝি জায়গায় দুজন লোক মাঝেমধ্যে গল্প জমানোর চেষ্টা করছেন, গাড়ির ঝাঁকিতে খুব একটা জমছে না। একজন যুবক বসে আছে একা—তার দু'চোখজুড়ে স্বপ্নের নরম ঘোরাফেরা। তার পেছনেই একটা ছেলে আর একটা মেয়ে বসে আছে। হয়ত নতুন বিবাহিত, নয়তো অন্যকিছু। মেয়েটা ফরসা, লাজুক। ছেলেটার উৎপাতে সলজ্জভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে কেউ দেখে ফেলল কি না। আশপাশের লোকগুলোর কেউ কেউ আড়চোখে এদের দেখছে।

এভাবেই গাড়ি চলছে।...

গাড়ির লোকগুলোর অবকাশ আছে, স্বপ্ন আছে, উৎকণ্ঠা আছে, প্রতীক্ষা আছে। আছে খবরের কাগজ আর জানালার আশ্চর্য পৃথিবী।

অন্তত নিশ্চুপ বসে থাকার একঘেয়েমির অপ্রিয় অধিকার আছে। আর আছে গন্তব্যের আনন্দমুখর অভ্যর্থনার সুনীল প্রত্যাশা।

কেবলমাত্র বাসের সামনেটায় বসে থাকা একজন সজাগ মানুষের এ সবকিছুই নেই। না বিশ্রাম, না খুনসুটি, না শান্তি, না স্বপ্ন।

লোকটা চালক।

ওই নিদ্রাখোয়ানো শ্রান্তিহীন নিঃসঙ্গ লোকটার জন্য খারাপ লাগে।

কী মর্মান্তিকভাবে নিজের কর্তব্যের ওপর উদগ্রীব হয়ে মরে আছে সে।

লোকটাকে দেখি আর নিজের কথা মনে হয়। নিজের বিশ্রামহীন নিঃসঙ্গ জীবনের কথা।

২৮.৯.৮৮

৫

হাতি-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত, কোটালপুত্র, মন্ত্রীপুত্র সব এসে পৌঁছেছে। জোয়ারের সমুদ্রে জাহাজেরও পাল তোলা। কিন্তু সেই উদ্যত তলোয়ারধারী রাজপুত্র কোথায়?

তাকে আজও পাওয়া হল না।

আমার জাতির মতো এ দুর্ভাগ্য আমারও। তারই অভাবে এই নিঃস্ব জীবনসায়াহ্নে বেঁচে-থাকা আজও আমার জন্যে বাধ্যতামূলক।

১৯৯৮

৬

(কেন্দ্রের একজন নতুন কর্মীকে)

যেদিন দেখবে কেন্দ্রের দালানের ছোট্ট একটা ইটের গায়ে কেউ হাত রাখলেও তোমার শরীরে ব্যথা লাগছে, সেদিনই তুমি কেন্দ্রের কর্মী।

যেদিন সারাটা কেন্দ্র আর তুমি এক, সেদিন তুমি কেন্দ্রের প্রধান।

৭

থেকে-থেকেই দেখি কেন্দ্রের কিছু ছেলেমেয়ে কিছু-একটা করার হঠাৎ উত্তেজনায় দপ করে জ্বলে ওঠে। তারপর আমার কাছে এসে শুরু হয় সেসব বাস্তবায়নের আবদার। 'এটা করুন, ওটা করুন, কেন্দ্রের মাধ্যমে এটা করতে পারলে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে হুলস্থুল পড়ে যাবে, ওটা করলে দেশের মধ্যে রীতিমতো একটা বিপ্লবই হয়ে যাবে'—এমনি সব উত্তেজিত প্রলোভন।

দেশের সাংস্কৃতিক উত্তরণের জন্যে কী কী করা যেতে পারে তা নিয়ে গত তিন-চারটা দশক ধরে বিরতিহীনভাবে ভাবছি। কী করে এদের মনে হয় হঠাৎ করে এমন অবিশ্বাস্য কিছু এরা বের করতে পারবে আজ অব্দি যার ছিটেফোঁটাও আমি আঁচ করতে পারিনি! ওরা কী করে জানবে কেবল আর্থিক অনটনের অভিশাপে এমন কত হাজার হাজার অচরিতার্থ স্বপ্নকে বুকের ভেতর কবর দিয়ে আমি বেঁচে আছি!

এসব উচ্চকিত স্বপ্নের কথা শোনার পর অনেককে বলেছি : তুমি যা করতে বলছ, তার দশগুণ আমি তোমার জন্য করব। তার আগে কেবল ছোট্ট একটু শর্ত। কারো কাছ থেকে হাজার-দশেক টাকা এনে দাও কেন্দ্রের জন্যে। গিয়ে বলো, আমরা সংস্কৃতির জন্য কাজ করছি। হাজার-দশেক টাকা চাঁদা দিন আমাদের। দেখতে পাবে এদের আসল চেহারা, বুঝবে কী অসাধ্য ব্যাপার ছিল এদেশের আজকের সংস্কৃতিকে ওপরের দিকে এগিয়ে নেবার কাজটা।

যেভাবে যেখান থেকেই হোক, বছরে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ লাখ টাকা জোগাড় করতেই হবে। না হলে কেন্দ্র মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

আমাদের দেশের বিত্তবানদের ভেতর ভালো কাজে দান করার মনমানসিকতা এখনো তৈরি হয়নি আর আমরাও বিদেশি টাকা দিয়ে এই কেন্দ্র গড়ে তুলতে নারাজ।

কী অসহনীয় সেই অবস্থা কেন্দ্রের জন্য! আমরা চাই জাতির এই সংস্কৃতির সৌধটি জাতির ভেজামাটির গভীর থেকে পাতা মেলুক। এই ত্রিশঙ্কু অবস্থায় কেন্দ্র বাঁচবে কী করে? ব্যবসা হলে হয়তো পারা যেত। লেনদেন থেকে স্ফীত অঙ্কের আয়

হাতিয়ে নেয়া যেত। ব্যবসা-জগতের অর্থনৈতিক নীতিমালার আওতাতেই পারা যেত সব। কিন্তু যেখানে আয় নেই, কেবল ব্যয়; এ্যাসেট নেই, কোল্যাটারাল নেই, মূলধন নেই, কেবল মঞ্জুরির ব্যবস্থা; সেখানে কী করে গড়ে তুলি এই প্রতিষ্ঠান? আজকের বাংলাদেশে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে-তোলা এদেশে একটা শিল্পসাম্রাজ্য তৈরির চেয়ে কী সোজা ছিল!

২৮-১০-৯৩

৮

আপনার পরে কেন্দ্র চালাবে কে?

জানি না।

কেন?

উত্তরাধিকারীদের গড়ে তুলতে পারিনি।

কেন পারেননি?

এদেশে উত্তরাধিকারী পাওয়া যায় না।

তাহলে তো আপনার পর কেন্দ্র উঠে যাবে।

সেই দুঃখে কি আজও হাত গুটিয়ে বসে থাকব? আমার উদ্যম বা সৃষ্টিশীলতাটুকুও ব্যবহার করব না? নিজের করণীয়টুকুও করব না?

২০০০

৯

আমাদের সিলেট শাখার আহ্বানে গিয়েছিলাম সিলেট শহরে। সারাদিন গোটাকয় স্কুলে ছোটাছুটির পর বিকেলে গিয়ে হাজির হলাম কর্মী আর স্থানীয় শুভানুধ্যায়ীদের এক সমাবেশে। সেখানে আমার এক পুরোনো ছাত্র, সিলেট মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, বক্তৃতা দিতে উঠে একটা চমৎকার কথা বলল। বক্তৃতার এক জায়গায় ঘেদের সঙ্গে বলল, আজ দেশের প্রায় প্রতিটা মানুষের দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে যে-কথাটা প্রথমেই মনে আসে তা হল : কী যেন নেই তার মধ্যে। একজন পুলিশের বাঘা আই.জি.। বিশাল চেহারার ডাঁটপাটওয়ালা জবরদস্ত অফিসার। জাঁকালো শানশওকত। তবু তাঁর দিকে তাকালে মনে হয় কী যেন নেই। কিসের যেন অভাব। একজন পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার। বিত্ত আর জৌলুশে চকচক-করা। তবু তাঁর দিকে তাকালে মনে হয় কী যেন নেই সেখানেও। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। আভিজাত্যে আর সামাজিক মর্যাদায় দপদপ করছেন। তবু তাঁর দিকে

তাকালে মনে হয় কী যেন নেই। কোথায় কিসের যেন অভাব। কিসের অভাব? এই অভাব আলোর, রুচিশীল চিত্তের। সারাজাতির প্রতিটা হৃদয়ের মধ্যে আজ এই পোকায় খাওয়া কালো অন্ধকার।

অদ্ভুত লাগল কথাগুলো শুনে। মনে হল কী অদ্ভুতভাবে আমাদের কথাটাই বলল?

৩০.৫.৯৮

১০

সেদিন সার্ক-দেশগুলোর লেখকরা এসেছিলেন কেন্দ্রে। আসরটি আয়োজন করেছিল সাজ্জাদ শরীফ। এতগুলো দেশ আর ভাষার লেখকদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত লাগছিল। মনে হচ্ছিল হৃদয়ের বন্ধুদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। কত আলাদা ভাষার, আলাদা চেহারার মানুষ, তবু আমাদের কত কাছাকাছি। ভাবনায় অনুভূতিতে যেন কোনো পার্থক্য নেই। প্রতিদিন যেসব মানুষের প্রিয় বা অপ্রিয় সঙ্গ সহ্য করে বেঁচে থাকতে হয় তাদের চেয়ে আত্মিকভাবে আমাদের কত কাছের। বেশকিছু চাঁদে-পাওয়া জন্মান্ধ মানুষ ছিল দলের মধ্যে। এদের কেউ নামকরা কবি, কেউ গল্পকার, কেউ বিদগ্ধ পাঠক, কেউ সমালোচক। প্রতিভাপ্রাণিত মশালের মতো কেউ কেউ। তাঁদের প্রাণের উত্তাপে আর প্রতিভার আলোয় আমাদের ছোট মিলনায়তনটা যেন জ্বলে রইল ঘণ্টা-দুয়েক। আমাদের এই ঘরটার এমন উজ্জ্বল চেহারা আর কোনোদিন দেখিনি।

এই প্রাণময় পরিবেশটি যাঁর ভেতর সবচেয়ে উজ্জ্বল ও অনুপমভাবে প্রতীকায়িত হচ্ছিল তিনি অজিত কাউর—এক বর্ষীয়সী পাঞ্জাবি গৃহবধূ—এই মিলনমেলার মূল উদ্যোক্তা। যেন পুরো মাতৃমূর্তি, মমতার লক্ষহাতে দলটাকে বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরে আছেন। আমাদের কয়েকজন তরুণ কবি নিজ নিজ কবিতার ইংরেজি পড়ে শোনাচ্ছিল তাঁদের। কারো অনুবাদে কোথাও এতটুকু দীপ্তি দেখলে সবাই প্রশংসায় এমনভাবে মুখর হয়ে উঠেছিলেন যে মনে হচ্ছিল সবাই মিলে একটা বড় আকারের বীণার মতো বেজে উঠছেন। আমরা কেন এমন উদার হতে পারি না?

নানা দেশের প্রতিভান্বিত মানুষদের এমন সৌহার্দ্য মাঝে মাঝে খুবই দরকার—দূরের সুহৃদদের চেনার জন্য, অবিশ্বাস আর অপরিচয়কে দূর করার জন্যে। কেন্দ্রে কি আমরা এসব আয়োজন করতে পারি না?

১১

ফিরে ফিরে মনে হতে চায় সময়ের একটু বেশি আগেই হয়তো বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তৈরির কাজে হাত দিয়েছিলাম। না হলে এত কষ্ট কেন? কেন এত দুঃসহ আর্থিক সংকট? অস্তিত্বের জন্য এত জান্তব সংগ্রাম? সারাদেশে পৃষ্ঠপোষকের কেন এত অভাব? কেন এমন আহত পশুর মতো আর্তনাদভারাক্রান্ত জীবন?

টেলিভিশনের উপস্থাপক হিশেবে একসময় আমাকে সবচেয়ে বড় পুরস্কারটাই দেয়া হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে হয়তো ভুল করেই এই পুরস্কার ওরা আমাকে দিয়েছিল। নয়তো বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো এমন জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারকে কেন এদেশের বিশজনের বেশি মানুষকে আজপর্যন্ত বোঝাতে পারিনি? প্রতিমুহূর্তে টের পাই আমার উপস্থাপনা-শক্তির চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্ম গভীর আর সুদূরপ্রসারী মেধার প্রয়োজন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের স্বপ্নকে তুলে-ধরার আর এর অর্থপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্যে। পরিসংখ্যান আর উপাত্তের ছক দিয়ে এই দুর্জ্ঞেয় রহস্য বোঝানো সম্ভব নয়। সময়ের বেশিরকম আগে আমরা দেশে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় হাত দিয়েছিলাম। আমাদের আজকের এইসব অমানুষিক কষ্ট আর ব্যর্থতা তারই খেসারত।

তবু এর ভালোমন্দ দুটো দিকই আছে। খারাপ দিকটা হল, এইসব নির্দয় অস্তিত্ব-ছেঁড়া কষ্ট! ভালোর দিক হল, প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে পারলে হয়তো কিছু যোগ্য মানুষ সৃষ্টি হতে পারে জাতির ভেতর। সব ছেড়েছুড়ে হাত গুটিয়ে পালানোর বিপদ এখানে যে, যেদিন এই সমাজে বড়কিছু নির্মাণের পৃষ্ঠপোষকেরা এসে যাবে, সেদিন এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের স্রষ্টাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। ব্যাপারটা হবে আমাদের দেশের আজকের শিল্পায়ন সমস্যার মতো। সারা পৃথিবী থেকে জাহাজভর্তি সহযোগিতা এসে ভিড় করে আছে দেশের বন্দরে, কিন্তু প্রকৃত উদ্যোক্তার অভাবে শিল্পায়ন হচ্ছে না।

২০০৮

১২

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম পর্যায়ে কত মানুষের কাছ থেকে কত-যে সাহায্য নেবার চেষ্টা করেছি! বিদেশি টাকা দিয়ে এই কেন্দ্র আমরা গড়তে চাইনি। তাই কষ্ট করে প্রথম পাঁচবছরে চাঁদাই তুলেছিলাম প্রায় বিশ-পঁচিশ লাখ টাকা। সেই কষ্টের স্মৃতিগুলো মাংসের ভেতর এখনো ছুরির মতো বিঁধে আছে। দিনে তিরিশ-চল্লিশ মাইল কেবল রিকশাতেই ছুটে বেড়াতে হয়েছে দুয়ার থেকে দুয়ারে। শারীরিক কষ্টের ওপর শাকের আঁটির মতো মানসিক কষ্টের চাপ। সামান্য কটা টাকার জন্যে তুচ্ছ কত মানুষের কাছ থেকে কত অবহেলা আর অসম্মান! কিন্তু অভিমান নিয়ে

থেমে পড়ার উপায় নেই। দিনরাত কেবল একটা চিন্তা আগুনের শিখার মতো মাথায় তখন দাউ দাউ করে জ্বলত : কোথা থেকে কীভাবে পাওয়া যাবে টাকা, কী করে গড়ে তোলা যাবে কেন্দ্র। সামান্যতম আশা আছে এমন একজন মানুষও তখন ছিল না; যার দিকে সাহায্যের হাত বাড়াইনি।

আমরা নানান সৌন্দর্য বা বৈভবের প্রত্যাশা নিয়ে একেকজন মানুষের দিকে তাকাই। কেন্দ্রের অর্থ-চিন্তা আমাকে এই সময় এমন উন্মাদ করে তুলেছিল যে মানুষের একটা মহিমাই তখন আমার চোখে ছিল একমাত্র বিবেচ্য। সেটা হল : লোকটার দোহনযোগ্যতা কতটুকু! দেশের উঠতি বড়লোকেরাই ছিল আমার পৃষ্ঠপোষক ও শিকার। অপরিশীলিত স্থূল একধরনের অনমিত মানুষ এঁরা। বিত্তের জগতের প্রথম প্রজন্মের লোক। ভালো মানুষ এদের মধ্যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তাঁদের অনেকেই সরল বিশ্বাসে দান করতে গিয়ে অনেক জায়গায় মুখ পুড়িয়েছে। ফলে দেশের তথাকথিত সমাজসেবীদের ওপর এদের অবিশ্বাস কুসংস্কারের মতো। একেকদিন কারো কারো সামান্য কথায় বা আচরণে নিজেকে এমন অসম্মানিত মনে হত যে প্রায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতাম। বিবমিষায় কয়েকদিন পর্যন্ত মাথা ঘোলাত। অনেকে আবার এমন ভাব করতেন যেন কেন্দ্রকে নয়, আমাকেই দিচ্ছেন টাকাটা। কেউ অফিসে এসে টাকা নিতে বলে দিনের-পর-দিন ঘোরাতে থাকতেন। আমরা যারা সৎশিক্ষকের জীবনযাপন করেছি, হাজার হাজার ছাত্রের সামনে শ্রদ্ধার বেদিতে আজীবন অধিষ্ঠিত থেকেছি; তাদের পক্ষে, যতবড় দরকারেই হোক, এ-ধরনের অসম্মান সহ্য করা শক্ত। মনে রাখতে হবে আমরা পেশাগতভাবে সেই সম্প্রদায়ের মানুষ; যারা সবার কাছ থেকে আজীবন কেবল 'স্যার' কথাটা শুনতেই অভ্যস্ত, 'স্যার' বলতে নয়। সবাইকে আমাদের সবসময় ওয়ালাইকুমুসসালামই বলতে হয়, আসসালামুয়ালাইকুম নয়।

ভালো হোক মন্দ হোক, এই আমাদের জীবন। আমরা আমাদের সামনে দেশের সবচেয়ে কীর্তিমান মানুষদের প্রতিনিয়ত শ্রদ্ধায় অবনত হতে দেখি। এভাবে আমাদের ত্বক ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে একটা অসুস্থ আত্মমর্যাদাবোধ নিঃশব্দে বাসা বাঁধে। সাধারণ মানুষের মতো দুঃখ-অপমান সহ্য করার শক্তিতে আমরা অযোগ্য হয়ে পড়ি। আমার ধারণা, টেলিভিশনের লোকপ্রিয়তা আমার এই স্পর্শকাতরতাকে আরো উসকে দিয়েছিল।

তবু বিবেক, নিষ্কৃতিহীন বিবেক আমাকে তাড়িয়ে নিয়েছে। জাতির ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠায় সব কষ্ট শ্রম অপমান সহ্য করেছি। বেশকিছু বন্ধুবান্ধব অনেকবার আমাকে বলেছে : কাদের টাকা দিয়ে এই কেন্দ্র তৈরি করছ তোমরা? ভেবে দেখেছ এরা কারা? সংঘবদ্ধ একদল রাষ্ট্রীয় দস্যু! নির্বিবেক দুর্নীতিপরায়ণ ক্লেদাক্ত মানুষ

একদল—দুঃখী মানুষের রক্তে যাদের হাত কলঙ্কিত। এই অপরাধীদের টাকায় তোমাদের স্বপ্নের তাজমহল কী করে তৈরি হবে?

কথাগুলো শুনে প্রথম-প্রথম নিজেরও খটকা লাগত। যুক্তি আছে এসব কথায়। এমন একটা কাজে কতগুলো দুর্বৃত্তের অবৈধ অর্থের সহযোগ কি ঠিক হচ্ছে? পরে অনেক চিন্তা-পারম্পর্য উৎরে একসময় ওই দ্বিধাগ্রস্ত সংকট থেকে মুক্তি পেয়েছি।

আমি সবিনয়ে ওইসব সমালোচকদের স্মরণ করিয়ে বলেছি : আমার পৃষ্ঠপোষক ওই অকর্ষিত লোকগুলো দুর্বৃত্ত, খুনি, ডাকাত বা চোর সবকিছুই হতে পারে—কিন্তু যে-টাকা নিঃশর্তভাবে এই কেন্দ্রে তারা দিচ্ছে সে-টাকা তো 'চোর' নয়। ওই টাকা দিয়ে যে-বই কেনা হচ্ছে সে-বই তো 'চোর' নয়। ওই বই পড়ে আমাদের হাজার হাজার অংশগ্রহণকারীর মধ্যে প্রতিনিয়ত যে-অমেয় চেতনার বিকাশ ঘটছে সে-চেতনা তো 'চোর' নয়। ওই অনির্বনীয় মানসিক বিকাশ থেকে জাতির যে-ঋদ্ধি ঘটবে সেই ঋদ্ধি তো 'চোর' হতে পারে না। তাছাড়া এই লোকগুলো অন্য কোথাও টাকা না-দিয়ে যে এই শুভত্বমুখী কাজটাতে দিয়েছে সেজন্য প্রাপ্য সম্মানটুকু তাদের দিতে হবে না কি? অন্তত জীবনের ওইটুকু জায়গায় তারা এদেশের যে-কোনো ভালোমানুষের সমান পরিমাণেই তো ভালো।

যত ছোট আকারেই হোক, বাংলাদেশে যে-বুর্জোয়া বিকাশ শুরু হয়েছিল কোনোকালে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তার অন্যতম প্রথম দলিল।

১৯৮৭

১৩

কিছু কিছু লেখক আছেন যাঁরা একটি বা দুটি অবিশ্বাস্য বইয়ের সামান্য কিছু পৃষ্ঠার ভেতরে ধারণ করতে পারেন শিল্পের সামগ্রিকতাকে—একটা নিটোল মুষ্টির ভেতর মানব-অস্তিত্বের যাবতীয় রোদন ও রক্তক্ষরণ। শিল্পের আলোকিত রঙ্গমঞ্চের ওপর সৌকর্যপটীয়সী নৃত্যশিল্পী এঁরা। বদলেয়ার বা বেকন, র‍্যাঁবো বা গ্রে, প্যাসকাল, খৈয়ম, রাশফুকো বা গীতার কবি এই দলের।

কিছু কিছু লেখক আছেন জীবনোপলব্ধির জন্যে যাঁদের দরকার সময়-যাত্রার সুবিপুল পরিধি। হাজার হাজার পৃষ্ঠা আর লক্ষ লক্ষ শব্দের ভেতর দিয়ে চলে তাঁদের অস্তিত্ব-ঘোষণার ব্যাপ্ত আয়োজন। রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়, বালজাক, হুগো, দস্তয়েভস্কি, গ্যেটে, ডিকেন্স থেকে শুরু করে পৃথিবীর মহাকবিরা সবাই এই ধারার।

যত সামান্য মাপেই হই, আমি এই দ্বিতীয় গোত্রের মানুষ। হাজার হাজার রৌদ্রোজ্জ্বল বাক্যের মহাকাব্যিক বিশালতার ভেতর দিয়ে আমার মুক্তি।

জীবনের কাছ থেকে সে-সুযোগ পাওয়া হল না। দেশ এবং জাতির জন্যে নিদ্রাহীন উৎকণ্ঠা, চারপাশের জনগোষ্ঠীর সুখের জন্যে উৎপূর্ণ আকুতি আর

ডাকাতের মতো নিষ্কৃতিহীন একটা বিবেক—হাজার হাজার তুচ্ছ অর্থহীন প্রয়োজনে আমার লেখালেখির সব অপার্থিব মুহূর্তগুলোকে ছিনতাই করে নিয়ে গেছে।

১৪

অনেকদিন পরে যখন এই জাতির জীবনে বৈদগ্ধ্য আর পরিশীলনের যুগ আসবে তখন সেকালের তরুণেরা আমাদের এইসব হাস্যকর কাণ্ডকারখানার কথা ভেবে অবাক হবে। বুঝতে পারবে না কেন তাদের একজন বিমূঢ় পূর্বসূরি তাদেরই মতো মেধা আর মননশীলতা নিয়ে আজীবন কেবল দেশের মানুষের চিৎপ্রকর্ষ বাড়াবার পণ্ডশ্রমে মানবজন্মের অপচয় করেছিল। হয়তো তার মেধার বা মননের মান নিয়েই তাদের সন্দেহ জাগবে। তারা বুঝবে না : যে-আকুতিতে তার অন্তরাত্মা সেদিন ক্রন্দন করেছে তা কোনো বিস্ময়কর শিল্পসিদ্ধি নয়, একটা নতুন জাতির নির্মাণের বেদনা। একটা অকর্ষিত আদিম ও প্রাথমিক জাতি গড়ে-তোলাতেই সেকালের অনেকের মতো সে-ও নিঃশেষিত ছিল।

১৫

আবেদ খান সকালে ফোন করে জানালেন, একদিনের একটা প্রমোদভ্রমণের পরিকল্পনা দলীয়ভাবে পাশ হয়েছে। যাবতীয় ব্যবস্থাও শেষ। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) আমরা সবাই কুমিল্লার বার্ডে যাচ্ছি। সারাটা শুক্রবার ময়নামতিতে হইচই করে সন্ধ্যায় ফিরে আসা হবে।

প্রস্তাব লোভনীয়, তার ওপর মিলিত সিদ্ধান্তের চোখরাঙানি। কিন্তু কী করে যাব? এতগুলো পাঠচক্র বসবে কেন্দ্রে! এতগুলো ছেলেমেয়ে আমার জন্যে এসে ফিরে যাবে!

কিছুদিন আগেও এমনি একটা নিমন্ত্রণ রাখতে পারিনি। তাই এবার কেউ আমার ওজর-আপত্তি শুনতে নারাজ। আমার অসহায় অবস্থাটা কাউকে বোঝানো মুশকিল। আমি জানি না, না-যাবার ব্যাপারে আমার অনমনীয়তা তাঁর কাছে বাড়াবাড়ি মনে হবে কি না। এ-ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি চললে সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি অনিবার্য। দশটা বছর ধরে সম্পূর্ণ ছুটিহীন, মানুষহীন একটা নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা!

ব্যক্তিগত জীবন—মানবিক সুখ-দুঃখের সেই একান্ত নিজস্ব ছোট উঠোনটুকু—কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে!

১৯৮৮

১৬

কেন্দ্রের সবুজ গাছপালায় ঢাকা অন্তরঙ্গ পরিবেশটা শহরে বেশ প্রিয় হয়ে উঠছে আজকাল। দু-দণ্ড শান্তির জন্যে নাটোরে না-গিয়ে অনেকেই এখন এখানে আসতে চান।

কিন্তু আমাদের জন্যে—এই শান্তির ব্যবস্থাপকদের জন্যে কী বিপরীত! সহস্র বৃশ্চিকদংশনজর্জরিত কী যন্ত্রণামুখর একটা নরক!

১৭

হায় প্রিয় 'কেন্দ্র', এত দাঁড় বাইলাম, কিছুই কাজে এল না। এত বিরুদ্ধতা উজিয়ে কী করে এগোই? সবকিছুই ভবিষ্যৎহীন—শেষপর্যন্ত মির্জা গালিবের সেই শূন্যতারই মতো :

প্রিয়তমাকে হয়তো পেয়েই যেতে গালিব
আর কটা দিন যদি শুধু বেঁচে থাকতে পারতে;

* * *

প্রিয়তমার সঙ্গে মিলন ভাগ্যে ছিল না,
যদি আরও বেঁচে থাকতাম, ওই প্রতীক্ষাই চলত।

১৮

খুব ছেলেবেলায় বারকয়েক কলকাতা থেকে আমরা পূর্ববঙ্গে এসেছিলাম গোয়ালন্দ হয়ে। ফরিদপুর জেলার পুবদিক বরাবর ছিল এই বর্ধিষ্ণু জাহাজঘাট গোয়ালন্দ, এখন যেখানে দৌলতদিয়া ঘাট তার কয়েক মাইলের মধ্যে। অজস্র যাত্রী, মানুষ, শস্তা হোটেল আর ব্যস্ততায় গমগম করত জায়গাটা। গোয়ালন্দের পরেই সেকালের বিখ্যাত জাহাজ-স্টেশন সুরেশ্বর—আমার মায়ের দেশ। জাহাজ-স্টেশনটা ছিল নানাদের জমির ওপর। ছেলেবেলায় এই পদ্মায় সাঁতার কেটেই আমার মা ভালো সাঁতারু হয়েছিলেন। গোয়ালন্দ থেকে জাহাজে চড়ে অনেক পথ পেরোবার পর আমরা নামতাম একটা আলিশান নদীবন্দরে, তারপর কোন্‌দিক দিয়ে কীভাবে কোথায় চলে যেতাম কিছুই মনে নেই।

আমার জন্ম সমতলভূমিতে। এর সঙ্গে আমি পরিচিত এবং অভ্যস্ত। কাজেই নদীর এপার-ওপারের সমতল বাংলাদেশ আমার ভেতর কোনো ঔৎসুক্য জাগাত না। কিন্তু মাঝখানকার প্রমত্ত পদ্মার নানা রঙের শত শত পালে-ভরা উত্তাল নদীর বিস্তীর্ণ অপরূপ জগৎ, বাতাস আর পানির লীলা আমাকে অদ্ভুত কৌতূহলে

জাগিয়ে তুলত। আমার কল্পনাশক্তির সর্বোচ্চ সীমাকেও যা শিউরে তুলত, তা হল দুপাশে বিশাল বিশাল চাকা-লাগানো দৈত্যের মতো অদ্ভুত বিশাল জাহাজটা। প্রচণ্ড গর্জনে ছুটে-চলা এই উদ্ধত অতিকায় যন্ত্রদানবটাকে আমার কাছে একটা অবিশ্বাস্য আর পরাক্রান্ত সত্তা বলে মনে হত। দুপাশের বিশাল উত্তাল জলের পৃথিবীকে ছিঁড়ে-কেটে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে এগিয়ে যেত আর দুপাশ দিয়ে হিংস্র ক্রূর নদীর জলধারা তৃষ্ণার্ত জিহ্বার মতো জাহাজের পেছনদিকে অবিশ্রান্ত ছুটে যেতে থাকত। নিজেকে সেই জাহাজটার উচ্চণ্ড শক্তির অংশ ভেবে ভেতরে একটা গর্বের অনুভূতি টের পেতাম।

অবাক-চোখে বিশাল জাহাজটাকে আমি ঘুরে-ঘুরে দেখতাম। মেঝের ওপর বিছানা পেতে গল্প-করা তাস-পেটানো উদ্দেশ্যহীন মানুষ, খোলের ভেতর সোনালি অতিকায় বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ছন্দিত সগর্জন আক্রোশ, চাকার সংক্ষুব্ধ ঘায়ে জাহাজের পেছনের দিকে বলক-দিয়ে-ওঠা উদ্দাম ঢেউয়ের ক্রমবিলীয়মান সুদীর্ঘ রুপোলি রেখা, সেখানে মৎস্যলোভী জলীয় পাখিদের আশ্চর্য ওড়াউড়ি—সবকিছুই আমাকে এক বিস্ময়কর জগতে নিয়ে যেত।

জাহাজের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লাগত দোতলার সামনের দিকে ডেকের নিরিবিলি শান্ত আর নির্জন জায়গাটুকু। অল্প একটুখানি ধুকধুক শব্দ ছাড়া ইঞ্জিনের শব্দ এখানে এসে পৌঁছোত না। কেবল বাতাসের উত্তাল ছেলেমিপনা আর পানি কেটে ছুটে-চলা জাহাজের উচ্ছল শব্দের একটা অনবদ্য কুহক রচনা করা একটা আশ্চর্য জায়গা যেন সেটা।

জাহাজ ছাড়ত বিকেলে। সন্ধ্যার আলতো অন্ধকারে প্রথমশ্রেণীর সুসজ্জিত ভদ্রলোক এবং প্রিয়দর্শিনী মেয়েরা ডেকের চেয়ারে বসে বা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নিরিবিলিতে গল্প জুড়ত। সন্ধ্যায় জাহাজের ওপরকার সার্চলাইট জ্বলে উঠলে সেই ঝলক-লাগা ঈষৎ আলোয় জায়গাটাকে মনে হত রূপকথার দেশ। পুরুষ-নারীদের টুকিটাকি গল্প তখন যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠত। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাতাস পুরুষদের কলারে আস্তিনে ঝাঁপিয়ে পড়ত আর মেয়েদের চুলে আঁচলে অবাধ্য শিশুর মতো লুটোপুটি খেতে থাকত। এই আবছা অস্বচ্ছ অন্ধকারের ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের উচ্চকিত হাসি, চুড়ির রিনিঝিনি, দমকা হাওয়ায় উড়ে-আসা এক-আধটা টুকরো কথা, পানির ওপর প্রতিফলিত সার্চলাইটের হঠাৎ ঝলক—জায়গাটাকে 'সব পেয়েছির দেশ' করে তুলত।

স্টিমারের ভেতর এখান থেকে ওখানে ঘুরতে-ঘুরতে সেই একই সময়ে এর ঠিক পুরোপুরি বিপরীত একটা জায়গা চোখে পড়ত আমার। খোলের অনেক নিচে, ইঞ্জিনটার সামনে প্রচণ্ড গরমে সেদ্ধ হওয়া, মাথায় লালপট্টি বাঁধা দুজন মানুষকে দেখে প্রায় কঁকিয়ে উঠতাম আমি। প্রকাণ্ড গনগনে বয়লারের সামনে দাঁড়িয়ে ঘামে

জ্যাবজেবে অবস্থায় পোড়া-মুখের ঝলসানো মানুষদুটো শ্রান্তিহীনভাবে বয়লারে কয়লা ঠেলে চলত। বয়লারের লাল আগুনে কয়লার ছোপ-আঁকা তাদের তামাটে মুখগুলোকে মানুষের মুখ বলে মনে হত না। মনে হত তাদের আনন্দ নেই, আকাশ নেই, আছে কেবল ইঞ্জিনের প্রাণঘাতী উৎকট শব্দের পাশে পৃথিবীহীন, আলোহীন প্রিয়মুখহীন একটা নিঃশেষিত জীবন। চারপাশে যখন নদীর সজীব হাওয়া, উত্তাল ঢেউ, জাহাজি খাবারের উগ্র স্বাদু ঘ্রাণ, যাত্রীদের নির্বিকার ঔদাস্য, নারীকণ্ঠের টুকরো অন্তর্ভেদী হাসি, ডেকের ওপর 'সব পেয়েছির দেশ'; তখন গনগনে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ওরা পুড়ে ছাই হতে হতে এই বিশাল জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের লাল রক্তের নিঃশেষিত অঙ্গার দিয়ে তৈরি হচ্ছে জাহাজের জলজ রূপকথা।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের গত তেরো-চৌদ্দটা বছরের স্মৃতি মনে হলেই আমার ওই কদাকার ঝলসানো মুখদুটোর কথা মনে হয়। মনে পড়ে গনগনে বয়লারের সামনে নিষ্কৃতিহীন কয়লা ঠেলতে ঠেলতে একইভাবে আমার তিলে তিলে ছাই হয়ে যাবার কাহিনী।

১৯৯৫

১৯

কী নির্মম কষ্ট চলছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিয়ে! এদেশে সবকিছুর সামনেই শুধু বাধা। কতটুকুই বা করা যাচ্ছে? বিদ্যাসাগর নাকি বলেছিলেন, দেশটার ওপর থেকে কয়েক হাত মাটি তুলে ফেলে দিতে পারলে হয়তো কিছু হলেও হতে পারে, না হলে কোনো আশা নেই। আল মাহমুদের লেখা কবিতার লাইনটা ফিরে ফিরে মনে আসে :

'পুনর্জন্ম নেই আর, জন্মের বিরুদ্ধে সবাই।'

কেন্দ্রের প্রসঙ্গ নিয়ে সেদিন বাংলা একাডেমীতে কথা হচ্ছিল। একজন বলল, 'ভারি কষ্ট গেল আপনাদের।'

'সব কষ্টের মধ্যে প্রসব-বেদনাই সবচেয়ে তীব্র'।—তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

'প্রসব-বেদনার কথা আবার আসছে কেন প্রসব ভালো কথার ভেতর'।—অশ্লীল হেসে খ্যা খ্যা করে উঠল একজন পাশ থেকে।

'আসছে এজন্যে যে মেয়েদের প্রসবের কষ্ট যদি এর অর্ধেকও হত তাহলেও মানবজাতি লুপ্ত হত।'

'কেন, কেন?'—চারদিক থেকে আবার প্রশ্ন।

'পৃথিবীর সব মেয়ে জোট বেঁধে মা হতে অস্বীকার করত বলে।'

এবার সম্মিলিত হইচই।

যত মিথ্যাই হোক, একটা নির্মাণের উদ্দীপনার মধ্যে এতদিন এভাবে জ্বলে-জ্বলে বেঁচে ছিলাম, এর চেয়ে উজ্জ্বল ব্যবহার কী আর হতে পারত এই সময়ের?

১৯৮৭

২০

এ. চৌধুরী কেন্দ্রের জন্যে একটা প্রকল্প লিখে দিতে চেয়েছিলেন। ছ-মাস ঘোরাবার পর কাল তাঁর চূড়ান্ত অপারগতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। উনি জেনে গেছেন তাঁকে দেবার মতো উপযুক্ত টাকা আমাদের নেই। তাঁর কোনো দোষ নেই। টাকাওয়ালা জানোয়ার অলীক ফেরেশতার চাইতে সুন্দর।

১৯৯২

২১

১৯৮৮ সালের দিকের ঘটনা। একদিন মন্ত্রী-পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রপতি এরশাদ আলোচ্যসূচির মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'বাংলাদেশে যে নাস্তিকদের একটা হেডকোয়ার্টার হয়েছে খবর রাখেন আপনারা?'

মন্ত্রীরা সবাই এই ধরনের একটা কিছুই যেন খুঁজছিলেন। ধরে ফেলার অপেক্ষা মাত্র। হঠাৎ প্রভুর মুখেই তার হদিশ জেনে ধড়মড়িয়ে উঠলেন।

'তাহলে আপনারা জানেন না!'

ভালো করে তাকিয়ে বিরক্তি ও হতাশার সঙ্গে সবাইকে দেখে নিলেন রাষ্ট্রপতি। তারপর সবাইকে খানিকটা হতচকিত করেই বলে উঠলেন, 'ওই হেডকোয়ার্টার হচ্ছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।'

ঘটনার রেশ তখনো কাটেনি। দিনকয়েকের মধ্যেই হঠাৎ আবার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রসঙ্গ তুললেন তিনি অন্য এক জায়গায়। এবার ঘটনাটা ঘটল সাভার লোকপ্রশাসন কেন্দ্রের সভাকক্ষে, জনকয় মন্ত্রী আর একদল সচিবের সামনে।

'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে একজন আরেকজনকে দেখলে কী করে জানেন?' বলেই দুই হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'এরকম করে।'

উপস্থিত পারিষদবর্গ প্রভুর দুর্লভ কৌতুক-প্রতিভায় উল্লাসিত হয়ে উঠলেন। একমুহূর্তে সবার কাছে গৃহীত এবং স্বীকৃত হয়ে গেল যে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বাংলাদেশে ভারতের সাংস্কৃতিক এজেন্ট।

এর মাস-তিনেক পর পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে তিনি পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিলেন যে আমরা ভারতের অর্থপুষ্ট, আমাদের

ওপর যেন চোখ রাখা হয়।

তাঁদের কথাবার্তার সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তা মন্ত্রীর সহচর হিশেবে উপস্থিত ছিলেন। ভদ্রলোক আমাদের বন্ধু। কথাগুলো তাঁরই মুখ থেকে শোনা।

* * *

ছেলেবেলা থেকে আমি সাইনাসঘটিত কষ্টে দুরারোগ্যভাবে ভুগছি। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের দিকে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে উঠলে আমার হাত-পা-মাথা থেকে শুরু করে সারাটা শরীর ব্যথায় কষ্টে ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। আমি দুঃসহ শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকি। আমার শক্তি বুদ্ধি কর্মক্ষমতা উৎসাহ শেষ হয়ে আসে। এই কষ্ট উপশমের কোনো ওষুধ নেই। এই কষ্টের কোনো আরোগ্য নেই।

উপায়হীন হয়ে অনেকদিন আগে আমি একবার নস্যি নিতে শুরু করি। মাথার ব্যথা দুঃসহ মনে হলে আমি নাকের ভিতর একমুঠো নস্যির জুলুনি ঠুসে দিতাম। ফল পেতাম হাতে-হাতে। মাথার ভেতর মাথাব্যথা আর নস্যির যন্ত্রণার মধ্যে এমন যুদ্ধ শুরু হত যে সেই ফাঁকে কয়েকটা নিরুপদ্রব মুহূর্ত আমি দিব্যি আরামে কাটিয়ে দিতাম।

কেন্দ্রে প্রথম সাত-আটটা বছরে নানান সন্দিগ্ধ মানুষের এলোপাতাড়ি সমালোচনায়, সংঘাতে, আক্রোশে আমাদের জীবন, আমার অসুখটার মতোই, ক্লেদাক্ত হয়ে উঠেছিল।

সে-সময়টা পৃথিবীর দুই প্রধান পরাশক্তি আমেরিকা আর রাশিয়ার ভয়াবহতম প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর্যায়। সারা পৃথিবীতে পুঁজিবাদী আর সমাজতন্ত্রী শিবিরের মধ্যে অস্তিত্বরক্ষার তুমুল যুদ্ধ। আমাদের দেশও এই লড়াই থেকে পিছিয়ে নেই।

সমাজতন্ত্রীরা বলতে লাগল আমাদের কেন্দ্র আমেরিকান টাকায় তৈরি; ওদিকে আমেরিকাপন্থিরাও নিশ্চিত, এর পেছনে রুশ-সহযোগ আছে।

প্রথম-প্রথম দুপক্ষের এলোপাতাড়ি মার খেয়ে অসহায়ের মতো ভেঙে পড়তাম। আক্রমণকারীদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাদের আমি শ্রদ্ধা করি। অনেকে একবারেই কাছের মানুষ। তাঁরা আমার ভেতরের সরল মানুষটাকে ভালোভাবেই জানতেন। তাদের বোঝা উচিত ছিল : নিজের ব্যক্তিগত জীবনে কারো দিকে ভিক্ষার হাত যে বাড়ায়নি, জাতির স্বার্থের জন্যেও খুব-একটা নিচে নামা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় তাঁদের এসব অভিযোগের মুখে নিজের রক্ষণাবণ আরও বাড়তে লাগল।

কিন্তু ব্যাপারটা কিছুদিনের ভেতরেই সয়ে এল। আমেরিকার সমর্থকেরা আমাদের প্রতিষ্ঠানকে রাশিয়ার আর রুশপন্থিরা আমেরিকান টাকায় তৈরি বলে নিজেদের ভেতরই এমন দাঙ্গা শুরু করলেন যে, সাইনাসের কষ্ট আর নস্যির

জুলুনির ফাঁকে আমার স্বস্তিপূর্ণ সময়টুকুর মতো, আমার দিনগুলোও মোটামুটি ভালোই কাটতে লাগল।

* * *

আমাদের প্রতিষ্ঠানে এসে অনেকেই প্রথম-প্রথম এটিকে বিদেশি সহযোগিতায় তৈরি মনে করতেন। কেন এমনটা মনে হত সেটা আঁচ করা কঠিন নয়।

কেন্দ্রটাকে আমরা প্রথম থেকেই ছবির মতো পরিপাটি আর ঝকঝকে করে রাখতে চেষ্টা করেছি। যে-পরিবেশে আমাদের দেশের অনুভূতিময় উৎসুক কিশোর-তরুণদের মনের পাপড়ি একটু-একটু করে উন্মীলিত হবে, হৃদয় বড় স্বপ্নের দিকে ডাল মেলবে, তা পরিচ্ছন্ন আর পরিপাটি না হলে চলবে কেন?

এতে-যে আমাদের তেমন কিছু একটা খরচ হত তা নয়। সামান্য কিছু রুচি, যত্ন আর সজাগ নজরদারি দিয়ে আমরা তা খুব সহজেই করতে পারতাম।

আমাদের দেশের আর-দশটা গোমড়ামুখো প্রতিষ্ঠানের গেঁয়ো বিরস চেহারা দেখে-দেখে যাদের চোখ অভ্যস্ত, তাঁদের কাছে এই পরিবেশটাকে বেশিরকম বিদেশি বলে মনে হত। এর খেসারত দিতে হত আমাদের কেন্দ্রের সবকিছুর মধ্যে তারা অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্যের একটা তীব্র তীক্ষ্ণ ছোবল অনুভব করতেন।

* * *

আমাদের-যে কিছু উচ্চতর রুচি ছিল তা আমাদের অপরাধ নয়। কিন্তু তা আমাদের অপরাধ হয়ে দাঁড়াল। আমরা অন্যান্য এনজিওগুলোর মতো আমাদের দেশে বিদেশি-স্বার্থের প্রতিনিধি হিশেবে আখ্যা পেতে শুরু করলাম।

অনেকেই যে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে বিদেশি টাকায় তৈরি মনে করতেন তার আর-একটা কারণ ছিল। আমাদের কেন্দ্রের অপ্রতিহত অগ্রগতি অনেকের কাছেই সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'কী করে সম্ভব হচ্ছে এতসব?'

শুধু পরিশ্রম আর কষ্ট দিয়ে পৃথিবীতে যে কী অসম্ভব কাণ্ড ঘটানো সম্ভব, তা, যে-জাতি চিরকাল বিদেশিদের দ্বারা শাসিত হয়েছে, তাদের অনুগ্রহে অস্তিত্ব বাঁচিয়েছে, তাদের কী করে বোঝানো সম্ভব। দেশে যা-কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং তুলে-ধরার মতো তার সবই তৈরি করেছে বিদেশিরা। সব কালে সমস্তকিছু নির্মাণ করার গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকায় নিজেদের ওপর আমাদের আস্থা এমনভাবে কমে গেছে যে নিজেরা-যে কোনোকিছু তৈরি করতে পারি এই বিশ্বাসটাও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। অনেকের কাছে তা বেয়াদবির শামিল বলেও মনে হয়।

কেউ ভালোকিছু করে ফেললেও আমাদের সবার চোখে নানান ধরনের প্রশ্নবোধক চিহ্ন ঘোরাফেরা করে।

সারাদেশে ছড়ানো আমাদের শাখাগুলোর সংগঠকদের অনেকে প্রতিবছর

তাদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি করার জন্যে ঢাকা থেকে খ্যাতিমান ব্যক্তিদের পাঠানোর জন্য আমাদের কাছে আবদার আবেদন পাঠান। দেশের প্রবুদ্ধ ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি, বিশেষ করে জনপ্রিয় টিভি-ব্যক্তিত্বদের ব্যাপারেই তাদের আগ্রহ বেশি।

স্থানীয় সুধীজনদের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের কাউকে দিয়ে ওসব দায়িত্বটি পালন করানোর জন্যে আমি তাঁদের অনেকবার অনুরোধ করেছি।

এঁরা এসব কথা শুনতে রাজি নন। তাঁরাও নিরুপায়। কেন্দ্রের সভা থেকে আরম্ভ করে অভিভাবক ও শহরবাসী সবার এটা সমবেত দাবি। এ হতেই হবে। এর অন্যথা চলবে না। চাই ঢাকা থেকে আসা অতিথি। স্থানীয় বিজ্ঞজনকে প্রধান অতিথি বা সভাপতি করলে কেন্দ্রের ভাবমূর্তি দুর্বল হবে।

যুগ-যুগ ধরে আমরা নিজেদের আত্মশক্তিকে অবিশ্বাস করেছি। বাইরে থেকে আল-বোগদাদি বা আল-কান্দাহারি না-এলে আমাদের ভক্তিরস সম্পূর্ণ হয় না। এমনকি পির হতে হলেও তাকে মধ্যপ্রাচ্য-ধাঁচের নুরানি চেহারার হতে হয়। অন্তত ফরসা হতে হয়। আমাদের যুগ-যুগের প্রভু-শাসকদের মতো দেখতে হতে হয়। তবে আমাদের আস্থা আসে। পিরের গায়ের রং কালো হলে তার ফুঁয়ে অসুখ সারে না।

বিদেশি সাহায্য ছাড়া, কেবল নিজেদের চেষ্টা, কষ্ট, আত্মাহুতি আর ত্যাগের পথ ধরে আমরাও-যে কোনো মর্যাদাবান জাতির মতো সত্যিকার ও সম্মানজনক কিছু গড়তে পারি তা কিছুতেই আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে নেই। কেন নেই তার কারণ বোঝাও অসম্ভব নয়।

এদেশে যতটুকু, যা-কিছু ঘটেছে, তা করেছে বিদেশিরা—পাল, সেন, মোগল, পাঠান, ইংরেজ, পাকিস্তানিরা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের বড় অবদান না-থাকায় এসব-যে আমরাও করতে পারি তা আমাদের বিশ্বাসের বাইরে চলে গেছে। এই ব্যর্থতার জন্য কষ্ট পেয়ে বা অন্যদের অভিযুক্ত করে লাভ নেই। আমাদের দেশের উদ্যমশীল মানুষেরা সৎ-আত্মদানের ভেতর দিয়ে জাতির সামনে উজ্জ্বল সাফল্য দেখাতে শুরু করলে স্বাভাবিকভাবেই এইসব অবিশ্বাসের অবসান হবে।

* * *

রাষ্ট্রপতির খাড়া যে আমাদের ওপর নেমে আসছে তার কিছু আলামত আমরা আগে থেকেই পাচ্ছিলাম। আমাদের কেন্দ্রের বর্তমান বাড়িটার মালিকানা তখনো ছিল পূর্ত-মন্ত্রণালয়ের হাতে। একাত্তরের পলাতক পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিশেবে পূর্ত-মন্ত্রণালয় ছিল এটির মালিক। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদেশে এই বাড়িটিসহ চৌদ্দটি বাড়ি ঢাকা মহানগরীর বাসিন্দাদের কল্যাণে ব্যবহারের জন্য পৌর-করপোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যেহেতু সারাদেশের মতো ঢাকা মহানগরীর বাসিন্দাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে নিয়োজিত এবং এই নগরবাসীদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নতি নগর-করপোরেশনেরও অন্যতম আরাধ্য, তাই একটি সৌধ-উন্মোচনের আওতায় আমরা নগর-করপোরেশনের কাছ থেকে বাড়িটিকে আমাদের কেন্দ্রের মূল কার্যালয় হিশেবে ব্যবহারের অধিকার পাই। শর্ত ছিল যতদিন আমাদের প্রতিষ্ঠান এই দায়িত্ব পালন করবে ততদিন আমরা বাড়িটি ব্যবহারের অধিকারী থাকব।

আমার এককালের সহপাঠী মেয়র আবুল হাসনাতের উদ্যোগে এবং দেশের জনকয় শীর্ষস্থানীয় আমলার সক্রিয় সহযোগিতায় এই অসম্ভব ব্যাপারটাও সম্ভব হল। বাড়িটি আমাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু গোল বাধে অন্য জায়গায়। বাড়ির মালিকানা আমাদের হাতে ছিল না বলে কেন্দ্রের অঙ্গনে প্রয়োজনীয় নতুন ভবন নির্মাণ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। আমরা তখন মেয়রের অনুমতি নিয়ে পূর্ত-মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে এই বাড়ি কিনে নেবার আবেদন করলাম। যেহেতু শিক্ষা বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে পরিত্যক্ত বাড়ি নির্ধারিত মূল্যের শতকরা বিশ ভাগ দামে বিক্রির ছিল রেওয়াজ সরকারের আছে, তাই আমরা সরকারের কাছে বাড়িটি শতকরা বিশ ভাগ দামে আমাদের কাছে বিক্রি করার আবেদন করলাম। পূর্তমন্ত্রী আমাদের আবেদনের অনুকূলে সারসংক্ষেপ তৈরি করে রাষ্ট্রপতি এরশাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যে একটি শিক্ষা এবং সংস্কৃতিধর্মী প্রতিষ্ঠান, এই মর্মে শিক্ষাসচিব এবং সংস্কৃতি-সচিবের পত্রও সারসংক্ষেপের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এরশাদ সুপারিশটি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে পূর্তমন্ত্রীর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং ফাইলটি বিবেচনাযোগ্য না-হবার কারণ হিশেবে স্পষ্ট অক্ষরে লেখেন : 'এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষা বা সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই।' কথাটা লেখেন তিনি মন্ত্রীর সারসংক্ষেপের ওপর, যার ঠিক নিচেই ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি সচিবের চিঠি দুটো যাতে তাঁরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রের 'উল্লেখযোগ্য' অবদানের বিষয়টি সপ্রশংসভাবে উল্লেখ করেছিলেন।

১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে এরশাদের স্বৈরাচারী যুগের পতন হলে সারাদেশ গণতন্ত্রের উদার পরিবেশে নতুন আশা ও স্বপ্নে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

সবাই এই ভেবে উদ্দীপ্ত হয় যে এই নতুন মুক্ত পরিবেশে জাতির রুদ্ধ উদ্যম এবং সৃজনশীলতা আবার বিকাশের সুযোগ পাবে।

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা কেন্দ্রের জন্যে সহযোগিতার আবেদন নিয়ে সংস্কৃতি-মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করলাম। একপর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয়েই গেল যে সংস্কৃতি-মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন খাত থেকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে ১৬ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হবে। সংস্কৃতি-মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর সম্মতি

নিয়েই ব্যাপারটা ঠিক হয়। এখন কেবল মন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদনের আনুষ্ঠানিকতা। আমাদের উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমের ব্যাপকতা সম্বন্ধে মন্ত্রীর সন্তুষ্টি এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সংস্কৃতি-সচিব মন্ত্রীকে নিয়ে একদিন কেন্দ্র-পরিদর্শনে এলেন। সব দেখার পর মন্ত্রীকেও উদ্ভাসিত এবং প্রফুল্ল দেখাল। মন্ত্রণালয়ের অধস্তন মহল থেকে গোপন আভাস এল, চেক প্রায় রেডি। আকাশ মেঘমুক্ত। সংশয়ের আর অবকাশ নেই। 'টুটল সবহু সন্দেহা'।

কিন্তু তারপরই হঠাৎ এক দীর্ঘ অসুস্থ নীরবতা। কী ব্যাপার? এমন নিশ্চিন্ত অবস্থায় নৈঃশব্দ্য কেন? খোঁজ নিতেই অপরাধ জানা গেল। কে নাকি মন্ত্রীর কাছে আমাদের নামে উল্টোপাল্টা কী সব বলেছে। এরশাদের কাছে যেভাবে কেউ ভারতপন্থি কিংবা অন্যকিছু বলে তাঁর মাথা গরম করেছিল সেরকমই কিছু।

ব্যাপারটা নিয়ে হয়তো মন্ত্রীর কাছে দরবার করা যেত। উঁচুমহলের প্রভাব খাটিয়ে ব্যাপারটার মুখও ঘোরানো যেত। কিন্তু রুচিতে কুলোল না। চিরকাল এদেশের সবচেয়ে প্রতিভাবান এবং উজ্জ্বল মানুষদের ভেতর আমার জীবন কেটেছে। এত স্থূল এবং অমার্জিত মানুষদের কাছে অনুরোধ করতে কোথায় যেন আত্মমর্যাদায় বাধে।

গতবছর ঘটল একইরকম একটা ঘটনা। পরিকল্পনা-কমিশনের একজন প্রভাবশালী সদস্যের উৎসাহে এবং পরিকল্পনামন্ত্রীর পরামর্শে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের জন্যে সাড়ে চার কোটি টাকার একটা প্রকল্প শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ে পেশ করেছিলাম। শিক্ষামন্ত্রী অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সারপত্রটি পরিকল্পনা-কমিশনে পাঠিয়ে দেন এবং প্রকল্পটি পরিকল্পনা-কমিশনের ত্রিবার্ষিক হার্ড কোর-এর আওতাভুক্ত হয়।

প্রকল্পটি একসময় সরকারি প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। পরিকল্পনা-কমিশন থেকে আমাদের একরকম আভাসই দিয়ে দেয়া হয় যে আমরা যেন প্রথম কিস্তির এক কোটি টাকা মাসখানেকের মধ্যে পেলে তা ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত থাকি।

কেন্দ্রের অভাবনীয় উন্নতির স্বপ্নে আমাদের দিনরাত্রিগুলো রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে। এখন আর মাত্র একটা পর্ব বাকি, যা সমাধা হলে সব বাধা শেষ। সেটা হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদন। এই পর্বে অনভিপ্রেত কোনো বিপর্যয় ঘটে যাবার ন্যূনতম সম্ভাবনা নিশ্চিহ্ন করার জন্যে আশঙ্কাতাড়িত অবস্থায় আমি একদিন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম।

শিক্ষামন্ত্রী প্রসন্নচিত্তে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন : দেখেন আমার নিজের ছেলে আপনার প্রতিষ্ঠানের সভ্য। পারিবারিকভাবেই আমরা এই প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণী। আপনি শত্রু হলেও আমি এই প্রতিষ্ঠানের জন্যে করতাম। সেখানে আপনি তো মিত্র।

মন্ত্রীর কথাগুলো খুবই আশাব্যঞ্জক। প্রসন্নমনেই আমার ফিরে আসার কথা। কিন্তু তাঁর ঘরের দরোজা পেরোবার আগেই বুকের ভেতরটা কেন যেন অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। মনে হল কথাগুলো এত মধুর কেন! এত মাধুর্য তো সন্দেহজনক।

দুদিন পরে সচিবালয়ে গিয়ে জানলাম, আমার আশঙ্কা সঠিক। মন্ত্রী আমাদের প্রকল্প নাকচ করেছেন।

কেন নাকচ হল। খোঁজ নিয়ে বুঝতে পারলাম, সেই আগেরই ঘটনা। কানকথা। মন্ত্রণালয়ের এক পদস্থ কর্মকর্তা তাঁর কাছে নাকি কেন্দ্র সম্বন্ধে 'কী সব' বলেছেন।

কানকথা এখন আমাদের দেশের বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দুর্বলচিত্ত গড়পড়তা মানুষেরা এর ওপরেই নির্ভর করে।

রাশিয়ার পতন ঘটে যাওয়ায় রুশপন্থিদের অপবাদ থেকে এতদিনে রেহাই পেয়েছি। আমেরিকা এখন পৃথিবীর ত্রাণকর্তা। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদপন্থি হওয়াতে অস্পৃশ্যতার আশঙ্কা নেই। সুতরাং হয় নাস্তিক, নয় ভারতপন্থি—এদের হাতে ঘায়েল হওয়াই এখন আমাদের নিয়তি।

সুতরাং আমাদের দুঃখকষ্টের অবসান খুব তাড়াতাড়ি হবে, এটা আশা না-করাই ভালো। স্বৈরাচারী সরকারের আমলে আমাদের দুঃখকষ্ট গেছে। জাতীয়তাবাদী দলের আমলেও যাচ্ছে। যে-প্রগতিশীল ধ্যানধারণায় আমরা বিশ্বাসী, তার নিকটতর ধারক আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেও আমি জানি একই ঘটনা ঘটবে। ওই দলের চাইতে আরও আলোকিত আরও প্রগতিশীল কোনো দল ক্ষমতায় এলেও এর কোনো ব্যত্যয় হবে না। আমার ধারণা, কোনোদিন যদি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সরকারও ক্ষমতায় আসে তবু এই দুর্দশাই চলবে।

২২

ঢাকা কেন্দ্রের কলেজ কর্মসূচিটা চালাই আমি নিজেই। বছরে পাঁচ থেকে ছয়শো ছাত্রছাত্রী যোগ দেয় কর্মসূচিতে। আমার সঙ্গে এরা ন-দশ মাস থাকে। প্রথমে এরা পড়ে বইপড়া কর্মসূচির বারোটি বই, এরপর যাদের উৎসাহী বা মেধাবী বলে মনে হয় তাদের দেওয়া হয় আরও বিশ থেকে পঁচিশটি বই পড়ার সুযোগ।

ছেলেমেয়েদের ভাগ করা হয় সাত-আটটি গ্রুপে। প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক গ্রুপের সদস্যেরা বাড়িতে পড়ার জন্যে নিয়ে যায় একটি বিশেষ বই। পরের সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে তারা ঐ বইটির ওপর আলোচনায় বসে। উষ্ণ, উত্তপ্ত ও আনন্দমুখর আলোচনা। ছেলেমেয়েরা উদ্দীপ্তভাবে নানাদিক থেকে বইটির ওপর আলো ফেলে,

উত্তেজিত তর্কে বাদানুবাদে সরগরম হয়ে ওঠে। কী করে বইটির গভীর থেকে গভীরতর জায়গায় যেতে হবে আমি সে-ব্যাপারে তাদের খেই ধরিয়ে দিই। বইটির নানা উজ্জ্বল এবং বলীয়ান দিকগুলোকে প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরে বইটির স্বপ্ন, দীপ্তি আর আনন্দের ভুবনের ভেতর তাদের আনন্দময়ভাবে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করি।

ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। তবু কষ্ট যা যায় তার সবটা আমার ওপর দিয়েই। এতগুলো দলের সঙ্গে বারে বারে বসতে বসতে শরীর মনের ওপর চাপ পড়ে। মাঝে মাঝে বিবমিষায় শরীর ঘুলিয়ে ওঠে। বছরের বায়ান্ন সপ্তাহের মধ্যে ছুটি পাই মাত্র আট সপ্তাহ, বাকি চুয়াল্লিশ সপ্তাহ ধরে একটানা এই স্টিমরোলারের নিষ্পেষণ। ঢাকায় বা ঢাকার বাইরে যেখানেই যাই, ঝড়-বাদল, নিমন্ত্রণ সামাজিকতা যাই থাকুক, এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। ক্লাসগুলোতে এসে যোগ দিতেই হবে। নাহলে ছেলেমেয়েদের নেশার ঘোর আর মাদকতায় ভাটা পড়বে। ঝাঁপিয়ে পড়ার বা আক্রমণ করার হিংস্রতা তারা হারিয়ে ফেলবে। এদের মন বিক্ষিপ্ত আর অসাড় হয়ে পড়বে, এরা হয়ে যাবে সাধারণ। আমাদের অভীষ্ট সফল হবে না।

সামান্য ব্যাপার। দশমাসে মাত্র তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা বই। কিন্তু কী যে আশ্চর্য প্রভাব এর। ছেলেমেয়েদের আপাদমস্তক যেন পুরোপুরি পাল্টে যায়। দশমাস আগের সেই ছেলেমেয়ে বলে এদের যেন আর চেনাই যায় না। নতুন স্বপ্নে আর অনুভূতিতে থৈথৈ করে তারা তখন। নতুন উদ্দীপনার বল্লম হাতে যেন দাঁড়িয়ে যায়।

কত অল্পে জীবন নিজেকে অতিক্রম করে ওপরে ওঠে, দেখে অবাক লাগে! এর জন্যে টাকা লাগে না, ভর্তির জন্যে খোশামোদ করতে হয় না, সুযোগের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় অভিভাবকদের গলদঘর্ম হবার দুর্ভোগ নেই, কেবল দয়া করে এই বইগুলো পড়ে সপ্তাহে একদিন ঘণ্টাদুয়েকের জন্যে একটু এলেই হল। কিন্তু এটুকুতেও আমাদের অনেক অভিভাবক নারাজ। সারাদিন ছেলেমেয়েদের ইশকুল, কোচিং সেন্টার আর নোট মুখস্থের অসুস্থ ঘানির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাদের কচিবয়সটাকে সারাজীবনের জন্যে নিজেদের অজান্তে থেঁতলে দিচ্ছেন তাঁরা। তাদের একমাত্র লক্ষ্য : যেনতেন প্রকারে সন্তানদের পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ানো। সেজন্য একটা আনন্দহীন পরিশ্রমক্লিষ্ট অবসন্ন জীবনের মধ্যে জোয়ালবাঁধা ক্লান্ত পশুর মতো তাঁদের কয়েদ করে রাখতে তাদের বিকার নেই। সেখানে সপ্তাহে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দুটো ঘণ্টা অবকাশ আর আনন্দের অনাবিল পরিবেশে কাটানোও তাদের জন্যে নিষিদ্ধ।

শুক্রবার সকালে দুটো ঘণ্টার জন্যেও তারা ছেলেমেয়েদের কেন্দ্রে আসতে দিতে আপত্তি করে। এর চেয়ে সময়টা প্রাইভেট টিউটরের কাছে গিয়ে পড়লে অনেক লাভ। এই ধারণার কারণেই কীনা জানি না এই কর্মসূচিটায় ছেলেমেয়ের সংখ্যা আগের তুলনায় গত কয়েক বছরে বেশ কমে এসেছে, বিশেষ করে মেধাবী

ছেলেমেয়ের সংখ্যা। লোকগুলো বুঝতেও পারে না কত দুর্লভ একটা সুযোগ থেকে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করছে। কত তুচ্ছমূল্যে কতবড় জিনিসকে পায়ে ঠেলছে যা এদেশে মাথা কুটলেও অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। জীবনে এরা বৈষয়িকভাবে যতই সফল হোক, বিত্তবৈভবের যতবড় পাহাড়ই গড়ে তুলুক, জীবনটাকে তো তাদের উপভোগ করতে হবে নিজেদের মনগুলো দিয়েই! এই মন যদি সবল আর সুন্দর হয়ে বেড়ে না ওঠে তবে জীবনের অনির্বচনীয়তাকে তারা আস্বাদ করবে কী দিয়ে? আমার প্রায়ই মনে হয় এমন একটা সুযোগ যদি আমার ছেলেবেলায় আমি পেতাম, হয়তো আমার জীবনটা আরও শ্রীসম্পন্ন হত, জীবনের মাধুরীকণাগুলোকে আরও স্নিগ্ধভাবে অনুভব করতে পারতাম।

বেশ কিছুদিন আগের একটা ঘটনা। একজন অভিভাবক এলেন আমার কাছে। কী ব্যাপার! মেয়েকে তিনি কেন্দ্রের কর্মসূচি থেকে ছাড়িয়ে নিতে চান। শুনে খুব রাগ হল ভদ্রলোকের ওপর। বললাম, দেখেন, ও মাত্র বারোটা বই পড়বে। যদি পরের বিশটা বই পড়ার সুযোগ না পায় তবে এই কটা বই-ই তো শেষ। বারোটা বই পড়তে মোট ক ঘণ্টা সময় লাগে বলেন তো? প্রতিটা বই পড়ার জন্য চার ঘণ্টা করে ধরলেও মোট আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি নয়। আটচল্লিশ ঘণ্টায় কটা দিন হয়? দুটো দিনই তো মাত্র। তো কোচিং, নোট, মুখস্থ আর পরীক্ষার ঘানির জন্য মেয়েটাকে বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন দিতে পারছেন, 'মানুষ' হওয়ার জন্য দুটো দিনও দেবেন না?

আমার যুক্তি বুঝেই কী না ভদ্রলোক মেয়েটাকে আর ফিরিয়ে নেননি। মেয়েটা পরে সত্যি একজন 'ভালো মেয়ে' হয়েছিল।

১১.৫.৯৮

ব্যক্তিগত ভাবনা

১

কেন্দ্রের ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে মুশকিল। এরা এমন সুন্দর আর গুণান্বিত— প্লেটোর একাডেমিও হয়তো এদের পেলে গর্ব করত। কিন্তু সমস্যা : এদের মধ্যে যারা সন্ন্যাসী তারা যৌবনকে চেনে না—যারা তারুণ্যদীপ্ত তারা প্রত্যাখ্যানে পরাঙ্মুখ। এক-হাতে যৌবন, অন্য-হাতে প্রত্যাখ্যান—যৌবরাজ্যের সেই কান্তিমান বরপুত্রদের কোথায় পাই?

১৯৮৪

২

খরগোশ আর কচ্ছপের দৌড়-প্রতিযোগিতার গল্পটা মনে পড়ছে।

খরগোশ তো বাতাসের বেগে ছুটে পলকের মধ্যে গন্তব্যের অর্ধেকেরও বেশি চলে গেল। এমন সময় হঠাৎ মনে হল : দেখি তো কচ্ছপ কতটা পেছনে পড়ে আছে! (কেন মনে হল তার?) পেছনে তাকিয়ে দেখে, কচ্ছপ তার স্বভাবগত ধীরগতিতে অল্প একটু পথ কেবল এগিয়েছে। খরগোশ বুঝল কচ্ছপ নেহাতই অপদার্থ, গন্তব্যে পৌঁছোতে তার বহু সময় লেগে যাবে। এই ফাঁকে সুখ করে একপ্রস্থ ঘুম দিয়ে নেয়া যাক! আরামে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে উঠবে। ভাবনা আর কাজে খুব-একটা পার্থক্য হল না। সে গভীর ঘুমের ভেতর তলিয়ে গেল। ঘুম ভাঙতেই গভীর হতাশার সঙ্গে সে আবিষ্কার করল, তার মূঢ় আত্মবিশ্বাস তাকে মর্মান্তিকভাবে ঠকিয়েছে। তার সুখনিদ্রার সুযোগে মন্থরগতির কচ্ছপ সাধ্যমতো চেষ্টায় গন্তব্যের এত কাছে পৌঁছে গেছে যে, বিদ্যুৎগতিতে দৌড়িয়েও এখন আর তার পক্ষে কচ্ছপের আগে গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

উচ্চতরভাবে যোগ্য খরগোশের এই দুঃখজনক পরাজয় আমাকে ছেলেবেলা থেকে ভাবিয়েছে। অস্তিত্বের সংগ্রামে তো শ্রেষ্ঠরাই জয়ী। সার্বিক যোগ্যতার দ্বন্দ্বে

শ্রেষ্ঠ কেন হারবে?

নাকি খরগোশের আপাতযোগ্যতার আড়ালে ছিল কোনো অক্ষমতার বীজ, যা তার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদি থাকে, তবে কী সেটা।

খরগোশ ক্ষিপ্রগতির, কিন্তু তার শরীর-গঠনের দিকে তাকালেই বোঝা যায় কচ্ছপের তুলনায় কী ভঙ্গুর আর করুণ তার শরীর। কী হালকা আর তুলতুলে। কঠোর কষ্টসহিষ্ণুতার পক্ষে কী জন্মগত-প্রতিকূল, কী সহজাত-অযোগ্য। এর ফল হাতেনাতে। প্রতিযোগিতার অর্ধেকটা পথ না-পেরোতেই শক্তির মজুত ফুরিয়ে তার শরীর অবসন্ন হয়ে ভেঙে এসেছে, সে চোখে অন্ধকার দেখেছে। না ঘুমিয়ে তার তখন আর উপায় নেই। ফলে কচ্ছপের পেছনে-পড়ে-থাকাকে যৌক্তিক অজুহাত হিশেবে দাঁড় করিয়ে সে ঘুমিয়ে গেছে। ক্লান্ত এবং নিঃশেষিত শরীরে তখন তার একমাত্র বিবেচনা ঘুম—গভীর পরিপূর্ণ একপ্রস্থ গাঢ় ঘুম।

গন্তব্যে পৌঁছে কচ্ছপের অবস্থা দেখার জন্যে সে পেছনে তাকাতে পারত, কিন্তু তা সে করতে পারেনি। হয়তো অবসন্নতায় নিস্তেজ-হয়ে-আসা তার দু-চোখের অন্ধকারই তাকে তা করতে দেয়নি। তার শারীরিক অক্ষমতা নিয়তির মতো অমোঘ হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘাসের ওপর তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিযোগিতায় জয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাবই তাকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে কচ্ছপের সুগঠিত শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকালেই আমরা তার সাফল্যের কারণ টের পেতে পারি। খোলের শক্ত গোল ঢাকনা দিয়ে সুদৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত সে একটা দুর্ভেদ্য দুর্গবিশেষ। দৈহিকভাবে অসাধারণ সুগঠিত, প্রবলভাবে কষ্টসহিষ্ণু এবং প্রাণিজগতের মধ্যে সবচেয়ে আয়ুষ্মান সে। একটা যুদ্ধাস্ত্র-সজ্জিত ট্যাংকের মতো মন্থরগতিতে সে পৃথিবীর ওপর হেঁটে বেড়ায়। সুস্থির, নির্বিকার ও অবিচল কচ্ছপের সঙ্গে শারীরিক ও মানসিকভাবে এমন দুর্বল এবং অস্থিরচিত্ত খরগোশ কি কেবল ক্ষিপ্রতা দিয়ে জয়ী হতে পারে?

মূল্যবোধগত অবস্থানের দিকে থেকেও কচ্ছপ সন্দেহাতীতভাবে খরগোশের ওপরে। খরগোশের প্রতিযোগিতার লক্ষ্য ছিল : বিজয়। বিজয় সম্বন্ধে সামান্যতম সন্দেহ থাকলেও তাকে প্রতিযোগিতার এই কষ্টকর যাত্রায় উৎসাহী করা যেত না। কচ্ছপের ধীরগতি বিজয় সম্পর্কে খরগোশকে নিশ্চিত করে তার মনে দুটো ক্ষতিকর প্রবণতার জন্ম দিয়েছে : এক. নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধে তার ভুল আত্মবিশ্বাস জন্মেছে; দুই. নাক-উঁচোনো তাচ্ছিল্য, যার ফলে কচ্ছপের প্রকৃত মূল্যায়নে সে অক্ষম হয়েছে।

কচ্ছপ কিন্তু এই প্রতিযোগিতাকে নিয়েছে সম্পূর্ণ খেলোয়াড়ি মনোভাব থেকে। জয়-পরাজয়ের অতীত এক অপার্থিব খুশিকে প্রাপ্তি করে। এককথায় 'শুধু অকারণ পুলকে।' নইলে খরগোশের লোকশ্রুত ক্ষিপ্রগতির কথা জানার পরেও তার বিখ্যাত মন্থরতা নিয়ে সে কীভাবে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারল?

অবারিত আনন্দের প্রতি সহজাত আনুগত্য তাকে দিয়েছে এই সচলতা, আর ঐকান্তিকতার পায়ে সনিষ্ঠ নিমগ্নতা তাকে দিয়েছে এই বিজয়।

কেন্দ্রে সাধারণভাবে দু-ধরনের ছেলেমেয়ের দেখা পাই। একধরনের ছেলেমেয়ে আছে যারা সামনে জবরজং বা উৎসবধর্মী কোনো কাজ পেলে প্রায় পাহাড়-পর্বত গুঁড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারে। পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে, খেটে, নিজেদের প্রায় ধ্বংস করে, সেই অসাধ্য তারা সাধন করে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপর হয়তো বছরখানেক আর তাদের দেখাই নেই। এরা খরগোশ-দলের। রাস্তায় এরা ক্ষিপ্রগতি। সামনে বড়কিছু পেয়ে গেলে জয়ের গৌরব বা মর্যাদার স্বপ্নমেদুর আবেগে এরা প্রায় আত্মধ্বংসীভাবে কাজ করতে পারে। জীবন বাজি রেখে বা পুরো শক্তি একখানে করে অনায়াসে মৃত্যুসংকুল সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়। দরকারে নিজেদের পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলে। কিন্তু এ কেবল সেই অল্পসময়ের জন্যেই। এর পরেই এদের শক্তি ফুরিয়ে যায়, এরা অবসন্ন হয়ে ভেঙে আসে—পরের দায়িত্বগুলোকে অনায়াসে ফেলেফুলে 'ঘুম'—পরিপূর্ণ একপ্রস্থ গাঢ় ঘুমের জগতে চলে যায়। ছোট কিন্তু দুঃসাধ্য কাজের এরা উপযোগী, কিন্তু দূরযাত্রার জন্য অনুপযুক্ত। যে-কোনো সংগঠনের জন্য এরা জরুরি, কিন্তু তার মূল ভিত্তি নয়।

আর-একধরনের ছেলেমেয়ে কেন্দ্রে আছে, যারা সংখ্যায় খুবই অল্প, অঘটনঘটনপ্রতিভা হয়ে রাতারাতি কোনো অবিশ্বাস্য দিগ্বিজয়ের নায়ক হবার আগ্রহ নেই যাদের ভেতর, পরিবর্তে ধীরস্থিরভাবে কর্তব্যপালনের এক দীর্ঘস্থায়ী অবিচল ও অপরাজেয় শক্তির যারা অধিকারী। এরা হচ্ছে কচ্ছপ-গোত্রের মানুষ। খরগোশদের রোমান্টিক-প্রেমিকসুলভ দেহকান্তির ভঙ্গুর লাবণ্য এদের নেই, পক্ষান্তরে এদের চরিত্রে রয়েছে কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর সহিষ্ণু দৃঢ়নির্ভরশীল ব্যক্তিত্ব।

কেন্দ্রে আমাদের খরগোশ আর কাছিম—দু-ধরনের কর্মীই দরকার। কিন্তু সবচেয়ে যা বেশি দরকার তা হল 'খরছিম'। খরছিম মানে খরগোশের মতো ক্ষিপ্রগতি আর কাছিমের মতো সুস্থির, কষ্টসহিষ্ণু, দূরযাত্রী।

কিন্তু এত বিরল এই প্রজাতির যে, আজ পর্যন্ত প্রায় দেখাই মিলল না।

১৯৯৪

৩

একবার এক ভদ্রলোক কেন্দ্রে এলেন। একজন পড়ুয়া ছেলের গর্বিত পিতা তিনি। ছেলের প্রসঙ্গ উঠতেই বললেন, 'আমার ছেলে সারাক্ষণই কেবল বই পড়ে।

উত্তরে বললাম : কোনোকিছুই বেশি ভালো নয়। এমনকি বইপড়াও নয়। বই জীবনকে সমৃদ্ধ করুক কিন্তু জীবনকে যেন ছাড়িয়ে না যায়। পানির আরেক নাম জীবন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পানিতে ডুবে মরার সময় আমরা সেই পানি

খেতে-খেতেই অর্থাৎ জীবন খেতে-খেতেই মরি। জীবন তখন জীবনকে হত্যা করে। বন্ধু শত্রুর ভূমিকায় কাজ করতে থাকে। সীমানা লঙ্ঘন এভাবে আমাদের সমাপ্তি ডেকে আনে।

বই হচ্ছে আমাদের পূর্বসূরি প্রতিভাবান মানুষদের জীবন এবং সংগ্রামের সঠিক ও বিস্ময়কর গল্প। আমার ভেতরে যে-জীবনসংগ্রাম আছে তাকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্যেই ওইসব মানুষের লেখা বই আমাদের পড়তে হয়। আমার আগের শক্তিমান মানুষেরা কোন্ পরিস্থিতিতে কী ধরনের বুদ্ধিমত্তা, ক্ষিপ্রতা, প্রতিভা ও কল্পনাশক্তি দিয়ে তাদের সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন, সেই দৃষ্টান্তের প্রক্রিয়াগুলো বুঝে নিয়ে সেই চেতনায় ও বোধে নিজেকে সশস্ত্র করে সংগ্রাম জয়যুক্ত করার জন্যেই তো বই। তা না হলে বই হয়ে যাবে একধরনের উচ্চশ্রেণীর বিনোদন। সস্তা হিন্দি ছবি দেখার সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য থাকবে না। যারা পৃথিবীর পরিবর্তনের জন্য যুদ্ধরত তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঠক।

আগের শক্তিমান মানুষ আমার কাছাকাছি পরিস্থিতিতে কী সব প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছেন তা জেনে নিয়ে আমার বিজয় নিশ্চিত করার জন্যেই তো বইপড়া। আমার বাস্তব আর স্বপ্নের সঙ্গে নতুন মাত্রা যোগ করার জন্যেই তো বই। যাকে দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিক হতে হবে অথবা হতে হবে রাজনীতি-সমাজতত্ত্ব-ব্যবসা ব্যবস্থাপনার দিকনির্দেশক কিংবা সাধারণ শিক্ষক, আমলা বা চাকুরে—সবার জন্যেই এ একইরকম সত্য। পড়ার পরিমাণ যেন হয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। বেশিও নয়, কমও নয়। বেশি হলে তা হবে অতিরিক্ত। উৎকট কাশিতে তা সবার মাথা ধরাবে। আবার কম হলেও তা অভীষ্টকে পাবে না। বরং অনেক সময় তা নিজের ও অন্যের জন্যে ধ্বংসকারী ও বিপজ্জনক হবে।

হিটলার যতবড় উদ্দেশ্যের জন্যে জাতিকে ডাক দিয়েছিলেন, দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে-উদ্দেশ্য সফল করার যোগ্য পড়াশোনা তাঁর ছিল না। মানবসভ্যতার ইতিহাস তাঁর অজানা ছিল। তা যদি তিনি জানতেন তবে বুঝতেন ইতিহাসের এমন এক কালপর্বে আমরা বাস করছি যখন একটা দেশের মানচিত্রকে জয় করলেই সে-দেশকে জয় করা হয় না। অতীতযুগে যা ছিল না, এমনি একটা বিশাল অপরাজেয় শক্তির উত্থান ঘটেছে একালে, প্রতিটা আধুনিক দেশে; এই শক্তির নাম 'জনগণ'—যাকে পরাজিত করা কার্যত অসাধ্য। মানবসভ্যতার ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করা থাকলে তাঁর জানা থাকত, তাঁর থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে নেপোলিয়নও যে-জনগণকে পর্যুদস্ত করতে পারেননি, তাঁর পক্ষে একালে তা করা আরও অসম্ভব। উদ্দেশ্যের তুলনায় পর্যাপ্ত পড়াশোনার অভাব বহু শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকেও ব্যর্থতা দিয়েছে।

আমাদের ছেলেমেয়েদের ওপর স্কুল-কলেজের পাঠ্যবইয়ের চাপ খুবই বেশি বলে তাদের এজন্য যে-অকথ্য শ্রম দিতে হয় তার ফলে ভালো বই পড়ার মতো মনের

অবস্থা বা সময় তাদের থাকে না। পরিশ্রান্ত নিঃশেষিত আর ফ্যাকাশে-হয়ে-যাওয়া এইসব ছাত্রছাত্রীরা টেলিভিশন ভিসিআর-এর শস্তা চটুল বিনোদনের ভেতর অবসর সময়টাকে হালকা করে নিতে পারলে খুশি হয়। ফলে পরীক্ষায় ভালো করলেও চিন্তাচেতনার উচ্চতর আনন্দময় জগৎ তাদের কাছে থেকে যায় অজানা। কৈশোরে সে-জগতের খোঁজ না-পাওয়ায় সারাজীবনেও তারা আর তা পায় না। তাদের বেঁচে থাকতে হয় একটা আনন্দহীন ত্বকসর্বস্ব ও অমানবিক নিম্নস্তরের মধ্যে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আজ আর আলোকিত, চিন্তাশীল, উদার এবং দার্শনিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের জন্ম দিচ্ছে না। আমাদের অধিকাংশ অভিভাবকই ছেলেমেয়েদের বাইরের বই পড়তে দিতে নারাজ। তাদের ধারণা এতে তাদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়। সন্তানদের উজ্জ্বল পেশাগত ভবিষ্যতের যে-ছবি তাঁরা চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন এইসব অপাঠ্য বইপত্র পড়াশোনার ফলে সেই ভবিষ্যৎ ধ্বংসের আশঙ্কায় তাঁরা ছেলেমেয়েদের তার ধারেপাশে ভিড়তে দিতে নারাজ।

আমি বুঝতে পারি না, পড়ে কীভাবে পড়া নষ্ট হয়। একটা বই, তা যত সাধারণই হোক, তার মধ্যে এমনকিছু তো থাকবেই যা থেকে জীবনের উপকার হবেই। তাছাড়া এসব বই পড়তে পড়তেই তো মানুষ উচ্চতর বইয়ের জগতে হাজির হয়। এসবও তো বইপড়ারই সুফল। ওই অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলেবেলায় যদি দশটা ভালো বইও পড়ারও সুযোগ পেতেন, তাহলেও বুঝতে পারতেন এককেটা বই কীভাবে একটা জীবনকে ভেঙেচুরে নতুন করে তৈরি করে।

৪

কেন্দ্রটাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম দেশের ভেতরকার নিজস্ব সম্পদ দিয়ে। দেশের অসংখ্য মানুষের আর প্রতিষ্ঠানের উদ্যম, সাহায্য-সহযোগিতা আর অবদানকে সংগঠিত করে। স্বদেশ ও স্বজাতির বহু মানুষের শ্রমে কষ্টে অর্জিত বিত্তের রক্তবিন্দু দিয়ে। যেন নিখাদ জাতীয় উদ্যোগের সুউচ্চ মিনারের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এই কেন্দ্র, দেশের মানুষেরা এর দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলতে পারে এই প্রতিষ্ঠান বাঙালির তৈরি, বাংলাদেশ আর বাঙালি-রক্তের এ নিজস্ব অর্জন।

বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে এ প্রতিষ্ঠান অনেক সহজেই গড়ে তোলা যেত। এর চেয়ে একশোগুণ করে করা যেত একে। কিন্তু তা আমাদের জাতির সম্পদ হত না। আমাদের প্রেম আর রক্তের সম্পদ হত না।

এটুকুই অহমিকার জন্যে খাটতে খাটতে জীবনের উদ্যম সৃজনশীলতা আর মেধা হাজারো স্কুল প্রয়োজনের নিচে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেল।

১৬.৭.৯৮

৫

কেন্দ্রের ছেলেমেয়েদের জন্যে জুডো আর কারাতে শেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কয়েকটা গুণ্ডা ছুরি-হাতে 'কেন্দ্রে'র গেটে এসে দাঁড়াবে আর আমাদের দুর্ধর্ষ জ্ঞানতাপসের দল পেছনের দরোজা দিয়ে কোঁচা উঁচিয়ে দৌড় দেবে—এই লক্ষ্মণসেনী অসম্মানের দৃশ্য বারে বারে একটা জাতির পক্ষে অসহ্য।

গতকাল প্রথম অনুশীলনে ছেলেমেয়েদের সাথে আমিও ছিলাম। সবাই হাসল খুব। একজন বলল, এই বয়সে শিখে কী করবেন? কারো সাথে মারপিট করবেন নাকি?

আমি চুপ করে রইলাম। কী করে ওদের বোঝাই, মানুষের জীবন কোনোদিন শেষ হয় না।

৬

একজন অভিভাবক একবার কেন্দ্রে এসে জানালেন, তিনি তাঁর ছেলেকে কেন্দ্র-কর্মসূচিতে রাখতে চান না। তাঁর বক্তব্যে সেই গৎবাঁধা ধুয়াই : বই পড়ে 'পড়া' নষ্ট হচ্ছে।

বললাম, পড়ে পড়া নষ্ট? বাক্যটা তো ব্যাকরণগতভাবেও ভুল। পড়ে কি কখনো পড়া নষ্ট হয়! পড়া নষ্ট তো হতে পারে মাত্র একভাবেই—না-পড়ে।

টেলিভিশন দেখলে, গান শুনলে পড়া নষ্ট হয় না; প্রাইভেট পড়া, বন্ধুর চর্চা বা খুনসুটি করে বেড়ালেও দোষ নেই, পড়াশোনার নাম করে আড্ডা দিলে এমনকি প্রেম করলেও সব ঠিক থাকে; কেবল ক্ষতি হয় বই পড়লে—মানবসভ্যতার সবচেয়ে উজ্জ্বল সম্পদগুলোর স্পর্শে জীবনকে দীপ্ত করলে!

তাঁকে আরও বললাম : আপনি কি নিশ্চিত, কেবল কেন্দ্রে এসে পড়ে বলেই ওর ক্ষতি হচ্ছে—আর কোনো কারণ নেই। আপনি কি নিশ্চিত, এখানে আসা বন্ধ করলেই ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।

এতসব বলতে হল এজন্যে যে, ছেলেটি কেন্দ্রের মেধাবী ছেলেদের একজন। ওকে রক্ষার জন্যে খানিকটা বিতর্কের কষ্টই ঘাড়ে নিলাম।

আমার প্রশ্নে ভদ্রলোক হঠাৎ থমকে গেলেন। তখন আমি তাঁর কাছে এইসব 'অর্থহীন' বইপড়ার ভালো দিকটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

প্রথমে তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করে নিতে হল এসব বই জীবনের কী কী উপকার করে। বললাম, এক-একটা বই জীবনের এক-একটা নতুন অপরিচিত জানালা খুলে দেয়, এক-একটা নতুন জগতের ভেতর আমাদের বাস করায়। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সামনে নিত্যনতুন মাত্রা যোগ করে, জীবনকে বড় করে তোলে। আমরা [illegible]

ওপরকার খোলা অবারিত আকাশটায় গিয়ে দাঁড়াই।

ভদ্রলোক নড়েচড়ে বসতেই আমি তাঁর সামনে এসব বইপড়ার একটা লোভ-চকচকে দিকও তুলে ধরলাম। বললাম : ধরা যাক আপনার ছেলে পরীক্ষায় ভালো ফল করে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। ওদিকে ওর ক্লাসেরই আর-একটি ছেলেও হুবহু ওর সমান নম্বর পেয়ে ইঞ্জিনিয়ার হল। ধরুন বুদ্ধিতে, পরিশ্রমে, কর্মদক্ষতায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে দুজন সমস্ত দিক থেকে সমান। এমন সময় কোনো-একটা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান মাত্র একজন ইনজিনিয়ার চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিল—আর ওই দুজনই হল সেই চাকরির প্রার্থী। এখন ওই প্রতিষ্ঠান ওই দুজনের ভেতর থেকে কাকে নেবে?

প্রথমেই দেখা যাচ্ছে, ওই দুজন ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে সামান্য একটু পার্থক্য আছে। একজন কেবলই ইঞ্জিনিয়ার, তার শাস্ত্রের এই বিশেষ শাখাটিতে খুবই ভালো। কিন্তু তার সীমাবদ্ধতা একখানে। ওই একটিমাত্র শাস্ত্রের বাইরে পৃথিবীর অন্যসব রূপরসগন্ধস্পর্শ সম্বন্ধে সে অজ্ঞ। অন্যদিকে, অপরজন ইঞ্জিনিয়ার হলেও জীবনের শুরুতেই কেন্দ্রের মতো একটা জায়গায় ঘোরাফেরার ফলে নানান সূত্রে শ-দুয়েক বই পড়ে ফেলেছিল। ফলে সে আজ দু-দুশো সুন্দর উজ্জ্বল ও অর্থপূর্ণ জগতের স্বপ্নে ও আনন্দে প্রজ্বলিত, চিন্তাশীল বন্ধুদের সাহচর্যে সমৃদ্ধ একজন উন্নত দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ।

এখন বলুন, এদের দুজনের মধ্যে চাকরির নিয়োগপত্র কার শিকেয় ঝুলবে? শুধু ইঞ্জিনিয়ারের? নাকি সেই আলোকিত ইঞ্জিনিয়ারের, যে শুধুমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিংই করবে না, প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায় অর্থপূর্ণ অবদান রাখবে?

কথায় কথায় ডেল কার্নেগির একটা ভালো উদাহরণ মনে এল। সেটাও তাঁকে শুনিয়ে দিলাম। বললাম : ডেল কার্নেগি লিখেছিলেন—তোমরা কি কখনো দেখেছ, কোনো দেশের সেরা ইঞ্জিনিয়ার সেই দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং জগতের কর্ণধার হয়েছেন? না, কোথাও কোনোদিন দেখনি। দেখনি, কেননা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কর্ণধার হতে গেলে কেবল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিদ্যায় কুলোবে না—এর জন্যে লাগবে আর-এক ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং, তার নাম হিউম্যান (মানবিক) ইঞ্জিনিয়ারিং। এর মানে সুসম্পর্কের ভেতর দিয়ে মানুষকে পরিচালনা করা। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বইয়ে এই বিদ্যার কথা লেখা নেই।

কথা শেষ করে বললাম : বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনার ছেলে শুধুমাত্র একজন ইঞ্জিনিয়ার হবে। আর আমরা ওকে মানবিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিয়ে দিচ্ছি। এই দুইয়ে মিলে ও হয়ে উঠবে দেশের সেরা ইঞ্জিনিয়ার—দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং জগতের কর্ণধার—ওই অঙ্গনের দিকনির্দেশক। কোন্‌টা ওর জন্যে ভালো হবে, বলুন।

আমার কথার মধ্যে বৈষয়িকতার গন্ধ পেয়েই কী-না জানি না, ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চিন্তা করে ফিরে চলে গেলেন।

৭

১৯৭৬ সাল। টেলিভিশনে তখন ধাঁধার আসর করছি। মজার মজার রঙবেরঙের নিত্যনতুন ধাঁধা। দর্শকরা খুব খুশি। চিন্তা চলছে কী করে অনুষ্ঠানগুলোকে আরও জমকালো আরও মজাদার করা যায়। মাঝেমাঝেই জুড়ে দিচ্ছি নিত্যনতুন মজমট সব জিনিশ—কখনো গান, নাচ, কখনো নাটিকা, আবাড়ে গল্প, নানাজাতের কৌতুক। তখনো দেশের বাইরে যাইনি। বিদেশি টেলিভিশনের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের চরিত্র আমাদের অজানা।

আজ ভাবি, না-জেনে ভালোই হয়েছিল। আমরা বুঝিনি না-বুঝে আমরা এইসব নানারকম পাঁচমিশেলি জিনিশ জড়ো করে আসলে আমাদের নিজস্ব ধারার ম্যাগাজিন-অনুষ্ঠানের রূপটি তৈরির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের রূপরেখাই আসলে রচিত হয়ে চলছিল আমাদের অগোচরে।

একদিন ঠিক হল নানান আঙ্গিকে কিছু-না-কিছু হাস্যকৌতুক নিয়মিতভাবে জুড়ে দিতে হবে অনুষ্ঠানের ভেতর। জমে উঠবে অনুষ্ঠান। কাজেই চাই অনুষ্ঠানের জন্যে ভালো-ভালো মজাদার চুটকি। কিন্তু কোথায় চুটকি? এ-ধরনের কোনো বই তখনো বাংলাদেশে বেরোয়নি। ইংরেজি চুটকির বই খুঁজতে গিয়ে জুতোর সোল খুইয়ে ফেলা হল, কিন্তু বৃথা। টিভির সবাই আমার কর্মীবাহিনীকে তখন বলত 'আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অ্যান্ড স্টুডেন্টস'—মেধাবী উজ্জ্বল একগুচ্ছ বকবকে ছেলে। এরা সবাই ছিল আমার ছাত্র। সহকারী নয় অথচ অনুষ্ঠানের জন্যে খেটে মরছে এমন ছাত্রেরও আকাল ছিল না সে দলে। আসলে এরাই ছিল আমার অনুষ্ঠানের প্রাণভোমরা। এদের সমবেত শ্রম আর উদ্দীপনাতেই সে-সময় অনুষ্ঠানগুলো এতটা জনপ্রিয় আর প্রাণবন্ত হয়েছিল।

উপায়হীন হয়ে একদিন ছাত্রদের জানিয়ে দিলাম : যে যেখান থেকে পারো চুটকি জোগাড় করো। কেড়ে, ছিঁড়ে, হাতিয়ে যেভাবে হোক নিয়ে এসো। সেগুলো থেকে বাছাই যাচাই করে সবচেয়ে সরস আর টসটসেগুলোকে অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হবে।

আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত-অপরিচিত সবার কাছ থেকে ছেলেরা চুটকি-সংগ্রহে লেগে গেল। জোগাড়-করা চুটকিতে দেখতে-দেখতে একটা ছোটখাটো পাহাড় গড়ে উঠল।

চুটকিগুলো বাছাই করতে গিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম। দেখা

গেল হাস্যরসের তীব্রতার দিক থেকে চুটকিগুলো সুস্পষ্ট চারটা ভাগে পড়ে।

একজাতের চুটকি পাওয়া গেল, সংখ্যায় খুবই কম, কিন্তু এককথায় 'অনন্যসাধারণ'। আমরা পড়েই বুঝলাম টেলিভিশনে যখন সেগুলো পরিবেশন করা হবে তখন দর্শক এমন প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়বে যে তাদের পক্ষে সোফায় বসে থাকা সম্ভব হবে না, হাসির ধমকে সোজা মাটিতে আছড়ে পড়তে হবে। আমরা চুটকিগুলোর নাম দিলাম 'বাঘা'। বাঘের শক্তি ধরে, সেই অর্থে বাঘা।

আর-একধরনের চুটকি পাওয়া গেল, যেগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক আগের চুটকিগুলোর মতোই উদ্দাম হাসিতে ফেটে পড়বে, কিন্তু মাটিতে আছড়ে পড়বে না, সোফাতেই থেকে যাবে। এগুলোও উদ্দাম, কিন্তু আগেরগুলোর সমকক্ষ নয়। বাঘের সঙ্গে অন্ত্যমিল দিয়ে আগেরগুলোর নাম রেখেছিলাম বাঘা। এবার রাঘব বোয়ালের সঙ্গে মিল দিয়ে এগুলোর নাম রাখলাম 'রাঘা'।

আর-একধরনের চুটকি পাওয়া গেল, সংখ্যায় এরা অনেক কিন্তু হাসির দিক থেকে বেশি জুতসই নয়। শোনার পর ঠোঁটদুটো পলকের জন্যে দুপাশে সামান্য ছড়িয়ে যায় ঠিকই, চোখদুটোও হেসে ওঠে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। পরের মুহূর্তেই মুখের চেহারা যেই-কে-সেই। বাঘা বা রাঘার সঙ্গে এই চুটকি এক-আধটা জুড়ে দিলে অনুষ্ঠান কোনোমতে পার পেয়ে গেলেও যেতে পারে, কিন্তু বেশি হলে বিপজ্জনক, দর্শকদের খেপে-ওঠার সম্ভাবনা। মানের দিক থেকে নিচু, তাই এগুলোর নাম সেই অসহায় নিরপরাধ প্রাণীটির নামের সাথে মিল দিয়ে রাখা হল 'ছাগা'।

একধরনের চুটকি পাওয়া গেল, যেগুলো সংখ্যার দিক থেকে যেমন বেশুমার, হাসির দিক থেকেও তেমনি মরা, শুরুর আগেই হাসি শেষ হয়ে যায়। অনুষ্ঠানে এগুলোর ব্যবহার নেহাতই বিপজ্জনক! বেশি ব্যবহার করলে রাস্তাঘাটে দর্শকদের হাতে মার খাওয়ার সম্ভাবনা। এসব বিপদের কথা ভেবে শেষপর্যন্ত এগুলোর নাম দেয়া হল : 'যাগা'।

সব মিলে চুটকিগুলো দাঁড়াল চার জাতের : বাঘা, রাঘা, ছাগা আর যাগা। ব্যাপারটা নিয়ে তখন খুব হাসাহাসি করেছি। পুরো ব্যাপারটা এমনই যে, এই নামগুলোই আমাদের কাছে চুটকির মতো হয়ে উঠল একসময়।

সারাজীবন নানান মানুষের সঙ্গে মিশে, পর্যবেক্ষণ-পর্যালোচনা করে, আজ আমার ধারণা—ওই চুটকিগুলোরই মতো, প্লেটোর মানববিভাজনের মতো, হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার মতো—পৃথিবীর মানুষেরাও আসলে ওই চার জাতের।

কেন্দ্রে কাদের চাই আমরা? কেবল বাঘাদের? নাকি দরকার আছে অন্যদেরও? বাঘা, রাঘা, ছাগা, যাগাদেরও। আমার নিজের মনের কথা : 'শত ফুল ফুটুক'।

কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথোপকথন

১

এবারো কেন্দ্রের আমগাছটায় ঝোঁপে মুকুল এসেছে। সোনা-রঙের অপর্যাপ্ত সে সম্ভার—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রতি বছর একটা মাত্র সপ্তাহের জন্যেই এমন হয়। কেন্দ্রটাকে গন্ধে সৌন্দর্যে মদির করে রাখে।

আশ্চর্য, কেন্দ্রের একটা ছেলে বা মেয়েকেও আজ পর্যন্ত একটা কথা বলতে শুনলাম না এ নিয়ে। ভাবতে অবাক লাগে এই বিপুল অবিশ্বাস্য সম্ভার, রূপ গন্ধের এত অপর্যাপ্ত বিস্ফোরণ—একটা দিনের জন্যেও কারো চোখে পড়ল না! একটা হৃদয়ও পাগল হয়ে উঠল না! যদি হল তবে তার মত্ত চিৎকার কোথায়? পাগল তো চিৎকার করে!

১৯৯৭

২

কথায় আছে : ভিক্ষুকের পায়ে লক্ষ্মী। ভিক্ষা পেতে হলে হাঁটতে হয়। যে ভিক্ষুক যত বেশি হাঁটে তার ভিক্ষা ততবেশি।

পরিশ্রমের সামনে অপরাজেয় কিছু নেই।

দুর্গ যতই দুর্ভেদ্য হোক, আক্রমণ চালিয়ে যাও। তার পতন অনিবার্য। একবারে যদি না হয়, আবার আক্রমণ করো। আবার না হলে আবার। একদিন, দুদিন, তিনদিন। আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে যাও। রবার্ট ব্রুসের গল্প মনে রাখো।

কত শক্তি ধরে ওই দেয়াল? কত অভেদ্য? যত শক্ত পাথরই হোক, একদিন তার পতন ঘটবেই।

না, প্রতিভার কথা আমি বলছি না। শ্রম—কেবল শ্রম দিয়ে কতদূর যাওয়া যায় তার কথাই কেবল বলছি।

একটা উদাহরণ দিই। বেশিকিছু না, মাত্র বিঘা-দুই জমি কেনো। রবীন্দ্রনাথের উপেনের মতো 'শুধু বিঘে দুই' জমি। এবার জমিটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে ফেল। এবার একটা কোদাল আর একটা ঝাঁকা কিনে ফেল ঝটপট। এরপর প্রতিদিন—বেশি নয়—মাত্র ঘন্টাদুয়েক করে জমিটার একভাগ থেকে মাটি কেটে ঝাঁকায় তুলে আরেক ভাগে ফেলতে থাকো। মাটিকাটার ফলে গর্তে পানি-ওঠা শুরু করলে একটা পাম্প বসিয়ে পানি সেচে কাজ চালিয়ে যাও। গর্ত গভীর হলে চলমান সিঁড়ি লাগিয়ে নাও। অন্যপাশের ঢিবিটা বেশি উঁচু হলে তার চারপাশ দিয়ে রাস্তা কেটে ওপরে ওঠার পথ করো। এভাবে দিনে মাত্র ঘন্টাদুয়েক করে বছর-দশেক কাজ করো। দেখবে সারা পৃথিবী থেকে বড় বড় সাংবাদিকেরা তোমার সাক্ষাৎকার নেবার জন্যে ছোটাছুটি করছে। বলতে শুরু করেছে : দেখ এই সেই ব্যক্তি যে একক চেষ্টায় পৃথিবীর উচ্চতম পাহাড় আর গভীরতম গর্ত তৈরি করেছে। তোমার নাম 'গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এ স্থান পেয়ে যাবে।

অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম এমনই শক্তিশালী জিনিশ।

৩

ধর, কোনো দোকানে গিয়ে তুমি কিছু চাইলে—দোকানি তোমাকে জিনিশটা দিল। এখন তুমি দুটো কাজ করতে পারো। দোকানিকে জিনিশটার দাম চুকিয়ে দিতে পারো, অথবা (কৃপার হাত পেতে এবং দোকানির দয়া পেলে) জিনিশের দাম না-দিয়েও চলে আসতে পারো। যদি দাম দাও তবে তুমি ক্রেতা, যদি না-দাও তবে ভিখিরি।

কেন্দ্রে এসে একদিন তুমি সম্পন্ন-জীবন প্রার্থনা করেছিলে। কেন্দ্র তোমাকে তা উদার-হাতে সাধ্যমতো দিয়েছে। এবার তোমার দাম দেবার পালা। না, ভয় নেই, কেন্দ্রকে কিছুই দিতে হবে না তোমার। কেন্দ্র কোনোকিছুর দাম চায় না। দিতে পেরেই সে খুশি। কিন্তু দাম তো তোমাকে দিতেই হবে। ন্যায়ের স্বার্থে, মর্যাদার গরজেই দিতে হবে। না হলে তুমি-যে নিজের কাছেই নিজে ভিখিরি হয়ে যাচ্ছ। কিন্তু কাকে দেবে তুমি দাম? আগেই বলেছি, কেন্দ্রকে নয়, দিতে হবে অন্য জায়গায়, অন্যকে—তোমার চারপাশের মানুষকে, তোমার দেশকে, দুঃখী জাতিকে। কেন্দ্রের মধ্যে যেটুকু উৎকর্ষ ছিল—সেই উৎকর্ষ সে তোমাকে উজাড় করে দিয়েছে। আজ একইভাবে কেন্দ্র থেকে পাওয়া তোমার সে-উৎকর্ষ অন্যকে দিতে হবে। বিত্ত, বাণী যা-কিছু সেখান থেকে তুমি পেয়েছ, সেসব অনেকগুণ করে ফিরিয়ে দিতে হবে। তোমার চারপাশের পৃথিবীকে বৈভবময় আর সুন্দর করার জন্যেই তোমাকে দিতে হবে। না হলে তুমি-যে ভিখিরি থেকে গেলে—সেই মানুষটি, যে দোকান থেকে জিনিশ নিয়েছিল, কিন্তু দাম দেয়নি।

৪

বছর-কয়েক আগে কেন্দ্রের জন্যকয় ছেলেমেয়ে 'কিছু-একটা বিষয়ে' কথা বলতে এল। এদের কেউ কেউ স্কুলপর্যায় থেকে এখানে আছে। কারিরা এসেছে বছর-তিনেক আগে—একাদশ শ্রেণীর বইপড়া কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে। ব্যাপার কী জানতে চাইলে একজন বলল : 'অনেক দিন থেকে আমরা কেন্দ্রে আসি, নানাভাবে এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছি। আমরা এখানে পাকাপাকিভাবে থেকেই যেতে চাই।'

বললাম : 'স্কুলে যখন পড়তে তখন এর চেয়েও বেশিদিন সেখানে থেছে, এর চেয়েও বেশি জড়িয়ে ছিলে। কিন্তু সেখানে কি থাকতে পেরেছ? কয়েক বছর পর যখন সেখানে গেছ, তখন সেখানে তুমি প্রায় একজন অপরিচিত মানুষ।

এরপর পড়েছ কলেজে। সেখানেই কি চিরদিন থেকেছ? দু-বছর পরেই তো সব ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। পরে যখন সেখানে গেছ তখন তুমি সেখানে প্রায় সম্পূর্ণ অচেনা। কেউ তোমাকে চেনে না, শিক্ষকরাও না।

এখন পড়ছ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানেই কি চিরদিন থাকতে পারবে? পাস করার বছর-কয়েক পর সেখানে ফিরে গেলে দেখবে তুমি সেখানকার কেউ নও। প্রাক্তন ছাত্র বলে পরিচয় দিলে তারা হয়তো তোমাকে অভিনন্দিত করবে কিন্তু তারপরেই তুমি হয়ে যাবে অতিরিক্ত, অসহ্য, বিরক্তিকর।

এতবেশি জিনিশকে জায়গা দেবার স্থান পৃথিবীর নেই। চলার প্রয়োজনে এখানে অতিরিক্তকে কেবলি ঝেড়ে ফেলে নিজেকে হালকা করতে হয়। কোনোখানেই তো চিরদিন থাকা যায় না। কেন্দ্রের ভেতর কেন থাকতে চাচ্ছ? কেন্দ্র তো একটা বহতা নদী। এখানে আসা আছে, যাওয়াও আছে, থেকে-যাওয়া নেই।

৫

বছরকয়েক আগে জনকয়েক উদ্দীপ্ত মেয়ে আসত কেন্দ্রে। দেখলে মনে হত একেকটা মূর্তিমান বিপ্লব। ছোবল-উদ্যত-করা গোটাকয় সাপ যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন্দ্রের আঙিনায়।

গল্পে-গল্পে বিনীতভাবে একদিন জানালাম : বিপ্লব তো তোমরা চাইবেই, হবেই তো মৃত্যুলোভী। কেবল হবে নয়, হতে বাধাই এককথায়। তোমাদের যে-বয়স, বিপ্লব আর মৃত্যুই তো সে-বয়সের মঞ্জরিত রক্তকরবী। জীবনে সর্বোচ্চ গৌরব স্পর্শের জন্যে এ-বয়সেই তো মানুষ তোপের মুখে জীবনকে অবলীলায় উড়িয়ে দেয়। জীবনের মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্যে যে-কোনো উছিলায় কেবল মৃত্যুকে খুঁজতে থাকে। এবার শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর দাও আমাকে। তোমরা মরতে চাচ্ছ, ভালো কথা। কিন্তু তোমাদের যারা নেতা, বয়স যাদের চল্লিশের ওপর, জীবনে

সুপ্রতিষ্ঠিত—তারা কি তোমাদের মতো একইভাবে মরতে চায়?

হঠাৎ ঘা খেয়ে যেন মেয়েগুলো থেমে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। তাদের চোখে আমি কোনো আশাব্যঞ্জক আলো দেখলাম না।

বললাম : তা যদি না হয় তবে জেনো 'বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা' সব মিথ্যা। বিপ্লব সেই আদিম দেবতা, যার রক্তপিপাসু জিহ্বা বড়মানুষের রক্তের জন্যে উদ্গ্রীব। কেবল জড়ের রক্তে, তুচ্ছের আত্মোৎসর্গে তার রুচি নেই।

৬

একজন মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে কথোপকথন :

—স্যার, চেষ্টা করলে আমি কি বড়কিছু করতে পারব?

—সেটা নির্ভর করবে জীবনের প্রাথমিক পর্বে তুমি কতটা ব্যর্থ হবে তার ওপর।

—কী করে?

—যে-মানুষ পাহাড়ের ওপর থেকে নিচের সমুদ্রে পড়ে গেছে, সেই তো আবার সেই পাহাড়ে ওঠার উদগ্রতায় একসময় আকাশকে ধরতে চাইবে। ফলে সে চলে যাবে পাহাড়ের ওপরে পাহাড়ে। যে পা হড়কায়নি, এই এষণা তার কোথা থেকে আসবে?

৭

১৯৬০ সালের একটি কথোপকথনের স্মৃতি :

প্রশ্ন : তোমরা যে 'আদর্শ আদর্শ' করো—আদর্শের কোনো 'দাম' আছে আজকাল?

উত্তর : কী করে আপনি জানলেন আমরা দামের জন্য আদর্শ করি? তাহলে তো যতক্ষণ দাম থাকবে ততক্ষণই আদর্শ, দাম ফুরোলেই 'ফুস'।

প্রশ্ন : তাহলে কেন আদর্শ?

উত্তর : আদর্শকে ভালোবাসি বলে! রক্তের মধ্যে এর চিৎকার নিদ্রাহীন অনুভব করি বলে! এ ছাড়া বাঁচি না বলে!!

৮

স্কুল-কলেজের ছাত্র হিশেবে পরীক্ষা পাসের জন্যে যেসব বই আমাদের পড়তে হয় ইংরেজিতে তাকে বলে টেক্সটবুক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এগুলোর নাম দিয়েছিলেন

শিক্ষাপুস্তক। আর যেসব বই পড়লে চেতনালোকের জানালা খোলে, আমরা আলোকিত পৃথিবীর নাগরিক হই, সেগুলোর নাম দিয়েছিলেন পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্য—মানে যা পড়তেই হবে—পড়লে বড় হওয়া যাবে—সেই পুস্তক। স্কুল-কলেজের শিক্ষা এ-যুগে বেশ লাভজনক হয়ে ওঠায় এখন টেক্সট বইয়ের দেমাগ গেছে বেড়ে। শব্দটার বাংলা করার সময় তাই রবীন্দ্রনাথের চেয়েও একপা এগিয়ে গিয়েছি আমরা। শ্রদ্ধা দেখিয়ে আমরা টেক্সট বইয়ের নাম রেখেছি পাঠ্যপুস্তক। কাজেই রবীন্দ্রনাথের সেই পাঠ্যপুস্তক এক পা হটে গিয়ে আমাদের জীবনে এখন হয়ে পড়েছে পুরোপুরি 'অপাঠ্য'।

৯

ধর্মনেতা কবির লিখেছিলেন : যা ক্ষতিকর, যেমন মদ্যপান, তার জন্য আমরা শুঁড়িখানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ি; কিন্তু যা উপকারী, যেমন দুধ, তাকে ঘাড়ে বয়ে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছাতে হয়। আমরা দিতে চাচ্ছি সেই উপকারী জিনিশ—তাই আমাদের এত কষ্ট।

১০

নিজের বেদনায় যে জাগে সে ভালোমানুষ; যে পরিপার্শ্বের বেদনায় জাগে সে আলোকিত মানুষ।

১১

স্বাক্ষর-শিকার আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে মহামারীর চেহারা নিয়েছে। সামনে পড়লে রক্ষা নেই। স্কুল-কলেজে একবার ঢুকলে প্রাণ নিয়ে বেরোনো দায়। আমাদের ছেলেবেলায় পরিচিত মানুষদের জীবন দুর্বিষহ করার এই মধুর অত্যাচারটা আমাদের অজানা ছিল।

স্কুল-কলেজের এইসব খুদে স্বাক্ষর-শিকারিদের সামনে পড়ে গেলে সবার খাতায় আজকাল একটা কথাই কেবল লিখি। লিখি : 'মানুষ তার আশার সমান বড়।'

রক্তের ভেতরে কেন যেন একথাটা আমি কুসংস্কারের মতোই বিশ্বাস করে ফেলেছি : মানুষ নিজেকে যা ভাবতে পারে, সে তা-ই হয়ে যায়!

১৯৮৫

১২

কেন্দ্রের চৌহদ্দিতে পরনিন্দা ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা উচিত। কেন পরনিন্দা! হাজার হাজার মুখ থেকে ক্লান্তিহীনভাবে উচ্চারিত নির্মম, অশ্লীল, মহত্ত্ব-বিনাশী কোটি কোটি বরাহ-নিনাদের এই হীন মহোৎসব?

কেন পরনিন্দা? কিসের জন্য? আমাদের ব্যক্তিগত অক্ষমতার কারণে? এ কি ঈর্ষা? অসাফল্য? শক্তিহীনতা? অন্যের সাফল্য সহ্য করতে পারার স্নায়বিক অক্ষমতা? ব্যক্তিগত ব্যর্থতার বিকাশ-বিনাশী সহিংস প্রত্যাঘাত?

আমাদের প্রত্যেকের পঙ্গু সৃজনপ্রতিভা সাফল্যের আকাশে মুক্তি পেলে আমরা এর বিস্তারের হাত থেকে মুক্তি পেতাম।

কেন্দ্রের ছেলেমেয়েদের কয়েকদিন ধরে ডেকে-ডেকে আমি শুধু বলেছি : বন্ধ করো পরনিন্দার এই হীন আত্মঘাতী মহোৎসব—মানবপ্রতিভার এই বেদনাময় অপচয়—হাজার হাজার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত চরিত্র-হননের এই ক্লেদাক্ত দেশব্যাপী আয়োজন।

সবাই যদি 'খারাপ', তবে 'ভালো' তোমাকে দিয়ে শুরু হোক-না!

১৩

উনিশশো আশি সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। কেন্দ্রের পিকনিকে ছেলেদের সঙ্গে সাইকেল-ভ্রমণের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। একটানা দু-সপ্তাহের সাইকেল-ভ্রমণের প্রস্তাব কানে যেতেই কাছাকাছি একজনের কান খাড়া হয়ে উঠল। ছেলেটা স্বাস্থ্যবান, কিন্তু তার সাহস দুঃখজনকভাবে স্বাস্থ্যবিরোধী। ভ্রমণের সম্ভাব্য ফুর্তিতে সবাই হইচই তুলতেই ভয়-পাওয়া গলায় সে বলে উঠল : 'স্যার এতগুলো দিন একটানা সাইকেল চালাবেন, কষ্ট হবে না?' সবাই হল্লা করে উঠল, 'আরে কষ্টেই তো আনন্দ! ওর জন্যই তো যাওয়া! কষ্ট না হলে এ্যাডভেঞ্চার কিসের?' এবার তার জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় পর্ব :

'কিন্তু ধরুন স্যার, সারাটা দিন সাইকেলই নাহয় চালালেন, কিন্তু সন্ধ্যার সময় থাকবেন কোথায়?'

'কেন, একটা ইশকুল-টিশকুল দেখে উঠে পড়ব। নিদেনপক্ষে এলাকার চেয়ারম্যান-মেম্বার কারো বাড়ি-টাড়িতে...।'

'কিন্তু স্যার, সারারাত সেখানে কত রকমের পোকা...আ...মাক... অ...ড়...।'

ধৈর্য রাখতে পারলাম না। বলে উঠলাম : শাবাশ, আজ থেকে তোমার নাম দেয়া যাক 'পোকা...আ...মাক...অ..ড়...।' কেমন খুশি তো?

ছেলেমেয়েরা হল্লা করে সমর্থন জানাল।

এরপর থেকে ছেলেমেয়েরা 'পোকামাকড়' বলে ওকে দিনরাত এমনি উত্ত্যক্ত করতে লাগল যে বেচারি দিনকয়েকের মধ্যেই কেন্দ্র থেকে বিদায় নিল।

এমনি 'পোকামাকড়' আমাদের চারপাশে শতকে-হাজারে নয়, লাখে-কোটিতে।

এই ফাঁকে আরেকটা 'পোকামাকড়ে'র গল্প মনে পড়ছে। ছেলেটা একসময় ঢাকা কলেজে আমার ছাত্র ছিল, হঠাৎ একদিন কেন্দ্রে এসে উপস্থিত।

কিছুক্ষণ কথা বলার পর হঠাৎ নিচু হয়ে খপ করে পা চেপে ধরল।

—স্যার, আপনাকে 'গুরু' ডাকতে চাই।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কী-একটা অনুষ্ঠান নিয়ে আমরা তখন যাচ্ছেতাই ব্যস্ত। হাতে কয়েকশো নিমন্ত্রণপত্র, দিনদুয়েকের মধ্যে নিমন্ত্রিতদের হাতে পৌঁছোতে হবে।

বললাম, 'গুরুগিরির ব্যবসা এখনো ধরিনি, তবে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে গিয়ে এই ছ-সাতটা চিঠি যদি ঠিকঠিক লোকের হাতে দিয়ে আসতে পারো তো আবেদন বিবেচনা করে দেখতে পারি।' আমার প্রস্তাব শুনতেই শিষ্যের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন কোথায় স্যার?' বিহ্বল কণ্ঠস্বরে সুগভীর ভীতি।

'কেন, পুরোনো ঢাকায়!'

'পুরোনো ঢাকায় কী করে যেতে হয় স্যার!'

জায়গাটার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিতে চেষ্টা করলাম।

'কিন্তু আমি তো কখনো যাইনি স্যার।'

'যাওনি তবে তো আরও ভালো। এই উছিলায় যাওয়া হবে, চেনা হবে।'

'আমি বোধহয় যেতে পারব না স্যার!' কণ্ঠস্বরে করুণ অসহায়তা।

আর সহ্য করা যায় না। শিষ্যের পরিণতির চেয়ে নিজের গুরুগিরির করুণ ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্নে।

আমাদের অধিকাংশ মানুষ-যে আজ প্রায় কিছুই করতে পারছে না সেটা ততখানি আশঙ্কার ব্যাপার নয়। আসল আশঙ্কা, তারা-যে কিছু করতে পারবে এ-কথাটুকুও বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না। এই সীমাহীন অক্ষমতার আশ্রয় হিসেবে সারা পৃথিবীতে তারা গুরু খোঁজে।

যারা গুরুর সঙ্গে তার পায়ের ধুলো খুঁজে বেড়ায় আমি তাদের বলি, এভাবে ঠ্যাং টানাটানি বন্ধ করো তো বাপু! মাথা উঁচু করে সম্মান দেখাও, তোমাদের নিচু হওয়া মাথার সঙ্গে জাতির ভাগ্যও আজ মাটিতে সেঁটে যাচ্ছে।

দিনকয় আগে কেন্দ্রের একটা মেয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মেয়েটা একাদশ শ্রেণীর, কেন্দ্রে ওদের 'প্লেটোর সংলাপ' বইটা পড়তে হয়। কথায় কথায় সক্রেটিসের প্রসঙ্গ উঠতেই সে সক্রেটিসের অনমনীয় নৈতিক শক্তির প্রশংসায় প্রায়

ঝলমলিয়ে উঠল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'সক্রেটিসের মতো ওভাবে অন্যায়ের সামনে দাঁড়াতে পারবে?'

প্রশ্ন শুনেই বঙ্গললনার চোখ শাদা হয়ে গেল। ভীতিবিহ্বল স্বরে বলল, 'আমি কী করে পারব স্যার!' গলার স্বরে সারা পৃথিবীর অসহায়তা।

বললাম, 'কেউ কি গরম লাল শিক দিয়ে তোমার কপালে বড় বড় করে লিখে দিয়েছে : 'তুমি পারবে না'?"

হায়, কেন সে কিছুতেই পারার কথা ভাবতে পারছে না! আমরা যা ভাবি আমরা তো তাই হয়ে যাই।

আর হে অবিশ্বাসী মেয়ে, কী করে তুমি জানলে তুমি বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি নও! আজ না হোক, পাঁচহাজার দশহাজার বছর পরে মানুষের পৃথিবী তোমাকে যে ওই নামে ডাকবে না, কে তোমাকে তা বলেছে?

১৯৯৩

১৪

কেন্দ্রে একটা ছোট-টগরের গাছ আছে। গাছটা বুড়ো। তবু ফুল-ফোটানোর একটা বিরতিহীন উৎসব গাছটার সারাগায়ে। বছরজুড়ে হাজার হাজার অপরূপ শাদা ফুলে ছেয়ে থাকে গাছটা। কয়েকজন ছেলেমেয়েকে সেদিন বললাম—বুড়ো গাছটাকে দেখেছ, কেমন অজস্র ফুল দেয়? ঠিক আমার মতো, না?

শুনে ওরা বারবার তাকাচ্ছিল আমার দিকে।

কী দেখছিল ওরা? একটা প্রৌঢ় মুখ পরিতৃপ্তিতে কেমন দেখায়?

১৯৮৫

কেন্দ্রের সংগঠক

১

একটা বড় শহর দেখতে পেলাম আর সেখানে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একটা জমজমাট শাখা খুলে বসলাম, আমরা এমনটা করি না। কেবল শাখা নয়, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই ব্যক্তিনির্ভর। আমরা জানি ব্যক্তি যদি যোগ্য হয়, বড় হয়, তবে তার কাছ থেকে বড়কিছু আমরা পাবই। না হলে ঠিক উল্টোটা।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র জাতির জন্যও তো এই উৎকৃষ্ট মানুষই গড়ে তুলতে চাচ্ছে; যাতে একদিন তাদের মিলিত অবদানে একটা সমৃদ্ধ জাতিকে আমরা পেতে পারি। মানুষ ছোট আর জাতি বড় এটা কখনো হয়?

শাখা খোলার সময় আমরা দেখি না কোথায় আমরা শাখা খুলছি। বিভাগীয় শহরে, জেলা শহরে, থানায় না গ্রামে। দেখি কে খুলছে। সে মানুষটির গুণগত সমৃদ্ধি কী? আমরা জানি সে-মানুষ নিজে যদি উৎকর্ষবান হন তবে আমাদের শাখা নিরাপদ। তাঁর সম্পন্নতাই শাখাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

কোনো শাখা খোলার সময় আমরা দেখি যেখানে শাখা খুলছি সেখানে এমন একজন মানুষকে খুঁজে বের করা গেল কি-না যার মধ্যে [illegible] বক্তিমান—এমন মানুষ যিনি ডাক দিতে পারেন, হৃদয়কে জাগ্রত করতে পারেন। বেলালের মতো আর্ত উদ্বুদ্ধ আহ্বানকারীর কণ্ঠ আছে কী-না তাঁর মধ্যে। সব মানুষের মধ্যে আহ্বান থাকে না, কারো কারো মধ্যে থাকে। সবাই হৃদয়কে জাগাতে পারেন না, কেউ কেউ পারেন। আমাদের সেই হৃদয়জাগানিয়াদের দরকার। না হলে আমাদের উত্তরপুরুষদের হৃদয় পাথর হয়ে যাবে।

কী গুণ থাকতে হবে আমাদের একজন সংগঠকের? কী কী ন্যূনতম যোগ্যতা? হাঁ, সৎ তাঁকে হতেই হবে। একটা শহরের শত শত বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেমেয়ে বছরের পর বছর যাঁকে ঘিরে উন্নতজীবনের খোঁজ করবে, যার কাছে প্রত্যাশা করবে সম্পন্নতা ও বৈভব, তাঁর ভেতর যদি সততার অভাব থাকে তবে তাঁর চলনে

ঝলমলিয়ে উঠল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'সক্রেটিসের মতো ওভাবে অন্যায়ের সামনে দাঁড়াতে পারবে?'

প্রশ্ন শুনেই বঙ্গললনার চোখ শাদা হয়ে গেল। ভীতিবিহ্বল স্বরে বলল, 'আমি কী করে পারব স্যার!' গলার স্বরে সারা পৃথিবীর অসহায়তা।

বললাম, 'কেউ কি গরম লাল শিক দিয়ে তোমার কপালে বড় বড় করে লিখে দিয়েছে : "তুমি পারবে না"?'

হায়, কেন সে কিছুতেই পারার কথা ভাবতে পারছে না! আমরা যা ভাবি আমরা তো তাই হয়ে যাই।

আর হে অবিশ্বাসী মেয়ে, কী করে তুমি জানলে তুমি বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি নও! আজ না হোক, পাঁচহাজার দশহাজার বছর পরে মানুষের পৃথিবী তোমাকে যে ওই নামে ডাকবে না, কে তোমাকে তা বলেছে?

১৯৯০

১৪

কেন্দ্রে একটা ছোট-টগরের গাছ আছে। গাছটা বুড়ো। তবু ফুল-ফোটানোর একটা বিরতিহীন উৎসব গাছটার সারাগায়ে। বছরজুড়ে হাজার হাজার অপরূপ শাদা ফুলে ছেয়ে থাকে গাছটা। কয়েকজন ছেলেমেয়েকে সেদিন বললাম—বুড়ো গাছটাকে দেখেছ, কেমন অজস্র ফুল দেয়? ঠিক আমার মতো, না?

শুনে ওরা বারবার তাকাচ্ছিল আমার দিকে।

কী দেখছিল ওরা? একটা প্রৌঢ় মুখ পরিতৃপ্তিতে কেমন দেখায়?

১৯৮৫

কেন্দ্রের সংগঠক

১

একটা বড় শহর দেখতে পেলাম আর সেখানে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একটা জমজমাট শাখা খুলে বসলাম, আমরা এমনটা করি না। কেবল শাখা নয়, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই ব্যক্তিনির্ভর। আমরা জানি ব্যক্তি যদি যোগ্য হয়, বড় হয়, তবে তার কাছ থেকে বড়কিছু আমরা পাবই। না হলে ঠিক উল্টোটা।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র জাতির জন্যও তো এই উচ্চায়ত মানুষই গড়ে তুলতে চাচ্ছে; যাতে একদিন তাদের মিলিত অবদানে একটা সমৃদ্ধ জাতিকে আমরা পেতে পারি। মানুষ ছোট আর জাতি বড় এটা কখনো হয়?

শাখা খোলার সময় আমরা দেখি না কোথায় আমরা শাখা খুলছি। বিভাগীয় শহরে, জেলা শহরে, থানায় না গ্রামে। দেখি কে খুলছে। সে মানুষটার গুণগত সমৃদ্ধি কী? আমরা জানি সে-মানুষ নিজে যদি উৎকর্ষবান হন তবে আমাদের শাখা নিরাপদ। তাঁর সম্পন্নতাই শাখাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

কোনো শাখা খোলার সময় আমরা দেখি যেখানে শাখা খুলছি সেখানে এমন একজন মানুষকে খুঁজে বের করা গেল কি-না যার মধ্যে স্বর্গীয় অগ্নিশিখা বহ্নিমান—এমন মানুষ যিনি ডাক দিতে পারেন, হৃদয়কে জাগ্রত করতে পারেন। বেলালের মতো আর্ত উদ্বুদ্ধ আহ্বানকারীর কণ্ঠ আছে কী-না তাঁর মধ্যে। সব মানুষের মধ্যে আহ্বান থাকে না, কারো কারো মধ্যে থাকে। সবাই হৃদয়কে জাগাতে পারেন না, কেউ কেউ পারেন। আমাদের সেই হৃদয়জাগানিয়াদের দরকার। না হলে আমাদের উত্তরপুরুষদের হৃদয় পাথর হয়ে যাবে।

কী গুণ থাকতে হবে আমাদের একজন সংগঠকের? কী কী ন্যূনতম যোগ্যতা? হ্যাঁ, সৎ তাঁকে হতেই হবে। একটা শহরের শত শত বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেমেয়ে বছরের পর বছর যাঁকে ঘিরে উন্নতজীবনের খোঁজ করবে, যার কাছে প্রত্যাশা করবে সম্পন্নতা ও বৈভব, তাঁর ভেতর যদি সততার অভাব থাকে তবে তাঁর চারপাশে

চেতনার বিকাশে তা প্রযোজ্য নয়। এখানে উষ্ণ বুকের সরাসরি ওম দরকার। মুরগির ডিম-ফোটানোর দিকে তাকালেও একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয় : যে-ডিমগুলো মায়ের বুকের সান্নিধ্যের উত্তাপ সরাসরি পায় সেগুলো ফোটে পুরোপুরি, বাচ্চারা হয় সুপুষ্ট। যেগুলো ওম থেকে দূরে থাকে, মায়ের পাখার নিচে থাকলেও তারা ঠিকমতো ফোটে না। অনেক সময়ে নষ্টই হয়ে যায়। তাই এখন ইনকিউবেটরের আদলে আর শাখা নয়। এখন আমরা সংগঠকদের আর তাঁদের সহযাত্রীদের বুকের উত্তাপের ছোট্ট পরিসরটুকুর এক-একটি শাখা চাই, সেখানে এক-একটি ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় গড়ে উঠবে উষ্ণ ছোট্ট একটি দল—একশো কি সোয়াশো জন তরুণ-তরুণীর এক-একটি সম্পন্ন ছোট্ট পরিবার।

ডাহুকীর মতো বুকের রক্ত দিয়ে একজন সংগঠক লালন করবেন তাঁর শাখাকে। বছরের পর বছরের চেষ্টা, যত্ন আর সাধনায় নিজের চারপাশে গড়ে তুলবেন তাঁর সুযোগ্য পরীক্ষিত উত্তরাধিকারীদের দল। তারপর বিদায়ের দিনে তিল তিল করে গড়ে-তোলা তাঁর কেন্দ্রের দায়িত্ব দিয়ে যাবেন কেবলমাত্র একজনের হাতে, যোগ্যতমের হাতে—সকলের হাতে নয়। এইভাবে চলতে থাকবে এর যাত্রা।

১৯৯৪

২

আমাদের সংগঠকেরা দায়িত্ব নেবার সময় প্রায় কেউই বুঝতে পারেন না, কী বিপজ্জনক গর্তে তাঁরা পা দিচ্ছেন।

কেউ সংগঠক হতে আসেন জাতির ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠায়, কেউ সাংস্কৃতিক উৎসাহে, কেউ কেবলই আনন্দের খোঁজে।

তাঁরা সংগঠকের দায়িত্ব নেন ঠিকই কিন্তু হৃদয়ের ভেতর তখনো তাঁরা সংগঠক নন। কেন্দ্রের আর-দশজন ভেদাভেদহীন কর্মী কেবল।

এরপরে স্বাভাবিক নিয়মেই এসে যায় তাঁদের উপনয়নের দিন। তাঁদের ব্যাপটাইজড হবার, দ্বিজত্ব প্রাপ্তির চরম মুহূর্ত।

হঠাৎ করেই অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন তাঁরা দেখেন, তাঁদের পরিপার্শ্বের সবচেয়ে মেধাবী আর উজ্জ্বল ছেলেমেয়েরা, জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভবিষ্যতেরা, তাঁদের কাছে প্রার্থনা করছে পথনির্দেশ—উচ্চতর স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা। উচ্ছৃঙ্খল বেকেটের মতোই ঘটে তাঁদের হৃদয়ের উত্তরণ। বদলে যান তাঁরা। দীক্ষিত হন জাতির সম্ভাবনাবান এই সন্তানদের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের পৌরোহিত্যে।

সেদিন থেকে তাঁরা হন কেন্দ্রের সত্যিকার সংগঠক। কেন্দ্রের স্বপ্নের সঙ্গে একাত্ম। আমাদের দীক্ষিত সহোদর। জাতির অর্থময় উত্তরণের সংশপ্তক যোদ্ধা ও সংগ্রামী।

৩

কেন্দ্রের কর্মীদের রসিকতা করে বলি : শাখা থেকে কোনো সংগঠক এলে তাঁকে যত্ন করবে দু-ভাবে—শ্রদ্ধা করবে শ্বশুরের মতো আর আদর করবে জামাইয়ের মতো।

শুনে কর্মীরা মুখ টিপে হাসে।

কিন্তু এই সামান্য আদরটুকু ছাড়া তাঁরা কী-ই বা চান আমাদের কাছে—তাঁদের নিঃস্বার্থ ত্যাগের প্রত্যুত্তরে।

আর আমাদের শূন্য ভাঁড়ার থেকে এর চেয়ে বেশি তাঁদের কী দেয়াই বা সম্ভব।

১৯৯৬

৪

কোনো অর্থ নেই, সম্মানী নেই, পারিতোষিক নেই;—বেতন, প্রাপ্তি, কীর্তি অন্য কিছুই না—তবু বছরের পর বছর কেন্দ্রের শাখাগুলোয় এযাবৎ প্রাণপাত করে গেছে প্রায় সাত-আট হাজার কর্মী—'একদিন আলোকিত বাংলাদেশ গড়বে' কেবল এই অলীক স্বপ্নের পেছনে। পুরো 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর' মতো ব্যাপার আর কী।

তবু এইটুকু করার জন্যও মানুষের হাতে তাদের দুর্গতির শেষ নেই। এই দেশে বিনা স্বার্থে কেউ কিছু করে নাকি? এতসব কাজ, ছোটাছুটি, খাটাখাটনি সব এমনি-এমনি? কিছুই পায় না?

মাঝে মাঝেই অনেকে গায়ে পড়ে আমাদের তরুণকর্মীদের জিগ্যেস করে : 'আচ্ছা, এত যে তোমরা দৌড়াদৌড়ি করো, এর জন্য পাওটা কী?' কোনোকিছু না-পেয়েও যে মানুষ কাজ করতে পারে এটা কিছুতেই তাদের বুদ্ধিতে আসে না। উত্তরে আমাদের তরুণকর্মীরা যখন বলে তারা কিছু পায় না, তখন তারা বলে : বিদেশি অর্থপুষ্ট বেসরকারি সংস্থাগুলো ভাবনাটাকে প্রায় ভুলিয়েই দিয়েছে জাতির মাথা থেকে। 'এ্যাহ্ বললেও বটে একটা কথা! দিনরাত এত কাজ করো, আর কিছু পাও না। পাও, পাও। আসলে বলতে চাও না।' পঁচিশ বছর ধরে একই কথা শুনতে শুনতে সবার কান ঝালাপালা। এসব প্রশ্নের সামনে আমাদের কর্মীরাও অসহায় হয়ে যায়। সত্যি তো, কোনোকিছু পায় না, অযথাই খেটে বেড়ায়, কেমন ধারার কথা এ? কিছুতেই তাদের বোঝাতে পারে না তারা। প্রশ্নকারীদের ঠোঁটের কোণায় অবিশ্বাসের হাসি আগের মতোই চিকচিক করে।

কিছুদিন আগে সীতাকুণ্ডে আমাদের এক ঠাঁটা কর্মী এদের প্রশ্নের একটা মোক্ষম উত্তর বের করেছে। একদিন যেই অমনি এক অবিশ্বাসী তাকে প্রশ্ন করেছে, 'আচ্ছা এই যে দিনরাত খেটে মরো এর জন্য পাও কত বলো তো?'

কর্মী হেসে জবাব দিয়েছে, 'কিছু তো পাই-ই। না হলে কি এত কাজ করা যায়?'

চেতনার বিকাশে তা প্রযোজ্য নয়। এখানে উষ্ণ বুকের সরাসরি ওম দরকার। মুরগির ডিম-ফোটানোর দিকে তাকালেও একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয় : যে-ডিমগুলো মায়ের বুকের সান্নিধ্যের উত্তাপ সরাসরি পায় সেগুলো ফোটে পুরোপুরি, বাচ্চারা হয় সুপুষ্ট। যেগুলো ওম থেকে দূরে থাকে, মায়ের পাখার নিচে থাকলেও তারা ঠিকমতো ফোটে না। অনেক সময়ে নষ্টই হয়ে যায়। তাই এখন ইনকিউবেটরের আদলে আর শাখা নয়। এখন আমরা সংগঠকদের আর তাঁদের সহযাত্রীদের বুকের উত্তাপের ছোট্ট পরিসরটুকুর এক-একটি শাখা চাই, সেখানে এক-একটি ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় গড়ে উঠবে উষ্ণ ছোট্ট একটি দল—একশো কি সোয়াশো জন তরুণ-তরুণীর এক-একটি সম্পন্ন ছোট্ট পরিবার।

ডাহুকীর মতো বুকের রক্ত দিয়ে একজন সংগঠক লালন করবেন তাঁর শাখাকে। বছরের পর বছরের চেষ্টা, যত্ন আর সাধনায় নিজের চারপাশে গড়ে তুলবেন তাঁর সুযোগ্য পরীক্ষিত উত্তরাধিকারীদের দল। তারপর বিদায়ের দিনে তিল তিল করে গড়ে-তোলা তাঁর কেন্দ্রের দায়িত্ব দিয়ে যাবেন কেবলমাত্র একজনের হাতে, যোগ্যতমের হাতে—সকলের হাতে নয়। এইভাবে চলতে থাকবে এর যাত্রা।

১৯৯৪

২

আমাদের সংগঠকেরা দায়িত্ব নেবার সময় প্রায় কেউই বুঝতে পারেন না, কী বিপজ্জনক গর্তে তাঁরা পা দিচ্ছেন।

কেউ সংগঠক হতে আসেন জাতির ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠায়, কেউ সাংস্কৃতিক উৎসাহে, কেউ কেবলই আনন্দের খোঁজে।

তাঁরা সংগঠকের দায়িত্ব নেন ঠিকই কিন্তু হৃদয়ের ভেতর তখনো তাঁরা সংগঠক নন। কেন্দ্রের আর-দশজন ভেদাভেদহীন কর্মী কেবল।

এরপরে স্বাভাবিক নিয়মেই এসে যায় তাঁদের উপনয়নের দিন। তাঁদের ব্যাপটাইজড হবার, দ্বিজত্ব প্রাপ্তির চরম মুহূর্ত।

হঠাৎ করেই অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন তাঁরা দেখেন, তাঁদের পরিপার্শ্বের সবচেয়ে মেধাবী আর উজ্জ্বল ছেলেমেয়েরা, জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভবিষ্যতেরা, তাঁদের কাছে প্রার্থনা করছে পথনির্দেশ—উচ্চতর স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা। উজ্জ্বল বেকেটের মতোই ঘটে তাঁদের হৃদয়ের উত্তরণ। বদলে যান তাঁরা। দীক্ষিত হন জাতির সম্ভাবনাবান এই সন্তানদের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের পৌরোহিত্যে।

সেদিন থেকে তাঁরা হন কেন্দ্রের সত্যিকার সংগঠক। কেন্দ্রের স্বপ্নের সঙ্গে একাত্ম। আমাদের দীক্ষিত সহোদর। জাতির অর্থময় উত্তরণের সংশপ্তক যোদ্ধা ও সংগ্রামী।

৩

কেন্দ্রের কর্মীদের রসিকতা করে বলি : শাখা থেকে কোনো সংগঠক এলে তাঁকে যত্ন করবে দু-ভাবে—শ্রদ্ধা করবে শ্বশুরের মতো আর আদর করবে জামাইয়ের মতো।

শুনে কর্মীরা মুখ টিপে হাসে।

কিন্তু এই সামান্য আদরটুকু ছাড়া তাঁরা কী-ই বা চান আমাদের কাছে—তাঁদের নিঃস্বার্থ ত্যাগের প্রত্যুত্তরে।

আর আমাদের শূন্য ভাঁড়ার থেকে এর চেয়ে বেশি তাদের কী দেয়াই বা সম্ভব!

১৯৯৬

৪

কোনো অর্থ নেই, সম্মানী নেই, পারিতোষিক নেই;—বেতন, প্রাপ্তি, ক্রীত অঙ্ক কিছুই না—তবু বছরের পর বছর কেন্দ্রের শাখাগুলোয় এযাবৎ প্রাণপাত করে গেছে প্রায় সাত-আট হাজার কর্মী—'একদিন আলোকিত বাংলাদেশ আসবে' কেবল এই অলীক স্বপ্নের পেছনে। পুরো 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর' মতো ব্যাপার আর কী।

তবু এইটুকু করার জন্যও মানুষের হাতে তাদের দুর্গতির শেষ নেই। এই দেশে বিনা স্বার্থে কেউ কিছু করে নাকি? এতসব কাজ, ছোটাছুটি, খাটাখাটনি সব এমনি-এমনি? কিছুই পায় না?

মাঝে মাঝেই অনেকে গায়ে পড়ে আমাদের তরুণকর্মীদের জিগ্যেস করে : 'আচ্ছা, এত যে তোমরা দৌড়াদৌড়ি করো, এর জন্য পাওটা কী?' কোনোকিছু না-পেয়েও যে মানুষ কাজ করতে পারে এটা কিছুতেই তাদের বুদ্ধিতে আসে না। উত্তরে আমাদের তরুণকর্মীরা যখন বলে তারা কিছু পায় না, তখন তারা বলে : বিদেশি অর্থপুষ্ট বেসরকারি সংস্থাগুলো ভাবনাটাকে প্রায় ভুলিয়েই দিয়েছে জাতির মাথা থেকে। 'এ্যাহ্ বললেও বটে একটা কথা! দিনরাত এত কাজ করো, আর কিছু পাও না। পাও, পাও। আসলে বলতে চাও না।' পঁচিশ বছর ধরে একই কথা শুনতে শুনতে সবার কান ঝালাপালা। এসব প্রশ্নের সামনে আমাদের কর্মীরাও অসহায় হয়ে যায়। সত্যি তো, কোনোকিছু পায় না, অযথাই খেটে বেড়ায়, কেমন ধারার কথা এ? কিছুতেই তাদের বোঝাতে পারে না তারা। প্রশ্নকারীদের ঠোঁটের কোণায় অবিশ্বাসের হাসি আগের মতোই চিকচিক করে।

কিছুদিন আগে সীতাকুণ্ডে আমাদের এক ঠ্যাটা কর্মী এদের প্রশ্নের একটা মোক্ষম উত্তর বের করেছে। একদিন যেই অমনি এক অবিশ্বাসী তাকে প্রশ্ন করেছে, 'আচ্ছা এই যে দিনরাত খেটে মরো এর জন্য পাও কত বলো তো?'

কর্মী হেসে জবাব দিয়েছে, 'কিছু তো পাই-ই। না হলে কি এত কাজ করা যায়'

বলকানো খুশিতে অবিশ্বাসীর জিজ্ঞাসা, 'পাও তাহলে তোমরা? কত পাও? কত?'

'যেদিন অল্পস্বল্প কাজ করি সেদিন ধরেন হাজার পাঁচেক দেয়। কাজ একটু বেশি করলে কোনো কোনো দিন হাজার সাতেকও পাই।'

'এ্যাহ! বানিয়ে বলছ ছেলে। এত কি দিতে পারে নাকি কেউ?' তার মুখে অবিশ্বাসের হাসি।

কর্মী : 'দেয়, আমাদের প্রতিষ্ঠান দেয়। বড় প্রতিষ্ঠান তো। টাকার ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। এত টাকা দিয়ে করবে কী বলেন?'

কর্মীর কাছ থেকেই শুনলাম উত্তরটা জনাবিশেক লোককে দেবার পর প্রশ্নটার হাত থেকে ও নাকি পুরোই রেহাই পেয়ে গেছে। এখন আর এ নিয়ে কেউ ওকে ঘাটায় না।

উত্তরটা আমাদের দেশের পেক্ষাপটে সত্যি লাগসই। যে-শাখাতেই যাই সেখানকার কর্মীদের উত্তরটা শিখিয়ে দিয়ে আসি।

প্রায় পাঁচহাজার নিয়মিত স্বেচ্ছাসেবী আমাদের শাখাগুলোতে আজ। এত স্বেচ্ছাসেবী দেশের আর-কোনো প্রতিষ্ঠানে আছে কি? কোনো মতলব নেই, লাভ নেই, এরকম এতজন কর্মী দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলগুলোতেই কি আছে?

২০০৪

৫

কিছুদিন আগে কেন্দ্রে এক যুবক এসে উপস্থিত। বয়স আটাশ থেকে তিরিশ। তার সারা শরীরে স্বাস্থ্য আর উদ্যমের দীপ্তি। জানাল, তাদের শহরে কেন্দ্রের একটা শাখা খুলতে চায়।

বললাম, 'আমাদের শাখাকে তাতিয়ে রাখতে যে-যৌবন দরকার, আছে তা?'

উত্তর হল, 'আছে।'

বললাম, 'কোথায়? হাতে, পেশিতে, ধমনিতে না হৃদয়ে?'

বুকের বাঁদিকে হাত রেখে বলল, 'এখানে। যেখানে বাস করে শক্তি আর যৌবন।'

থেমে আবার বললাম, 'আগুন আছে তো তার ভেতর? ধরানো যাবে তো সিগারেট?'

'পরীক্ষা প্রার্থনীয়'। তার শান্তকণ্ঠের নির্বিকার উত্তর।

হ্যাঁ, এই আগুনই তো চাই আমাদের কেন্দ্রের ভেতর। সারাদেশের সবখানে। এমনি সব হাজার হাজার উদ্যমের শিখা; যেসব স্বর্গীয় চুল্লি থেকে নিজ নিজ জীবন জ্বালিয়ে নেবে এদেশের মানুষ।

১৯৯৮

সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার

আলোকিত মানুষের স্বপ্নদ্রষ্টা*

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন ॥ গোলাম মোর্তোজা

সাপ্তাহিক ২০০০ : উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভাবতে চাই বলছেন, এমন হতাশার মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনি কী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : আমি এই জাতির অপরিমেয় ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। আমাদের যুগেও-যে ভালো কাজ হয়নি তাও নয়। মুক্তিযুদ্ধ তো আমাদের প্রজন্মই করেছে। আমাদেরও গৌরবময় অবদান আছে। কিছুকিছু নেতিবাচক দিক থাকলেও আমাদের দেশে আজকে বিত্তের যে-বিপুল সূচনা, সে-ও কি আমাদের প্রজন্মই করেনি? হয়তো অনৈতিকতার পথেই তা হয়েছে, মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়েই হয়েছে। লুণ্ঠন, দস্যুতা, অলজ্জ অবারিত স্বার্থলোলুপতা দিয়েই হয়েছে। কিন্তু হয়েছে তো! সেই অনৈতিকতাগুলোর কারণে আমরা অবক্ষয়ী হয়েছি, নষ্ট হয়েছি। হয় আমরা বিত্তের প্রয়োজনে মূল্যবোধকে হারিয়েছি অথবা মূল্যবোধের বিনিময়ে বিত্ত অর্জন করেছি। এখন নতুন প্রজন্মকে এসে আবার সেই মূল্যবোধটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের অর্জিত বিত্তকে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্যই করতে হবে।

২০০০ : আমরা করেছি—সব কথাই হচ্ছে 'পাস্ট টেন্সে'। আমার প্রশ্ন, আপনি এই মুহূর্তে কতটা আশাবাদী?

সায়ীদ : সবাই কমবেশি চেষ্টা করছে। হয়তো সীমাহীন ব্যর্থতা ডিঙিয়ে আমাদের তা চোখে পড়ছে না। আর শুধু আমাদের চেষ্টা দিয়েই যে হবে তা নয়। নতুন প্রজন্মের মধ্যে সেরকম রক্তবীজেরও দরকার হবে। আমি মনে করি এই প্রজন্মের ভেতর সেরকম অনেক সংশপ্তক আছে, তারা উঠে আসবে। আসতেই হবে। কারণ প্রকৃতি এতটা অন্ধকারকে নিঃশব্দে সহ্য করবে না। 'তোমাকে

---

* বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রাসঙ্গিক অংশ নেওয়া হয়েছে।

আসতেই হবে হে স্বাধীনতা'—একদিন যেভাবে বলা হয়েছিল আজ সেভাবেই বলছি : 'তোমাকে আসতেই হবে হে মূল্যবোধ, তোমাকে আসতেই হবে এ উজ্জ্বল বাংলাদেশে। হে নতুন প্রজন্মের ভ্রাতারা, এই দুঃখের অন্ধকারে তোমরা কিছুতেই এ না-এনে পারো না।'

২০০০ : আপনি তো দীর্ঘদিন ধরেই মানুষকে বই পড়াচ্ছেন। আপনার চেতনাজগতে কি কোনো পরিবর্তন এসেছে যে, শুধু বই পড়িয়ে সবকিছু হবে না?

সায়ীদ : পরিবর্তন আসেনি বলব না। তবে তার মানে এই নয় যে বই পড়িয়ে কিছুই হয় না। আমি মনে করি বই খুবই একটা বড় জিনিশ। তবে এর সঙ্গে আরো অনেক কিছু দরকার।

আমাদের দেশে এই মুহূর্তে জ্ঞান-আন্দোলন বেশি জরুরি, না স্বাস্থ্য-আন্দোলন বেশি জরুরি—অনেকদিন ধরেই আমি এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। কারণ বাঙালির চাইতে খারাপ-স্বাস্থ্য পৃথিবীতে আর-কোনো জাতির মধ্যে আমি দেখিনি। বাঙালির মেধা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিদের মেধার সমান। কিন্তু স্বাস্থ্য সর্বনিম্ন পর্যায়ের। স্বাস্থ্যের অনটন আমাদের অন্যান্য সম্ভাবনাগুলোকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। সারা জাতি আজ দেশকে উঁচু করে ধরে রাখতে চাচ্ছে। কিন্তু সবার মিলিত অক্ষমতার জন্য এ কেবলই নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। এ অক্ষমতা স্বাস্থ্যগত অক্ষমতা। এই স্বাস্থ্য নিয়ে মেধার চাইতেও আজ বেশি ভাবা উচিত আমাদের। বাঙালি জিনিয়াসদের মধ্যে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া কেউ বাঙালির স্বাস্থ্যের কথা বলেননি, এটা আমার কাছে আশ্চর্য লাগে। রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিতে-সংগীতে একটু-আধটু বলেছেন : 'অন্ন চাই, আলো চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু, / চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল-পরমায়ু, / সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।' কিন্তু এই বক্ষপট কী করে তৈরি হবে, কী করে তাকে সাংগঠনিকভাবে সারাদেশের মধ্যে গড়ে-তোলা যাবে—এটা নিয়ে কথা হয়নি। আমি বলি না যে স্বাস্থ্যচর্চা করে আমাদের সবাইকে গামা পালোয়ান হতে হবে। কিন্তু ফিটনেস তো থাকতে হবে, যে-ফিটনেস না-থাকলে একজন মানুষ তার অভীষ্ট কাজটুকু করে উঠতে পারে না।

২০০০ : শুধু বুদ্ধি দিয়ে ...

সায়ীদ : শুধু বুদ্ধিতে হয় না। শরীরে ফিটনেস না-থাকলে বুদ্ধি বোকা হয়ে থাকে। জীবন থেকে আনন্দ কমে যায়। দৃষ্টি নেতিবাচক হয়ে পড়ে। সুতরাং স্বাস্থ্য খুবই ভাইটাল বিষয়। আমি বহুদিন ধরে ভাবছি এই আন্দোলনে এখন নামব। আমি লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি যাদের উদ্দীপ্ত করে এই কাজটা করা সম্ভব। কারণ সমাজে আমি শুধু আলোকিত মানুষের ফুল ফুটিয়ে বসে থাকলে তো হবে না। শুধু শিল্পসাহিত্যের চর্চা করলে হবে না। দৈহিক যোগ্যতার সঙ্গে সাহিত্যদর্শনকে না-মেলাতে পারলে সব ভণ্ডুল হয়ে পড়বে। ইয়োরোপ এই দুইকে মেলাতে পেরেই বড় হয়েছে।

আমাদের পরিচ্ছন্নতার দিকটার ওপর ভালোভাবে নজর রাখা উচিত। আমাদের চেয়ে নোংরা জাতি খুব কম আছে। আমাদের রক্তের মধ্যেই একটা শতাব্দীগত অলসতা বাসা বেঁধে রয়েছে। যা করণীয় সেটাকে পিছিয়ে দিতে পারলে আমরা স্বস্তিবোধ করি। এভাবে পিছিয়ে দিতে দিতে সবখানে আবর্জনার পাহাড় জমে গেছে।

২০০০ : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বয়স তো প্রায় বিশ-বাইশ বছর হয়ে গেল। এটা তো বেশ বড় একটি সময়। এই সময়ের কার্যক্রম ...

সায়ীদ : বাইশ বছরে আমাদের কার্যক্রমের যতটা বড় হওয়া উচিত ছিল ততটা বড় একে আমরা করতে পারিনি। এর প্রধান কারণ আর্থিক সংকট। হয়তো আমার নিজেরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। নানান দিকে আমার ব্যক্তিগত উৎসাহ। লেখার দিকে, পড়ার দিকে, শিক্ষকতার দিকে, টেলিভিশনের দিকে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের দিকে। এই সময়ের মধ্যে আমার সমস্ত শক্তি যদি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কার্যক্রমে কেন্দ্রীভূত করতে পারতাম তাহলে হয়তো এটাকে আরও বড় করা যেত।

হয়তো জানেন যে, বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে আমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তুলিনি। যদি বিদেশি টাকা নিতাম তাহলে আকার-আকৃতিতে হয়তো এটা এতদিনে অনেক বড় হয়ে উঠত। কিন্তু তখন এর চরিত্রের জায়গাতে, আদর্শের জায়গাতে, আমরা দুর্বল হয়ে থাকতাম। আমাদের হয়তো বিত্ত নেই, আমাদের সংখ্যাও হয়তো কম। কিন্তু আমাদের একটা চরিত্র তৈরি হয়েছে। এটাকে আমি আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ মনে করি।

২০০০ : আপনি 'আলোকিত মানুষ' বা 'সম্পন্ন মানুষ'-এর কথা বলেন। আজ বাইশ বছর পর যদি আপনাকে মূল্যায়ন করতে বলি তাহলে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন বিষয়টিকে?

সায়ীদ : উদাহরণ দিয়ে বলা কঠিন। এই বিশ-বাইশ বছরের মধ্যে আমাদের আসল ব্যাপারটা ঘটেছে গত পনেরো বছরে। এই পনেরো বছরের প্রথম দশবছরে আবার এর আকৃতি ছিল খুবই ছোট। পনেরো বছর আগে যে ছেলে বা মেয়েটি এসেছিল তার বয়স এখন সাতাশ-আটাশ বা ত্রিশ বছর। এ হল প্রথম যারা এসেছিল তাদের কথা। তারা সংখ্যায় ছিল কম। এখন একসঙ্গে এক লক্ষের কথা আমরা বলতে পারি। তখন এই সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচশো।

আগামী বিশবছরে আমাদের এই প্রচেষ্টা থেকে সমাজে আমরা কিছু 'সম্পন্ন' উজ্জ্বল মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ উপহার দিতে পারব বলে বিশ্বাস করি। জীবনের সূচনার দিনগুলোতে মানুষের চেতনাজগৎকে যদি একটু সম্পন্ন করে দেওয়া যায়, তাকে যদি অনুভূতিময় করে তোলা যায়, তার মানবিক সম্ভাবনাকে জাগিয়ে দেওয়া যায়; তাহলে সে যখন কর্মজীবনে যাবে তখনো ঐ স্বপ্নটা, খানিকটা তার মধ্যে থেকে

যাবে। পৃথিবীকে ঐভাবেই সে গড়ে তুলতে চাইবে।

তাই আমরা ছোটবেলা থেকেই একজন মানুষের হৃদয়কে সুন্দর করে গড়ে দেবার চেষ্টা করি। তাকে সচেতন, আধুনিক ও উদার মানুষ হিশেবে গড়ে তুলতে চাই; যার সামনে থাকে একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে-তোলার স্বপ্ন।

২০০০ : মানুষের চেতনাজগতে নাড়া-দেয়া বা সুন্দর হৃদয়সম্পন্ন মানুষ হিশেবে গড়ে-তোলার কাজটা করছেন কীভাবে? শুধু বই পড়িয়ে?

সায়ীদ : প্রথমে বলে নিই বইয়ের দিকে আমাদের যেতে হল কেন। একটু আগে যেটা বললাম সেটাই আবার বলতে হয়। গত তিরিশ বছরে আমাদের সমাজ একদিক থেকে অনেক পিছিয়ে গেছে। আমাদের ছোটবেলায় যদি জিজ্ঞেস করা হত : তুমি কার মতো হবে? তখন নাম আসত বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি সুভাষ বোস, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের। আজকে আমরা চোখের সামনে কাকে উদাহরণ হিশেবে তুলে ধরব? কার নাম বলব?

শিক্ষকদের দেখে ছাত্রছাত্রীরা অনুপ্রাণিত হবে; বড় স্বপ্নে উদ্দীপ্ত, প্রজ্বলিত হবে। আজকে শিক্ষকদের কাছ থেকে ছাত্রছাত্রীরা কি সেটা পাচ্ছে? অথচ মনে রাখতে হবে জৈবিকভাবে যেমন, আত্মিকভাবেও তেমনি : মানুষ মানুষের কাছ থেকেই জন্মায়। আমাদের আজকের নতুন প্রজন্ম আগের যে-মানুষের কাছ থেকে জন্মাবে সেই মানুষটা তো নেই। তাই আমাদের চলে যেতে হল বইয়ের কাছে। বই কী? অতীতের যাঁরা শক্তিমান মানুষ, আলোকিত ও ঐশ্বর্যময় মানুষ, তাঁদের ফলবান জীবনই তো এইসব বই। তাঁদের উদ্যম, কাজ, স্বপ্ন, সৌন্দর্য আর উপলব্ধির ভাণ্ডার সব রয়েছে এসব বইয়ে। কাজেই এসব বইপড়া মানে তাঁদের ভেতরকার অনবদ্য ও মহার্ঘ জিনিশগুলোকে নিজের ভেতর নিয়ে নেওয়া, তা দিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করা। ছাত্রছাত্রীরা যদি এইসব বইপড়ার ভেতর দিয়ে ঐ মানুষদের সম্পন্ন ভুবনে বাস করতে থাকে তাহলে চারপাশের নিঃস্ব বাস্তবজগতের রাহুগ্রাস ও অভিশাপের বলয় থেকে সে কিছুটা বেরিয়ে যেতে পারবে। তাকে প্রতিরোধ ও পরিবর্তন করার প্রেরণা পাবে। এজন্য আমরা বইয়ের ওপরে খুবই গুরুত্ব দিয়েছি। একটি ভালো বইয়ের যিনি লেখক তিনি একজন উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। বড় মূল্যবোধ, মনন, স্বপ্ন, কল্পনায় সমৃদ্ধ মানুষ। একটা গল্প বা উপন্যাসের মধ্যদিয়ে একটা বড়জীবনের মহত্তম সম্ভাবনাকে তিনি সূক্ষ্ম ও বিচূর্ণিতভাবে পাঠকের হৃদয়ে ছড়িয়ে দিতে পারেন। পাঠকের ভেতর তাঁর জীবন-সমৃদ্ধি প্রবেশ করে। এতে পাঠক তাঁর নিজের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে।

২০০০ : আপনি বললেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে-তোলার পেছনে বিদেশি অর্থসাহায্য নেননি। কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে গেলে টাকা তো একটা বড় ফ্যাক্টর। সেক্ষেত্রে আপনি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে আরো বড় করে তুলতে টাকা কেন নিতে চান না?

সায়ীদ : টাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিশ, কিন্তু আমাদের মতো একটা আদর্শিক প্রতিষ্ঠানের জন্য নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আদর্শ আরো অনেক বড় ব্যাপার। আমরা ছেলেমেয়েদের উচ্চায়ত মানুষ হতে ডাক দিচ্ছি। আমরা চাই না, তারা প্রতিমুহূর্তে অনুভব করুক, তারা বৈদেশিক ভিক্ষার অর্থ নিয়ে বড় হচ্ছে। এতে তাদের মাথা নিচু হয়ে যাবে। তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। একটা শক্তিমত্ত মানুষ তো একটা মর্যাদার নাম। ঐ মর্যাদা ভেঙে গেলে সে মরে যায়। হৃদয়ের ভেতর ভিখিরি হয়ে গেলে সে আর-কিছু করতে পারে না। উচ্চফলনশীল ধান, পাট বা উন্নত গবাদিপশুর ব্যাপারে বৈদেশিক সাহায্যে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু মানুষের বেলায় আছে। মানুষ খুবই শক্তিশালী কিন্তু অসহায় জীব। বড়বেশি স্পর্শকাতর ও দুর্বল। মানুষ মর্যাদাসম্পন্ন জীব। একবার ছোট হয়ে গেলে সে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। আমার মনে হয় আমাদের সারাজাতির মধ্যে এটা ঘটেছে। আমাদের ছেলেবেলায় এদেশের মানুষ গরিব ছিল, আজ বৈদেশিক সাহায্যের কারণে তারা ভিখিরি হয়ে গেছে। তাদের গোটা মনোভঙ্গিটাই হয়ে গেছে আশ্রিতের আর দস্যুতার।

আমি মনে করি, জাতীয় জীবনের সবখানে আজ নৈতিকতার সার্বিক সমৃদ্ধি আমাদের প্রয়োজন। একটা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের জন্যও মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ। এটা না হলে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান টেকে না। একজন পুলিশ, একজন কাস্টমস কর্মকর্তা, একজন বিচারক বা ফড়িয়া—কার জন্য মূল্যবোধ জরুরি নয়? সেখানে আমরা তো একটা আদর্শমূলক প্রতিষ্ঠান। আদর্শের দিক থেকে আমাদের অপরাজেয় থাকতেই হবে। আমাদের প্রতিষ্ঠান আকারে বড় হল কিন্তু আদর্শে ভেঙে পড়ল, কী হবে তখন এই প্রতিষ্ঠান দিয়ে! বরং আকারে, বিত্তে, বৈভবে এ কমই থাকুক। কিন্তু আদর্শে, চরিত্রে, সততায় সবার অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়াক সেটাই হবে গুরুত্বপূর্ণ।

শস্তা টাকা, যে-টাকার জন্য মানুষ কষ্ট করেনি, তা মানুষের মমতাকে কমিয়ে দেয়। তখন মানুষ সেই টাকার মূল্য বুঝতে পারে না। ফলে অতীতের বহু রাজবংশ, অগণিত সম্পদশালী পরিবার একসময় পথের ভিখিরি হয়ে গেছে। যে-মানুষ কষ্ট করে টাকা রোজগার করছে, সে যদি বেশি রোজগারও করে তবু ঐ টাকার জন্য তার ও তার চারপাশের মানুষদের একটা মায়া বা দরিদ্রের বোধ থাকে। তখন ঐ টাকা ব্যবহারের বেলায় তাদের একটা সতর্কতা বা কঠোরতা থাকে। কিন্তু যে ঘুস খায়, তার পরিবারের মধ্যে টাকার ব্যাপারে এই মায়া থাকে না। তাই শুরু হয় অবক্ষয়। মূল্য কমে গেলে প্রেম কমে যায়—যে-প্রেমের জাগরণের জন্য আমরা এই আন্দোলন করছি তারও পতন ঘটে। চিত্তের আলোকায়ন তো আসলে একটা প্রেমের জাগরণ। অনর্জিত টাকা হলে এই আন্দোলন নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের এই আন্দোলনটা একটা নৈতিক আন্দোলন, বৈষয়িক আন্দোলন নয়। সুতরাং এটা করতে গিয়ে আমাদের কত [illegible]

রয়েছে এটার হিসাব খুব-একটা জরুরি নয়।

২০০০ : এ-ধরনের সামাজিক আন্দোলনের মতো ক্ষেত্রগুলোতে অর্থ কি নেগেটিভ রেজাল্ট নিয়ে আসে?

সায়ীদ : তাই তো আসার কথা। আমাদের এই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র—এ তো একটা আন্দোলন; এ তো প্রতিষ্ঠান নয়। যদি প্রতিষ্ঠান হত তাহলে হয়তো টাকা অনেক বেশি কাজে আসতে পারত। কিন্তু আমাদের এটা আন্দোলন, আন্দোলন তো হয় রাস্তায়। রাস্তায় বিষয়সম্পত্তি দিয়ে কী হবে? আমরা হচ্ছি গানের পাখি, কোকিল। কোকিলের তো নিজের বাসা থাকে না। বাসা থাকলে সে-তো গান ভুলে যায়। একইভাবে আমাদের বাসা থাকলেও আমরা নষ্ট হয়ে যাব। সেজন্য আমরা অন্যের বাসা খুঁজে বের করে সেখানে আমাদের ছেলেমেয়েদের বিকাশের ব্যবস্থা করি। কাকের বাসায় যেমন কোকিল তার প্রজন্মের ধারাকে প্রবহমান রাখে, আমরাও সেরকম দরকারি সুযোগসুবিধাগুলো অন্য জায়গা থেকে ধার করে আমাদের কাজ চালিয়ে নিই।

২০০০ : আবারো আমি ঘুরেফিরে অর্থের জায়গাটাতেই যাব। বাংলাদেশে যে-কয়টা প্রতিষ্ঠান দেখি তারা বেশিরভাগই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। একজন ব্যক্তিই সেখানকার প্রধান। একজন ব্যক্তির কারণেই একটি প্রতিষ্ঠান হয় বা আন্দোলন হয়। যেমন বারডেমের কথা বলা যায় বা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কথা। যে-কোনো এনজিও, এমনকি ব্র্যাকের ক্ষেত্রেও একজন ব্যক্তিই এর মূল—প্রধান। যদি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রধান হিশেবে আপনাকে বাদ দিয়ে চিন্তা করি তাহলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের টিকে-থাকার ব্যাপারে একটা সংশয় অনুভব করি। কিন্তু ব্র্যাকের ক্ষেত্রে এ-সংশয়টা কি অনেকটা কম না? অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি প্রতিষ্ঠান টিকে-থাকার জন্য কি টাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না?

সায়ীদ : প্রতিষ্ঠান টিকে-থাকার জন্য টাকার চাইতেও যেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল মানুষ। আত্মোৎসর্গিত নৈতিক মানুষ। এটা না হলে প্রতিষ্ঠান থাকে না। বিশেষত সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এটা আমাদের মতো গরিব প্রতিষ্ঠানেরই কী আর ব্র্যাকেরই কী!

২০০০ : কিন্তু ব্র্যাক নিয়ে ....

সায়ীদ : ব্র্যাক টিকে থাকবে, কারণ ব্র্যাকের অনেক টাকা আছে। কিন্তু আমাদেরও অনেক মানুষ আছে, যারা নিজের জীবন দেয়ার জন্য বসে আছে। টি.এস. এলিয়টের একটা কথা মনে পড়ে : 'দে হ্যাভ বাটলারস অ্যান্ড নো ফ্রেন্ডস, উই হ্যাভ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড নো বাটলারস।' আমার উত্তরটা এর মধ্যেই আছে। আমাদের সেইসব মানুষ আছে যারা টাকার বিকল্প। আমাদের একটা স্লোগান আছে: 'আলোকিত মানুষ চাই।' এই স্লোগানটাও আমাদের একটা সম্পদ, সে-

অর্থে ধরলে এটাও তো টাকা। এটাও একটা শক্তি। আর কোনো সংগঠনের কি এটা আছে? আমরা মানুষের ওপর নির্ভর করছি এবং আমাদের মতো প্রতিষ্ঠানের মানুষের ওপর নির্ভর করাই ভালো।

২০০০ : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের টাকা নেই তা নয়, টাকা আছে তবে কম আছে। বেশি টাকা নেয়া হয় না, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ...

সায়ীদ : অন্তত এক-আধটি ক্ষেত্রে আমরা এখন বিদেশি টাকা নেব। কারণ আমার ক্ষমতা যখন দশ, তখন আমার এক নিতে তো অসুবিধা নেই। যেদিন আমার ক্ষমতা ছিল না, সেদিন যদি আমি দশ নিতাম, তাহলে টাকাই হয়ে যেত আমার নিয়তি। যে এ দিত আমাকে তার দাস হতে হত।

২০০০ : একবার জাপান সম্ভবত একটা বিশাল এ্যামাউন্ট দিতে ....

সায়ীদ : জাপান খুবই বিপুল টাকা দেবার প্রস্তাব করেছিল। কেবল তারা একা নয়, কয়েকটি দেশের সঙ্গে কনসোর্টিয়াম করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি সেটাতে আগ্রহী হইনি। আমি তাদের বলেছি : মানুষ তৈরি হওয়ার আগেই যদি তার প্রাসাদ তৈরি হয়ে যায় তাহলে সেখানে সাপ, ব্যাঙ, সরীসৃপ বসবাস করে। আমরা আগে মানুষটাকে তৈরি করি। সে-মানুষ তখন তার নিজের ঘর নিজেই তৈরি করে নেবে। আমি মানুষের শক্তিতে বিশ্বাস করি। ভিক্ষায় আমার আস্থা নেই।

কেন এটা বলছি, একটা গল্প বললে তা স্পষ্ট হবে। ১৯৬৮ সালে আমাদের ঢাকা কলেজের সামনে এক পঙ্গু ভিখারি ভিক্ষা করত। তার চেয়ে ১০০ গজ দূরে ভিক্ষা করত একইরকম আর একজন পঙ্গু ভিখারি। একদিন তিনটার দিকে আমি কলেজ থেকে বেরোচ্ছি, দেখি একশো গজ দূরের ভিখারিটা গেটের সামনের ভিখারির কাছে এসে বসল। দেখলাম তারা হাসাহাসি করে খোশগল্প করেছে। কী নিয়ে তারা কথা বলছে আমার জানার কৌতূহল হল। শোনার জন্য একটু কাছে এগিয়ে গেলাম। যেতেই শুনলাম দূরের ভিখারিটা গেটের ভিখারিকে বলছে : আজ কীরকম হল বসির মিঞা? বসির মিঞা বলল : আজ 'ইনকাম' মন্দা, টাকা পঁচিশেক হইছে। কথোপকথনের সময় সে 'ইনকাম' শব্দটাই ব্যবহার করল। তখন বিকেল তিনটা, রাত দশটা পর্যন্ত সে ভিক্ষা করবে। কাজেই তার আয় অন্তত ৪০ টাকা হবে। আজকে তার 'ইনকাম' কম, কাজেই আজ যদি ৪০ টাকা হয় তবে তার প্রতিদিনের গড় 'ইনকাম' নিশ্চয়ই অন্তত ৫০ টাকা। অর্থাৎ মাসে কম হলেও সে দেড় হাজার টাকার মতো রোজগার করে। এটা যখনকার কথা তখন আমার বেতন ছিল ৩৭৫ টাকা এবং আমার বয়সী সি.এস.পি. অফিসার, যাঁদের জাঁকজমক ছিল সেকালে রাজপুত্রদের মতো, তাঁদের বেতন ছিল সাড়ে পাঁচশো টাকা। তখন এই ভিক্ষুক রোজগার করে দেড় হাজার টাকা!

কোথায় আজ সে ভিক্ষুক? সে কি বড়লোক হয়েছে? আমি চোরকে বড়লোক

হতে দেখেছি। ডাকাতকে বড়লোক হতে দেখেছি। বুদ্ধিমান মেধাবী উদ্যমশীলদের দুর্বৃত্ত বা দস্যুদেরও বড়লোক হতে দেখেছি। সৎ উদ্যোগী কর্মঠদের বড়লোক হতে দেখেছি। কিন্তু ভিক্ষুককে বড়লোক হতে দেখিনি।

জাতীয়ভাবে আমরা-যে সারা পৃথিবীর কাছ থেকে এতকাল বৈদেশিক সাহায্য নিয়েছি তা নিয়ে আমরা কী করেছি? আমাদের মূল্যবোধটাকে হারিয়েছি, যে-মূল্যবোধ পুঁজি হিশেবে টাকার চেয়ে অনেক বড় সম্পদ। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সব কাজ যদি টাকা দিয়ে করতাম তাহলে কেন্দ্রের ভেতরেও আমাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটত। আমাদের সম্পর্ক ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াত। আমাদের মধ্যে থেকে প্রেম-ভালোবাসা চলে যেত। আমাদের স্বপ্ন ও সংগ্রামের শক্তি চলে যেত। আমাদের ভেতরকার পারিবারিক সম্পর্ক ভেঙে পড়ত। এতে কী লাভ হত? আমাদের তো মূল পুঁজি চেতনা, প্রেরণা, স্বপ্ন। সেটা হারিয়ে ফেললে কী লাভ হত?

বটগাছের মূলকাণ্ডটা একসময় মরে যায়, কিন্তু এ বেড়ে চলে ঝুরিতে ঝুরিতে। হয়তো বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র একদিন থাকবে না। কিন্তু এর নৈতিক মানুষেরা থেকে যাবে। তাদের আশ্রয় করে কেন্দ্রের স্বপ্নটা যদি একটু একটু করে বটগাছের মতো বিশাল হতে থাকে, তবে খারাপটাই বা কী। আমাদের স্বপ্নের সৈনিকরা তো সারাদেশে জন্মে নিচ্ছে।

২০০০ : আপনি বলছেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কোনো প্রতিষ্ঠান নয়। এটা একটা আন্দোলন। এটাকে কি আপনি এন.জি.ও. বলবেন অর্থাৎ এর ক্রাইটেরিয়া ...

সায়ীদ : সরকারের প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে একসময় ছিল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। জনগণের উদ্যমে তৈরি স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এসবকে বলা হত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। আজ প্রাইভেট কলেজকেও এন.জি.ও. বলে। আমি মনে করি এটা ঠিক নয়। যে-এন.জি.ও.-গুলো পুরোপুরি বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা জন্ম নিচ্ছে, আর যে-এন.জি.ও.-গুলো দেশের ভেতর থেকে মানুষের শ্রম, কষ্ট, বেদনা থেকে জন্ম নিচ্ছে—এই দুই প্রতিষ্ঠানকে আলাদা মর্যাদা দেয়া উচিত।

কোনো জায়গায় একজন মানুষ সারাজীবন একটা স্কুল তৈরির জন্য তিল তিল করে নিজের জীবন উৎসর্গ করে মরে গেল। তার রক্ত থেকে যে-প্রতিষ্ঠানটি জন্মগ্রহণ করল, মানুষ যাকে তাদেরই নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলে সম্মান দিল, গ্রহণ করল বা তার রক্ষক হল, সেই প্রতিষ্ঠানের শক্তি; আর যে-প্রতিষ্ঠানের জন্য ফরেন ফান্ড এল, জিনিশটা জাদুর মতো রাতারাতি তৈরি হল—এ-দুটোর শক্তি কি সমান? ঐ স্কুলটাকে ধারণ করার জন্য একসময় অনেক আত্মোৎসর্গিত লোক এসে যাবে। ওর ছাত্ররাই হয়তো আসবে। কিন্তু রহস্যাবৃত সূত্রে পাওয়া টাকায় তৈরি প্রতিষ্ঠানের বেলায় এটা হবে না। কেউ আসবে না। ওটা লুট হয়ে যাবে।

২০০০ : আপনি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন। বাংলাদেশের মতো দেশে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে গেলে নানারকম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথম অবস্থায় তার অনেকটি নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। আপনাকে হয়তো এরকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে?

সায়ীদ : কোনো প্রতিষ্ঠান যদি গতানুগতিক আঙ্গিকের হয়—যে আঙ্গিককে মানুষ চেনে, জানে—সেটা নিয়ে কিন্তু অত অসুবিধা হয় না। আমি যদি একটা স্কুল তৈরি করতে চাই সেটা নিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না। এটাকে সবাই ভালো কাজ বলবে, কারণ সবাই জানে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল দরকার। হাসপাতাল বানালেও তা নিয়ে কোনো সমালোচনা হবে না। মসজিদ বানালেও না। মানুষ শোনামাত্র তাকে স্বাগত জানাবে।

কিন্তু আমরা এমন একটা জিনিশ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি, যে-জিনিশটি এই সমাজে ছিল না। কোনো সমাজেই হয়তো নেই। সবার কাছে পুরো অপরিচিত একটা ব্যাপার। ভাবনাটাও পুরোপুরি বিমূর্ত। মানুষের আলোকায়ন—এটা আবার কী? স্কুলে আমরা কর্মসূচি শুরু করতে গেলে কোনো-কোনো হেডমাস্টার অনেক সময় বলেন, 'বই পইড়া কী হইব। খালি খালি পড়া নষ্ট।' কী করে তাঁদের বোঝাব এসব বই ও অন্যরকম সৃজনধর্মী কর্মসূচির ধীর, দীর্ঘমেয়াদি ও রহস্যময় প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে তাদের হৃদয়জগৎ কীভাবে একটু একটু করে পাপড়ি মেলে। আসলে অন্যসব প্রতিষ্ঠানের মতো আমরা বস্তুজগৎ নিয়ে কাজ করছি না, কাজ করছি চেতনাজগৎ নিয়ে, মানুষের অ্যাবস্ট্রাক্ট সম্ভাবনা নিয়ে। এজন্যেই মানুষকে এ বোঝাতে আমাদের এত কষ্ট। চেতনার রহস্যালোকের ব্যাপার সাধারণ মানুষকে কী করে বোঝাব।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বইগুলো আমরা পড়াচ্ছি। এ বই পড়ে ছেলেমেয়েদের চেতনাজগৎ উদ্ভাসিত হচ্ছে, হৃদয় উন্মোচিত হচ্ছে। তারা স্বপ্ন দেখতে শিখছে। এতে ক্ষতিটা কোথায়? তাহলে ঐ হেডমাস্টার এটা বলেন কেন? তিনি কি মানুষ খারাপ? না। তিনি কি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন? তাও না। তাহলে এর কারণ কী? কারণ এই : তিনি যখন এই ছেলেমেয়েদের মতো ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়তেন, তখন এরকম একটি সুন্দর স্বপ্নেভরা ভালো বই কেউ তাঁর হাতে তুলে দেয়নি। তাঁর মনটা সৌন্দর্যের স্পর্শে ঝলমলিয়ে ওঠেনি। এই আলোর জগৎটা তাঁর অজানা রয়ে গেছে।

আমাদের কার্যক্রমে অংশ নিলে এর ফল কী হবে—এটা আমি বহু মানুষকেই বোঝাতে পারিনি। তাই অনেকেই আমাদের কার্যক্রম নিয়ে সবসময়ই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এজন্যই আমাদের এত কষ্ট। তবে এরপর যদি কেউ এরকম প্রতিষ্ঠান করতে চায় তাহলে তার এত কষ্ট করতে হবে না। সে উদাহরণ হিশেবে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে দেখাতে পারবে।

২০০০ : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কাজের বিষয়ে কিছু অভিযোগ শোনা যায়। বাম রাজনীতিবিদরা বলে ওখানে ব্রেন ওয়াশ করা হয়। মৌলবাদীরা বলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কম্যুনিস্ট বানায়। আবার অনেকেই বলে 'সি.আই.এ.', 'র'-এর এজেন্ট।

সায়ীদ : কে কী বলে সেটা তাদের ব্যাপার। আমি আমার কথাটা বলতে পারি। যিনি যে-রঙের চশমা পরে আছেন, তিনি সে-রঙই দেখবেন। চোখে যদি লাল চশমা থাকে, সারাপৃথিবী লাল মনে হবে, নীল চশমা পরলে নীল। আমি মৌলবাদীও না, 'র'-ও না, আমি 'সি.আই.এ'-ও না, আমি কম্যুনিস্টও না। আমি শিক্ষক, মানুষের ভেতরকার শক্তি জাগিয়ে তোলা আমার স্বপ্ন। আমি তার মানবিক সম্ভাবনা বাড়াতে চেষ্টা করি। এটাই আমার কাজ। আমি মনে করি এটুকু পারলেই আমার দায়িত্ব শেষ। তারপর ছাত্রের দায়িত্ব। সে নির্ধারণ করবে সে কী করবে, কোন্ বেদনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সে সমাজে কী অবদান রাখবে। তাকে শক্তিশালী করে দিতে পারাটাই আমার উদ্দেশ্য। শিক্ষকতার এলাকা ঐটুকুই।

আমাদের পুরো কর্মকাণ্ডটাই বিমূর্ত প্রকৃতির, সরাসরি হাতে-হাতে ফল নেই। এটাকে বস্তুগতভাবে বোঝানোও কঠিন। যেটাকে বস্তুগতভাবে বোঝানো যায় না, সেই জিনিস সাধারণ মানুষ বোঝে না। তাই আমাদের নিয়ে এত কথা, এত ভুল-বোঝাবুঝি। তবে আমাদের কার্যক্রমকে মানুষ বুঝুক, না-বুঝুক, এতদিনে কমবেশি অনুভব করতে পেরেছে। আমি মনে করি এটাও আমাদের একটি সাফল্য।

২০০০ : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শুরুর সময়ে ...

সায়ীদ : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র শুরুর সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে আমাদের 'আলোকিত মানুষ চাই' কথাটা দেশের জন্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আজকে কি তারচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়নি? হয়েছে। কারণ আমাদের চারপাশের অন্ধকার এর মধ্যে অনেক বেড়েছে। মানুষ এর দরকার আরও বেশি করে উপলব্ধি করছে। আমরা তখনই স্পষ্ট দেখছিলাম অন্ধকার বাড়তে যাচ্ছে। আমাদের যাত্রা-যে সঠিক ছিল আজ আমাদের গ্রহণযোগ্যতাই তার প্রমাণ।

২০০০ : অন্ধকার বাড়তে যাচ্ছে বুঝেই কি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিলেন?

সায়ীদ : সত্যি তাই। সেদিন আমাদের কার্যক্রমের কথা মানুষকে বোঝাতে কষ্ট হয়েছে। কিন্তু আজকে অন্ধকার চারদিকে আরো গভীর হয়ে গেড়ে বসায় আমাদের তা আর বুঝিয়ে বলতে হচ্ছে না। এখন 'আলোকিত মানুষ চাই' বলার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরা নিজেই বুঝে ফেলছে। চারপাশের অন্ধকারই তার কাছে সবকিছুর ব্যাখ্যা দিচ্ছে।

২০০০ : স্কুলের পাশাপাশি কলেজ-লেভেলের কর্মসূচিতে এসেও ছাত্রছাত্রীরা কিছু অসম্ভব ভালো বই পড়ে। বইয়ের কোনো-কোনো চরিত্রকে হৃদয়ে ধারণ করে

স্বপ্ন দেখতে শেখে। কিছু-একটা করতে চায়। সমাজটাকে ছেড়ে তুমার করে দিতে চায়। কিন্তু অল্পসময়েই তার সেই স্বপ্ন ধাক্কা খায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্র বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানই তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জায়গা দিতে পারে না। ফলে অনেকের মধ্যেই বিভ্রান্তি আসে।

সায়ীদ : স্বপ্ন জিনিশটি তো খারাপ নয়। স্বপ্নকে একটা বেলুন বা হাওয়াই মিঠাই হিশেবে কল্পনা করলে তো হবে না। স্বপ্ন একটা কনক্রিট জিনিশ। স্বপ্ন মানে গন্তব্য। আমি কোথায় যাব তা চোখের সামনে দেখতে পাওয়া। এইটুকু আমরা করে দিই। তার পরের যুদ্ধ তো তার। তার যুদ্ধ তো আমি করে দিতে পারি না। স্বপ্ন যদি শক্তিশালী হয় সে এগিয়ে যাবে। বাস্তবকে আক্রমণ করে তাকে জয় করবে। এ বাস্তব তো কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, সারাপৃথিবী। তার সারাজীবন। যার স্বপ্ন শক্তিশালী নয় সে সামনে নায়ক পেলে শক্তিশালী হবে। না হলে ভেতরে ভেতরে সে স্বপ্নকে লালন করবে। তার আদর্শ তখন হবে প্রধানত মানসিক।

২০০০ : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যদি কিছু বাস্তব কর্মসূচির ব্যবস্থা করে দিতে পারত তাহলে সাময়িকভাবে হলেও তার স্বপ্নভঙ্গ হত না।

সায়ীদ : কে বলল তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়? হয়তো স্বপ্নটার যোগ্য হওয়া যাচ্ছে না, তাই কিছুটা অস্বস্তি আসে। স্বপ্নের কাছাকাছিই যাওয়া গেল না, তাই খারাপ লাগে। মানুষের চেষ্টা কী? নিজের স্বপ্নের সমান হওয়া। এটা যে-মানুষ পারল সেই মানুষই সার্থক। এর জন্যে সময় লাগে। একসময় স্বপ্নের ঐ বাস্তবতা তার কাছাকাছি আসতে থাকে। তবুও পার্থক্য থেকে যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে সফল মানুষটিরও এই পার্থক্য থাকে। আমি মনে করি না যে আমাদের এখানে কেউ এসে স্বপ্ন দেখে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২০০০ : কলেজ-কর্মসূচিতে যে-ছেলেমেয়েগুলো আসে তারা ভালো কিছু বই পড়ে অনুপাণিত হয়। তাদের চিন্তাজগতে, কথাবার্তায় পরিবর্তন আসে। মুগ্ধ করে তারা কথা বলে। পাড়ার বন্ধুমহলের সঙ্গে তাদের দূরত্ব বেড়ে যায়। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যাবার পর তারা অনেকটা বিচ্ছিন্ন, একা হয়ে যায়।

সায়ীদ : সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানে সবার চেয়ে শক্তিশালী হওয়া। আমরা বিচ্ছিন্নতাকে যেন ভয় না পাই। একজন উন্নত মানুষ চিরকাল নিঃসঙ্গ। সঙ্গ থাকে সাধারণ পর্যায়ের মানুষের। একজন মানুষ যত ওপরে যাবে তত সে নিঃসঙ্গ হবে। 'হি ওয়েন্ট টু দ্য টপ অব দ্য হিল, হিমসেলফ অ্যালোন'—এটা বাইবেলের কথা। পর্বতের নিচের দিকের তুলনায় তার ওপরের দিক নিঃসঙ্গ। সেখানে জায়গা একেবারেই কম।

২০০০ : আপনি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠান বলতে চাচ্ছেন না, সামাজিক আন্দোলন হিশেবে রাখতে চাইছেন। কিন্তু এদিকে আবার বিশাল কাঠামো

কমপ্লেক্স তৈরি করতে চাইছেন। কেন?

সায়ীদ : আমরা যে-আন্দোলন করতে চাই, কালচারাল কমপ্লেক্স হবে তার প্রাণকেন্দ্র। সেখানে এসে সবাই জড়ো হবে, জন্ম হবে উদামিত মুখরতার। সেখানে বড় লাইব্রেরি থাকবে। বিশ্ব-চলচ্চিত্রশালা থাকবে। বিশ্বসংগীতকেন্দ্র থাকবে। থাকবে শিশুকেন্দ্র। থাকবে নাট্যমঞ্চ। আর্ট গ্যালারি। পড়াশোনার জায়গা। থাকবে আড্ডার জন্য বিরাট ক্যাফেটিরিয়া। ঢাকা শহরের সংস্কৃতিবান নাগরিকদের যাবার কোনো জায়গা নেই। এরকম একটি জায়গা থাকলে সবাই আসতে পারবে। এসে সবাই সবাইকে চিনবে, জানবে। নিজেদের সঙ্ঘরূপ তৈরি করবে। আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হবে কেন?

২০০০ : শুরুর প্রশ্নই শেষে করছি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা কী ছিল?

সায়ীদ : কেন্দ্র যখন শুরু করেছিলাম তখন আমি শিক্ষক। আমার চারপাশে উদ্যোগী উৎসাহী তরুণ-তরুণীদের দেখতাম যাদের মধ্যে অনেক কিছু জানার, বোঝার ইচ্ছা। তারা জীবনকে বুঝতে চায়, উপলব্ধি করতে চায়। দেখলাম তারা বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একসঙ্গে হবার তাদের কোনো জায়গা নেই। আমি তখন তাদের নিয়ে একটা পাঠচক্র শুরু করলাম। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বইগুলো পড়াতে লাগলাম। আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে উচ্চতর সমৃদ্ধি দেখা দিতে লাগল। পাঠচক্রটা আমরা পাঁচবছর টিকিয়েছিলাম। এটা শেষ হবার পর মনে হল এর সুফল আমরা তো দেখলামই। একটা পাঠচক্র কেন? কেন এমন একহাজারটা নয়? তখন আস্তে আস্তে স্কুল-কলেজে এই কর্মসূচির উদ্যোগ নিলাম।

২০০০ : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তো প্রথমে ছিল ইন্দিরা রোডে?

সায়ীদ : না। ঢাকা কলেজের পাশে যে-প্রতিষ্ঠানটা এখন 'নায়েম' নামে পরিচিত-এর একটি রুমে আমরা প্রথম শুরু করি। এর কিছুদিন পর এক জায়গা থেকে আমরা কিছু টাকা পেলাম। সেই টাকা দিয়ে ইন্দিরা রোডে একটি বাড়িভাড়া করেছিলাম। তারপর খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে আমরা বাংলামোটরের বাড়িটা পেয়ে যাই।

২০০০ : পড়াশোনার ক্ষেত্রে বা বই-এর ক্ষেত্রে সর্বত্রই শোনা যায় : পড়াশোনার অভ্যাস উঠে গেছে। তো, আপনার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যে-সময় থেকে শুরু করেছেন সে-সময় থেকে এই সময় পর্যন্ত দেখলে আমরা সত্যি বলতে পারব কি পড়াশোনার অভ্যেস চলে যাচ্ছে?

সায়ীদ : পড়াশোনার অভ্যাস চলে গেছে তা নয়, আসলে পৃথিবীতে বই পড়েই খুব কম মানুষ। গড়পড়তা মানুষ বই পড়তে পারে না। ঢাকা শহরে আমরা যে-স্কুলগুলোতে বই পড়াই সেসব স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রী-সংখ্যার শতকরা চার ভাগ

মাত্র বই পড়ে। কিছুতেই এই সংখ্যাকে আমরা ৬%-এর ওপরে তুলতে পারিনি। ধরা যাক ভিকারুননিসা স্কুল, সেখানে তো সবচেয়ে মেধাবী মেয়েরা পড়ে। সেখানেও আমাদের সভ্য মাত্র ৮শো, অথচ ছাত্রীসংখ্যা ৮ হাজার। মানে শতকরা ১০ ভাগ ছাত্রী বই পড়ে। এটাই সর্বোচ্চ। বইপড়া একটা কঠিন ব্যাপার। বই পড়তে মননশীলতা দরকার। চিন্তাশক্তি দরকার। যা এটা গড়পড়তা মানুষের নেই। যদি ৪% মানুষ বই পড়ে তবেই আমি খুশি। একজন পাঠক মানে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি; একজন খুদে দার্শনিক। এদের সংখ্যা কম হলেও এরাই আগামীদিনে দেশের ভিত্তি। এরাই সমাজ গঠন করে। পৃথিবী পাল্টায়। জাতির দিকনির্দেশনা দেয়।

২০০০ : বইপড়া নিয়ে আরেকটা কথা আছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কর্মসূচির যে-সিলেবাস আছে, যে-বইগুলো পড়ানো হয়, এই তালিকায় দেখা যায় প্রায় সবই গল্প, উপন্যাস, কবিতা। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের ...

সায়ীদ : সবই দরকার আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে একটা শিশু পড়তে এসেছে আমার কাছে। তাকে ধীরে ধীরে বিশ্বজ্ঞানের দিকে নিয়ে যেতে হবে। যদি প্রথমদিনই তার হাতে দর্শন বা বিজ্ঞানের ভয়ঙ্কর বই তুলে দিই, সে তো ভয়ে পালিয়ে যাবে। সেজন্য তাকে ডাকতে হয়। আহ্বান করতে হয়। আনন্দের ভেতর দিয়ে কাছে টানতে বলতে হয় : মজার জিনিশ, হাসির জিনিশ, গল্পের জিনিশ আছে আমাদের ঝুলিতে। নেবে তোমরা? নিলে শিগগিরই এসো। এভাবে, এই খেলার ভেতর দিয়ে, মজার ভেতর দিয়ে, স্বপ্নের ভেতর দিয়ে ধীরে-ধীরে তাদের জ্ঞানের গভীর জগতের দিকে নিয়ে যেতে হয়।

'সাপ্তাহিক ২০০০'
২০০০

আলোকিত মানুষ ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন ॥ আমিমুল এহ্‌সান মুন্‌না

মুন্‌না : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কার্যক্রমে আলোকিত মানুষ গড়ে তোলার যে-স্বপ্ন আপনি দেখে আসছেন, এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে এর মূল্যায়ন কীভাবে করছেন?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : আমাদের কার্যক্রমগুলোকে ঠিকমতো পরিচালনা করে এই স্বপ্নকে সফলতার দিকে নিয়ে যাবে যারা—সেই মানুষদের এখনো খুঁজে পাইনি। সংগঠন দাঁড়িয়ে গেছে, নেতা আসেনি। একা কাঁহাতক দাঁড় বাওয়া যায়। আমি বিশ বছর ধরে একা-একা চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেইসব উজ্জ্বল মানুষ এখনো পেলাম না; যারা প্রেরণা দিয়ে স্বপ্ন দেখিয়ে ভবিষ্যৎ তরুণ জ্ঞানার্থীদের হৃদয়কে আহ্বানে আহ্বানে জাগিয়ে তুলবে। যারা নানান সময়ে আমাকে সহায়তা করেছে তাদের দ্বারা আমি খুবই উপকৃত হয়েছি। কিন্তু এই দায়িত্ব এককভাবে তুলে দিতে পারি এমন কাউকে দেখিনি। হয়তো একদিন দেখব, এককভাবে কোনো-একজনকে না-পেলেও হয়তো একটা দলকে পাব, যারা মিলিতভাবে এই দায়িত্বটি তুলে নেবে। তবু যে-কথাটা এখনো থেকেই যাচ্ছে—আজও তাদের আমি খুঁজে পাইনি। সামনের মানুষটিকে যদি না-পাওয়া যায় তবে পরের মানুষটিও তো তৈরি হয় না। সারাদেশে আমাদের যে-কর্মসূচি চলছে তার প্রতিটি শাখা ঢাকার শাখার মতোই ঐ মানুষটির জন্য অপেক্ষা করছে।

মুন্‌না : শুধু বই দিয়ে কি চেতনার আলোকায়ন ঘটানো সম্ভব?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : আমরা শুধু বই পড়াই না। তবে আমাদের মূল কর্মসূচি বই-পড়ানো। কেন্দ্রের সব শাখায় সদস্যরা প্রতি শুক্রবারে আসে, একত্র হয়, একটি করে বই বাড়িতে নিয়ে যায় এক সপ্তাহের জন্য। তারপর সপ্তাহ ধরে বইটি পড়ে

পরের সপ্তাহে তা ফিরিয়ে দিয়ে নতুন বই নেয়। এমনি করে চলতে থাকে বইপড়া। স্কুলে-স্কুলে কলেজে-কলেজেও বিদ্যালয়ভিত্তিকভাবে আমরা এমনি করে বই পড়াই। কিন্তু এতেই শেষ নয়। প্রতি সপ্তাহে যখন তারা একখানে হয় তখন তারা অংশ নেয় একটি করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। সেখানে তারা যোগ দেয় বিতর্কে, বিচিত্রানুষ্ঠানে, অতিথি-বক্তৃতায়, নানারকম বুদ্ধিবৃত্তিক খেলায়, আউটিংে—এমনি সব কর্মসূচিতে। বইপড়ার মধ্যদিয়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং মননশীলতার বিকাশ ঘটছে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে ঘটছে তাদের হৃদয়ের পরিশীলন। একটা এলাকার সবচেয়ে মেধাবী ছেলেমেয়েগুলো একত্রিত হচ্ছে এই কর্মসূচিকে ঘিরে। তারা পরস্পরের বন্ধু হচ্ছে। পরস্পরের কাছ থেকে সমৃদ্ধ হচ্ছে। একই বই পড়ার ফলে সবার মধ্যে মানসিক নৈকট্য বাড়ছে। তারা প্রায় সাতবছর ধরে একসাথে থাকছে, এতগুলো মেধাবী ছেলেমেয়ে—গড়ে তুলছে সমভাবাপন্নদের সংঘ—হয়তো ভবিষ্যৎ-জীবনের দিনগুলোতেও এমনি পরস্পরকে তারা বুঝবে, অনুভব করবে, সহযোগিতা করবে। এটা এই কর্মসূচির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

মুন্‌না : এই ধরনের কার্যক্রম আজকের আমাদের দেশ বা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে কতখানি প্রভাব রাখতে পারে?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : পৃথিবী একেক যুগে একেক ব্যাপারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। একেক যুগে একেক প্রবণতা সে-যুগের মেধাবী মানুষদের টানে। আজকে মুক্তবাজার অর্থনীতির টানে খুব জোর। আজ টাকাকে আমরা ঈশ্বরের জায়গায় বসিয়েছি। বৈষয়িক সাফল্যকে একমাত্র মোক্ষ করেছি। টাকার সহযোগ ছাড়া আজ কোনো মানুষকে দিয়ে কিছু করানো যাচ্ছে না। টাকা এখন সুখের একমাত্র মাপকাঠি, মর্যাদার মানদণ্ড, জীবনে বাঁচার এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার উপায়। মানবজীবনের সমস্ত মহিমা আর গৌরব আজ তুচ্ছ অর্থোপার্জনের পায়ের ওপর অশ্রুপাত করছে। আজকে প্রযুক্তিগত উন্নতির মাধ্যমে পুঁজিবাদের যে-অবিশ্বাস্য বিকাশ ঘটেছে তাতে শুধুমাত্র টাকা আর বৈষয়িক ভোগসুখের দিকে মানুষের সমস্ত উৎসাহকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। মানুষের হৃদয় এবং তার অনুভূতিময় চর্চা বেদনাদায়কভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। অথচ বৈষয়িক সমৃদ্ধির মতো এ-ও একইরকম দরকার। এ ঘটছে পৃথিবীর সবখানে। ফলে একটা রোবট-মানুষের জগৎ গড়ে উঠছে পৃথিবী জুড়ে—ভোগসর্বস্ব, চিন্তাহীন, মানবিক অনুভূতিশূন্য একদল পশুসুলভ যান্ত্রিক মানুষের জগৎ।

এই মুহূর্তে আমাদের এই কার্যক্রম জাতীয় জীবনে নিশ্চয়ই কমবেশি প্রভাব ফেলবে কিন্তু বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই শ্রেয়োবোধের ধারা কতটা ব্যাপক প্রভাব রাখতে পারবে, আমার তাতে কিছু সংশয় আছে। আমাদের প্রধান সমস্যা : আমরা একটা বৈরী পৃথিবীর বিরুদ্ধে কাজ করছি। আমাদের প্রতিপক্ষ দানবীয় রকমে

ক্ষমতাশালী। এই মুহূর্তে আমাদের তাই লক্ষ্যযোগ্য সাফল্য না-ও হতে পারে। তার মানে এই নয়, সুসময় নয় বলেই পৃথিবীজুড়ে আমাদের এইসব সুকুমারবৃত্তির চর্চা থামিয়ে দিতে হবে। থামবে তো না-ই, বরং একে আরও বাড়াতে হবে। এই দুঃসময়ে শ্রেয়োবোধ আমাদের আরও বেশি দরকার। মানবসভ্যতার অস্তিত্ব আর অগ্রযাত্রার জন্যে এ আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিপার্শ্ব বৈরী হয়েছে বলেই এ আরও দরকার। মানুষের হৃদয়ানুভূতিই গোটা পৃথিবীটাকে ধারণ করে রেখেছে। এর চর্চা যেদিন ধ্বংস হবে সেদিন মানবসভ্যতারই পতন ঘটবে। যদি কখনো তা ঘটে, তখনো দরকার হবে আমাদের এইসব শ্রেয়োপথের যাত্রীদের। উৎকণ্ঠিত বেদনাবান সেই মানুষেরা শক্তিমান-নেতৃত্বে তখন আবার জগতের হৃদয়কে জাগিয়ে তুলতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু আমরা যদি আজ সুকুমারবৃত্তির চর্চা বন্ধ করে দিই তাহলে সেইসব বেদনাবিদ্ধ মানুষ; যারা এই চর্চার মধ্যে থেকে জন্ম নিয়ে একদিন ঐ যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে—তাদের জন্ম হবে কী করে? মানবিকতার পতনের বিরুদ্ধে আমাদের এই সংশপ্তকেরা আজ কাজ করতে পারে দুভাবে : এক. আজকের এই পতনের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে। দুই. আজকের এই দুর্দিনে সেইসব উন্নত চেতনার প্রদীপকে প্রজ্বলিত রাখার সংগ্রাম করে; যাতে, যখন তাদের নেতৃত্বের প্রয়োজন হবে সেদিন তারা পৃথিবীব্যাপী একটা শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। এই বিষয়টি কেবল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র করবে তা নয়। সারা পৃথিবীতে যত উৎকণ্ঠিত আর বেদনার্ত মানুষ রয়েছে, সবাই মিলে করবে। দেশকালের অন্তহীন দুঃখে তারা জাগ্রত।

মুনন্না : স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের বিষয়টি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কর্মসূচির সাথে যুক্ত ছিল, কিন্তু পরে তা মূল কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত থাকেনি। স্বাস্থ্য-বিষয়ে আপনার এই উপলব্ধি থেকে আপনি কি কেন্দ্রের কার্যক্রমের সাথে একে যুক্ত করবেন?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : যুক্ত করতে পারব কি-না জানি না। এই প্রসঙ্গে আবারও সেই নেতৃত্বের বিষয়টি চলে আসে। আমার সাথে এমন একজনও কর্মঠ মানুষ আমি পাইনি, যে তার শক্তি আর আত্মোৎসর্গ দিয়ে এই কর্মসূচি সফল করতে এগিয়ে আসবে। [এই প্রসঙ্গে স্যার আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন :] তোমরা কি কর্মঠ মানুষ, তুমি নিজে কী? তুমি কি আসবে এই কর্মসূচি সফল করতে? [আমি নিরুপায় নিকৃতিহীন সেই প্রশ্নকে উপেক্ষা করতে না-পেরে প্রতিবারের মতো সত্যহীন প্রতিশ্রুতি দিই। আলোকিত মানুষ নির্মাণের স্বপ্নদ্রষ্টা আমার ভেতরের অন্ধকারকে ঠিকই দেখতে পান আর সেই কারণেই বিষণ্নকণ্ঠে বলেন :] তুমি আসবে না আমি জানি। হয়তো আসতে পারবেও না। তুমি নিজে, তোমার পরিপার্শ্ব এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। তুমি হয়তো আর্কিটেক্ট হওয়ার জন্যে, টাকা উপার্জনের জন্যে পরিশ্রম আর শক্তি ব্যয় করবে। কিন্তু সেটা তো একজন

ঘানি-টানা নিরুপায় মানুষের শক্তি, একজন ফাঁদে-পড়া মেরুদণ্ডহীনের কাজ—নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে শ্রম দিতেই যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেই, মানুষের দুটো দিক আছে। মানুষ চাকরি-বাকরি করে, খায়-দায়, বাড়িঘর বানায়-ব্যালান্স করে—এটা তার একটা দিক। কিন্তু এসব করার পরও তার কিছু শক্তি বেঁচে যায়; এ দিয়ে সে গড়ে তোলে সমাজ, সংগঠন, রাষ্ট্র। ওগুলোর ভেতর দিয়ে সে নিজের উচ্চতর বিকাশ আর সমৃদ্ধি অর্জন করে। আমাদের এই বাড়তি শক্তিটা ভারি কম। তাই আমরা সংগঠন, সমাজ বা রাষ্ট্রকে তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছি। রাষ্ট্রকে আমরা আজও সুস্থিরই করতে পারিনি। এজন্যেই জীবনের উচ্চতর সার্থকতা অর্জনে আমরা তো ব্যর্থ হয়েইছি, সাধারণভাবে টিকে থাকাও আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে রয়েছে।

বাড়তি শক্তিওয়ালা মানুষ আমাদের সমাজে খুবই কম। কী করে গড়ে উঠবে সংগঠন, রাষ্ট্র বা জাতি? সেই শক্তিমান মানুষদের পাইনি বলেই আজকে কেন্দ্র বিপন্ন হয়ে রয়েছে। কেন্দ্রের জন্যে বেঁচে থাকা তাই আমার জন্যে আজও প্রায় বাধ্যতামূলক। অনেকের মুখেই এক প্রশ্ন : আপনার উত্তরাধিকারী কোথায়? আমি বলি : নেই, It is big gap, unsurmountable. উত্তরাধিকারীর অভাবে এদেশে সংগঠন ধ্বংস হয়ে যায়। কিছু মানুষের মধ্যে সেই বাড়তি শক্তিটুকু থাকে; যা দিয়ে তারা সংগঠন বানায়। পরের মানুষেরা এসে তাকে একটু একটু করে বিক্রি করে শেষ করে দেয়। আমাদের সমাজে সবাই তো শুধু প্রার্থী।

সেদিন কেন্দ্রে করুণাময় গোস্বামী টপ্পার ওপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, আমরা সকলেই উপভোগ করছি, এমন সময় এক ছেলে বলে উঠল, 'স্যার, আপনার কথা শুনলাম, কিন্তু মন ভরল না।' আমি বললাম, 'তুমি পারতে টপ্পার ওপর এভাবে বক্তৃতা করতে? পারতে সবার মন ভরাতে? কেবল টপ্পা না, পৃথিবীর কোনো বিষয়ের ওপর, এমনকি তোমার নিজের একান্ত বিষয়ের ওপরও কি তুমি উপস্থিত সকলের মন ভরাতে পারবে? তবে এত চাও কেন?' কিছু দিতে পারবে না, কেবল বিরতিহীনভাবে চাইবে। কী এটা? কেন এত ভিক্ষুক আমাদের চারপাশে? কেন অন্যদের কাছে এত প্রত্যাশা, কেন ভিখারির মতোন শুধু চাওয়া? আরেকজন এসে সব করে দিয়ে যাবে আর আমি শুধু সর খাব। কিছুই দেব না। এ কী?

মুনন্না : আপনার কি মনে হয় না স্বাস্থ্যবান, শক্তিমান, আলোকিত এইসব মানুষ নির্মাণের দায়িত্ব নেওয়া রাষ্ট্রের চেয়ে সংগঠনের পক্ষেই সহজ?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : রাষ্ট্র জাতির বৃহত্তম এবং সবচেয়ে অযোগ্য সংগঠন। এই অযোগ্যতার একটা কারণ এর বিশালতা। এটা কেবল আমাদের দেশ নয়; চীন, রাশিয়া, জাপান, আমেরিকা, ইংল্যান্ড—সবখানেই তাই। এই অযোগ্যতার আর-একটা কারণ, রাষ্ট্রে বাস্তব মালিক বলে কেউ থাকে না, রাষ্ট্রের মূল যে-মালিক

তার নাম 'মূল্যবোধ'। আমাদের মতো মূল্যবোধ-খোয়ানো দেশে আজ মূল্যবোধের শক্তি দিয়ে রাষ্ট্রের কর্মচারীদের পক্ষে ন্যায়নীতিকে সমুন্নত রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এরজন্যে কঠোরতম জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকা দরকার। উন্নত দেশগুলোতেও তা থাকে। কিন্তু যে-দেশে মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এমন ধস নেমেছে, রাষ্ট্র অরাজক হয়ে গেছে, সেখানে ঐ জবাবদিহিতাকে নিশ্চিত করবে কে?

আত্মোৎসর্গের শক্তি নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে মানুষ খুব বেশিদিন কাজ করতে পারে না। এটা সম্ভব বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে। চীন ও রাশিয়ায় বিপ্লবের দিনগুলোতে তা সম্ভব ছিল। ঐ যুগে মানুষের মূল্যবোধ খুব জ্বলন্ত অবস্থায় থাকে বলে এটা সম্ভব হয়। কিন্তু পরে তা দিয়ে আর চলে না, বিশেষ করে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় যখন রাষ্ট্র পুরোপুরি একটা শোষণকারী ও অত্যাচারী সংস্থায় পরিণত হয়েছে। আমি মনে করি আমাদের জাতির প্রধানতম শত্রু আর নির্যাতনকারী সংস্থা আজ রাষ্ট্র। কাজেই সারাদেশের সবখানে ছোটবড় আত্মোৎসর্গিত মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলোই আজ আমাদের ভরসা।

মুননা : এতদিন ধরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের হাজার হাজার ছেলেমেয়ের এই সম্মিলন কি ব্যর্থ? তারা কী দিতে পারে আজ?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের কয়েকটা লাইন মনে পড়ে :

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অপার মহিমা?

এত মানুষের এত চেষ্টা, এ কি পুরোপুরি ব্যর্থ হতে পারে? এখানে এত হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আসছে, যে-বয়সে তারা আসছে সে-সময়টাও তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়; এই সময় যে-প্রেরণার বীজ তাদের মনে দানা বাঁধছে, একদিন তা গাছ হয়ে জন্মাবে। গাছ অরণ্য হবে। এই তো প্রত্যাশিত। এ একেবারে মিথ্যা হবে কী করে?

মুননা : ঢাকা কেন্দ্রের সদস্যদের বিরুদ্ধে জনবিচ্ছিন্ন হবার এবং উন্নাসিক হবার অভিযোগ রয়েছে। এর কারণ কী?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : অল্পজ্ঞান সবসময়েই ক্ষতিকর। বিচ্ছিন্ন হবার কারণ হল আমরা কলেজের দু-বছরে তাদের মাত্র তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা বই পড়াই। 'উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে, তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।' মধ্যম কে? সে আসলে অধম, কিন্তু পরে আছে উত্তমের বেশ। একটা গল্প আছে—একটা শেয়াল পড়ে গিয়েছিল নীলের চৌবাচ্চায়, তাতে নীল লেগে তার রং বদলে যায়। তার চারপাশের শেয়ালেরা তাকে আর চিনতে পারে না। সবাই ভাবে এ নিশ্চয়ই আল-বোগদাদি বা আল-কান্দাহারি কেউ হবে। আমাদের চেয়ে বড় কেউ। সবাই তাকে সম্মান করে তাদের রাজা বানিয়ে বসল। রাজা হয়ে তো সেকালে তার পা মাটিতে পড়তে চায় না। কিন্তু একদিন ঘটল দুর্দৈব। হঠাৎ আকাশ ছাপিয়ে এল মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টি হতেই তার সব রঙ ধুয়েমুছে গেল, আসল শেয়ালের চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল। শেয়ালরা চিৎকার করে উঠল : আরে এ দেখি আমাদের ঐ অমুক কুকুর। বের কর ভণ্ডটাকে এই দেশ থেকে। যোগ্যতা সামান্য বলেই উত্তমরূপী অধমেরা জনবিচ্ছিন্ন হয়, উন্নাসিক হয়। পঁয়ত্রিশটা বই পড়ে বলে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাঁচশো বই পড়লে আর জনবিচ্ছিন্ন থাকত না। একহাজার বই পড়লে সে মনুষ্যত্বের পায়ের নিচে নিজেকে বিলিয়ে দিত। মানুষের অধিক মানুষ হত। তখন সে জানত জীবন কী, মানবতা কী, মানবতার সত্যিকার বেদনা কী। তখন সে কী করে জনবিচ্ছিন্ন হত?

সেনাবাহিনীর মধ্যে সর্বোচ্চ পদটির নাম 'জেনারেল' (সাধারণ) কেন? যে সবচেয়ে বড় তার নাম কেন হবে 'সাধারণ'? কথাটা তো স্ববিরোধী। কিন্তু আসলে তা নয়। একটা বাহিনীতে লেফটেন্যান্ট কে? সেই মানুষটিই লেফটেন্যান্ট, যাঁর অধীনে থাকে তার অল্পকিছু অনুগত সৈন্য আর জমাদার, সুবেদার মেজর এবং এদের সবার মিলিত বিদ্যা ও প্রশিক্ষণ তার ভেতর রয়েছে। ক্যাপ্টেন কে? যাঁর মধ্যে লেফটেন্যান্টের ও তার অনুগত সৈন্যদের বিদ্যা রয়েছে। মেজর কে? যাঁর মধ্যে আছে ক্যাপ্টেন, লেফটেন্যান্ট আর অন্যদের বিদ্যা। কর্নেল কে? যাঁর মধ্যে আছে মেজর, ক্যাপ্টেন, লেফটেন্যান্ট আর অন্যদের বিদ্যা। ব্রিগেডিয়ার কে? যার মধ্যে লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন, মেজর, কর্নেল রয়েছে। এবারে জেনারেল কে? জেনারেল তিনিই; যাঁর মধ্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল, মেজর জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার, কর্নেল, মেজর, লেফটেন্যান্ট—মানে পুরো সেনাবাহিনীটাই রয়েছে। সকলের সবকিছুই তাঁর ভেতরে, তার বাইরে কিছুই নেই। সব স্তরকে ধারণ করতে পেরেছে বলেই সে সাধারণ (কমন), সে জেনারেল; নইলে ঐরকম সামরিক পোশাক পরা, ইয়া গোঁফওয়ালা নানা রঙের চিহ্ন, 'স্টার'-পরা ভয়াবহ মানুষটির

নাম জেনারেল বা 'সাধারণ' হবে কেন?

মানুষ যখন বড় হয় তখন সে Common হয়ে যায়, সকলের ভেতরে সঞ্চারিত হয়। যত ছোট থাকে তত বিচ্ছিন্ন থাকে। কলেজ-কর্মসূচিতে এটা একটা বড় সমস্যা। এর আগে এমন পরিবেশ ওরা কোথাও পায়নি। ফলে একদিকে অল্পজ্ঞান, অন্যদিকে এই হঠাৎ যোগাযোগ—এই দুইয়ে মিলে এদের মাথা যায় বিগড়ে। তবে এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। আর এই অবস্থাটাও বেশিদিন চলে না। আমাদের এখানকার অধিকাংশ ছেলেমেয়ে সরল আর স্বাপ্নিক প্রকৃতির। এরা চারপাশ থেকে গ্রহণ করে। আমার ধারণা, এদের অনেকেই একসময় কল্যাণকর মানুষ হিশেবে দেখা দেবে।

মুননা : নিজে আলোকিত হওয়া এবং সমাজকে আলোকিত করা কি একই বিষয়?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : অবশ্যই। একজন আলোকিত মানুষ কোনো এলাকায় থাকলে তাকে ঘিরে বেশকিছু গুণসম্পন্ন মানুষ জন্ম নিতে শুরু করে। দই বানাতে হলে দইয়ের বীজ দরকার হয়। হাঁড়ির ভেতর সেটা থাকলে তার চারপাশের সব দুধ দই হয়ে যায়। আমি যখন বিভিন্ন উপজেলায় কেন্দ্রের শাখা খুলতে যাই তখন সেখানকার নির্বাহী অফিসারদের বলি : একটা বীজ দিন—জানি সবকিছুই মরে গেছে—এই বৈরী পরিবেশে মনুষ্যত্বের বীজ নেই আর কোথাও—তবু যদি কেউ এখনো বেঁচে থাকে আপনার এলাকায়—মুমূর্ষু অবস্থাতেও যদি বেঁচে থাকে, তাঁকে দিন। এরকম একজনকে পেলেও হবে। চারপাশের মানুষদের ভেতর তাকে রাখতে পারলে আপনার এলাকার সব দুধ দই হয়ে যাবে। তবু মনে রাখতে হবে, শুধু বীজ হলেই হবে না—তাঁকে হতে হবে বীজের মতো বীজ—সৎ, সংস্কৃতিমনা আর উদ্যমশীল। 'ইনি একজন আলোকিত মানুষ, ইনি ঘরে শুয়ে শুয়ে শুধু লেজ নাড়েন'—এমন হলে চলবে না। তাঁকে নেতৃত্ব দিতে হবে। অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। আলোকিত মানুষ মানে সক্রিয় মানুষ।

মুননা : এই নেতৃত্বের জন্যে তো কাউকে দীক্ষিত করছেন না, তাহলে তার কীভাবে আলোকায়ন ঘটবে?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : নেতার তো দীক্ষা লাগে না। সে স্বদীক্ষিত। প্রশিক্ষণ লাগে সচিবের। নেতা জন্ম নেয় বেদনা থেকে। ভেতরকার জন্মান্ধ আবেগ আর হিংস্র-আক্রমণে তার পথের রূপরেখাগুলো সে তৈরি করে নেয়। আমরা তার ভেতর ঐ বেদনাটা জাগানোর চেষ্টা করি। জওহরলাল নেহেরু যখন বিলেত থেকে দেশে এলেন তখন তাঁর মধ্যে নেতার প্রশিক্ষণ ছিল না। রাজনীতির কুটিল গলিঘুঁজির কিছুই জানতেন না। কেবল একটা জিনিশ ছিল তাঁর মধ্যে—একটা হৃদয়, আর বেদনার্ত হবার শক্তি। এর ফলে যখন তিনি ট্রেনে করে সারা

ভারতবর্ষ ঘুরলেন, দেশের সঙ্গে যোগ তৈরি হল, তিনি জেগে উঠলেন।

কখন এই আগুন কার ভেতর জ্বলে উঠবে কেউ বলতে পারে না। একটা মানুষের আলোকায়ন প্রক্রিয়া সারাজীবন ধরে চলে। যে-কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তা জ্বলে উঠতে পারে। সম্রাট অশোক যেমন কলিঙ্গ-যুদ্ধের সময় মানুষের বেদনা দেখে কেঁদে উঠেছিলেন, তেমনিভাবে। এটা হঠাৎ ঘটে না, পৃথিবীতে হঠাৎ কোনোকিছুই হয় না। ঐ হৃদয় তার ভেতরেই ছিল, দীর্ঘদিন ধরে নিজের অজান্তেই প্রস্তুত হচ্ছিল। একদিন তা প্রজ্বলিত হয়েছে।

মুননা : এই হৃদয় মানুষ কী করে ধারণ করবে? এটা কি তার জন্মগত বৈশিষ্ট্য?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : অনেকটা জন্মগত, অনেকটা সাংস্কৃতিক। সবার মধ্যে সেই সম্ভাবনা সমানভাবে থাকে না। যেমন আলোকিত মানুষ হতে হলে তাকে সৎমানুষ হতে হবে, তার ভেতর একটা শ্রেয়োমুখী মানুষের বোধ থাকতে হবে, অন্যের দুঃখে বেদনার্ত হবার বিমূর্ত গুণাবলি থাকতে হবে। তার সাথে কবিতা বা বই বা গান বা উচ্চতর সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং কর্তব্যের যোগাযোগ হলে সে সেই সৌন্দর্য, দায়িত্ব ও প্রেমের স্পর্শে শক্তিমান ও বেদনাবান হয়ে উঠবে। আবার একই সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটতে হবে বাস্তবতার সঙ্গে। একজন মানুষ যদি শুধু অবাস্তব পৃথিবীতে বসে স্বপ্ন দেখে আর ফুলের মতো ফুটে থাকে—তবে সে আলোকিত হবে না। আলো তো একটা শক্তি। আলোর ভেতরটাতে থাকে আগুন। সে বাস্তব, সে দাহ দেয়। আগুন থেকে জন্ম নেয় আলো। সুতরাং যার মধ্যে আগুন নেই তার মধ্যে আলো থাকতে পারে না। তুমি দেখবে, যখন কোনো মহাপুরুষের ছবি আঁকা হয় তখন প্রায়ই তাঁর মাথার চারপাশে একটা আলোর বলয় আঁকা হয়। কেন? বাস্তবে তাঁর মাথার চারপাশে কি ঐরকম বলয় ছিল? না। তবু দেওয়া হয় একনো যে ইনি যখন বেঁচেছিলেন তখন তাঁর সামনে দাঁড়ালে মানুষ তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমনি জ্যোতির্ময় আলোময় কিছু অনুভব করত। তারা তাঁর ভেতরকার মনুষ্যত্বের দহন ও প্রজ্বলনকে অনুভূতিময় মানবিক বিভা হয়ে বিকিরিত হতে দেখত। কাজেই ঐ আগুন তো জন্মসূত্রে কিছুটা থাকতেই হয় ভেতরে!

কেন কিছু মানুষ অসাধ্য সাধন করে পৃথিবীতে? শক্তির সঙ্গে স্বপ্ন যোগ হয় বলে। এই দুইয়ে মিলে তারা জ্বলে ওঠে। একটা তীব্র জন্মান্ধ আত্মঘাতী আকুতি তাদের তখন প্রজ্বলিত করে। তখন এদের বলে সংশপ্তক। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তখন এরা হয়ে পড়ে দুর্জয়। যুদ্ধের মাঠে যখন দেখা যায় শত্রুপক্ষের দুর্ধর্ষ ট্যাংকবহর আকাশ মাটি ছাপিয়ে এগিয়ে আসছে, তাদের সরাসরি প্রতিহত করতে না-পারলে তারা দেশ দখল করে নেবে, সেই সংকটকালে জেনারেল সৈন্যদের অনেক সময় আহ্বান করেন। বলেন : 'এই দুর্জয় ট্যাংকবহর আমাদের দেশকে পদানত করতে এগিয়ে আসছে। একে ধ্বংস করার একটাই উপায়—বুকে মাইন

বেঁধে ঐ ট্যাংকের নিচে শুয়ে পড়া। তোমরা কারা কারা এতে আগ্রহী হাত তোলো।' প্রায় সুনিয়মিতভাবেই দেখা যায় এই আহ্বানের উত্তরে ৪ থেকে ৬ ভাগ লোক বুকে মাইন বাঁধার জন্য হাত তোলে। পৃথিবীতে এই ৪ থেকে ৬ ভাগ মানুষ হল সংশপ্তক, সুইসাইডার। এই সুইসাইডাররা শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে আছে তা নয়; শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসাবাণিজ্য, অভিযাত্রা—মানবজীবনের সবখানে আছে। এদের শক্তিশালী আর জাগ্রত করে তুলতে পারা মানেই একটা জাতিকে বড় করে তোলা।

মুনসা : দেশের যে-কোনো সমস্যায়, কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক ইস্যুতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কোনো মতামত দেয় না, মন্তব্য করে না, প্রচারণায় যায় না। কেন্দ্রের ছেলেমেয়েরাও এসব নিয়ে কথা বলে না। এটা কেন?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : এর কারণ, কেন্দ্র কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংগঠন নয়। এটা একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। জীবন ও পৃথিবীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণই এর অন্বিষ্ট। এজন্যেই তার নিজের কোনো মতাদর্শ নেই। কোনো এক বা একাধিক মতের দাসত্বও নেই এখানে। বরং আছে উল্টো ব্যাপার। আমরা বলি, আমাদের শক্তিমান মতপার্থক্যই আমাদের শক্তি। আজ আমাদের ছেলেমেয়েরা বাস্তব পৃথিবী নিয়ে কথা বলে না, কারণ এখন তারা রয়েছে প্রস্তুতির পর্বে। কিন্তু একসময় তারা বলবে, কারণ এইসব দার্শনিক বীক্ষণের ভেতর দিয়ে তারা তো বড় হচ্ছে নৈতিক সংগ্রামের জন্যেই। আমরা তাদের এই বাস্তবতাকে বোঝার মতো হৃদয় তৈরি করে দিচ্ছি এখানে, এই হৃদয়ের শক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছি। এখন যদি এর সাথে বাস্তবজীবনের সংগ্রামটাও করিয়ে দিই তবে তা কি একটু বেশি আগে হয়ে যাবে না? তা কি শিশুশ্রমের পর্যায়ে পড়বে না? আমরা তাদের অন্তর্দৃশক্তিকে যতটা বাড়িয়ে দিই, এ নিয়েও কেউ যদি চারপাশের মানুষের জন্য কিছু না করে, তাহলে বুঝতে হবে তার চোখ অন্ধ, হৃদয় বধির। সে কোনোভাবেই কিছু করত না। আমরা বই-পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কিছু স্বপ্নকে তাদের ভেতর জাগিয়ে দিচ্ছি, একটা ভালো কিছুর স্বপ্ন—ছোট আকারে হলেও। এইটুকুই আমরা পারি। তাদের প্রস্তুত করে তোলাই আমাদের পক্ষে সম্ভব, যুদ্ধ করানো নয়। অক্সফোর্ড বা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় নিজেরা যুদ্ধ করে না, যোদ্ধাদের প্রস্তুত করে। পরে তারা বাইরে এসে জাতির জন্য যুদ্ধ করে। আমরাও তাই করি। খুব উদারভাবেই করি। আমাদের প্রত্যেকের মতাদর্শ ভিন্ন, বেদনা ভিন্ন, যে-যার বেদনা অনুযায়ী জীবনের প্রত্যুত্তর দেবে। মানুষ হিশেবে তার শক্তিবৃদ্ধিই আমরা কেবল করে দিতে পারি। বাকিটা তার নিজের কর্তব্য।

মুনসা : কেন্দ্র কি কোথাও এমন কিছু করছে যা এখানকার সভ্যদের জন্য ক্ষতিকর?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : ঠিক জানি না। এটা তো একটা প্রক্রিয়া। কারও কারও ক্ষেত্রে হয়তো সফল হবে, কারও ক্ষেত্রে ব্যর্থ হবে। আমি নিজে তো ব্যর্থ হবই—

আমার একদিকে শিল্প, একদিকে সমাজ। কখনো লিখতে ইচ্ছে করে, কখনো টেলিভিশনে কাজ করতে ইচ্ছে করে, কখনো পত্রিকা বের করতে, কখনো শিক্ষকতা বা বক্তৃতা করতে, আবার কখনো সংগঠন বানাতে—নানারকম ইচ্ছার ঢেউয়ে কেবলি খাবি খাচ্ছি। কিন্তু এটা তো সত্যি, এই কেন্দ্রের কিছু শক্তি বেড়েছে আগের চেয়ে, কিছু স্থাপ্নিক তৈরি হয়েছে।

ভালো ছেলেমেয়েরাও কেন নিঃসঙ্গ হয়ে যায় এখানে থাকার জন্যে? কেন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে? কেউ ভাবতে পারেন, এই বিচ্ছিন্নতায় তাদের ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু এর আর-একটি দিক রয়েছে। তারা যদি চিত্তের সমৃদ্ধির কারণে নিঃসঙ্গ হয় তবে বুঝতে হবে তাদের অগ্রসরমনস্কতাই তাদের একাকী করেছে। তারা ভাবনাচিন্তার দিক থেকে অন্যদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলেই তারা একাকী। এই একাকী হওয়া মানে শক্তিমান হওয়া। তারা যদি আগের চিন্তাভাবনার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে তো তারা বিচ্ছিন্ন হত না, চারপাশের ভেদাভেদহীন মানুষদের সঙ্গে মিলেমিশে কাটিয়ে দিতে পারত। তাদের অগ্রসরতাই তাদের চারপাশের ভোগলিপ্ত স্থূল মানুষদের সঙ্গে বাস করতে দিচ্ছে না। আবার এত শক্তিও হয়তো তাদের অনেকের নেই; যাতে কী করে সবার সাথে থেকেও তাদের ওপরে জেগে থাকা যায় তা এখনো বুঝতে পারা যায়। তাই হয়তো তাদের দোদুল্যমানতা। তার মানে এই নয় যে কখনোই সেই শক্তিকে তারা ধারণ করবে না। হয়তো এখন পারছে না, অপরিণতির কারণে পথ খুঁজছে, হয়তো চল্লিশ বছরে গিয়ে পারবে। তারা সেদিন সবার ভেতর থেকেও সবাইকে ছাড়িয়ে বাঁচতে পারবে। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে সক্রেটিসের দর্শন পরিণতি পেয়েছিল, এর পরেই কেবল তিনি শিষ্যদের কাছে তা তুলে ধরেছিলেন। এর আগের ঐ দীর্ঘ সময়টি ছিল তাঁর প্রস্তুতির যুগ। সুতরাং এত দ্রুত শেষকথা বলা যায় না। কিন্তু এই-যে আকুতি জন্মাচ্ছে, স্বপ্ন জন্মাচ্ছে—এটাই তো একটা অর্জন।

আমি বিশ্বাস করি, মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। মানুষ যা স্বপ্ন দেখে—মানুষ তাই হয়ে যায়। স্বপ্ন থাকলেই মানুষের মধ্যে স্বপ্নের সমান হবার উদ্যম আসে। আমরা অন্তত এখানে এই স্বপ্নটা তাদের দিই, নইলে তুমি একদিন পর এখানে এসেছ কেন? তোমরা যদি একদিন এখানে না-আসতে, এই প্রশ্নগুলো তোমার মাথায় হয়তো জাগতই না। সুতরাং স্বপ্নের অংশটাকে তৈরি করে দেওয়াটাও একটা কাজ। এখন তোমরা চেষ্টা করো এই স্বপ্নকে কীভাবে কার্যকর করা যায়। শরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চের যন্ত্রণায় বাল্মিকীর হৃদয়ের মতো আমরা তোমাদের বেদনাবিদ্ধ করে দিচ্ছি, তোমরা দেখ সেই মহৎ বেদনাকে কোন মহাকাব্যে পরিণত করতে পারো। কোথায় এই হৃদয় ব্যবহৃত হবে এটাও একটা ভাববার বিষয়। ওটা তো আমরা

করে দিতে পারব না।

একবার একজন মাদ্রাসার মেধাবী ছাত্র এসেছিল আমাদের কর্মসূচিতে। সে যখন চলে যাচ্ছে তখন জানতে চাইলাম, "তুমি এখানকার অর্জনকে কীভাবে কাজে লাগাবে?" সে বলল, "আমি ধর্মকে যৌক্তিক (র‍্যাশনাল) করার জন্য যুদ্ধ করব।" সে এখন কোথায় দূরদূরান্তে চলে গেছে, কেমন আছে, কিছুই জানি না। হয়তো ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের সাথে ঝগড়া করে তার দিন কাটছে, কে বলবে? এমনি কত ভালো ছেলেমেয়েরা এসেছে, তারা-যে কিছুই করছে না, পরিপার্শ্বকে কিছুই দেবে না—কে বলতে পারে? এদের সংখ্যা তো একজন দুজন নয়।

[সাক্ষাৎকার পর্ব এখানেই শেষ হয়েছে, সায়ীদ স্যার তারপরও আরও অনেক স্বপ্নের কথা বলেছেন, আলোকায়নের পথে আরও অনেক পরিকল্পনার কথা বলেছেন। আলোকের মতোই গতিময়, অন্তহীন, দীপ্ত, উদ্ভাসিত তার স্বপ্ন—একটা সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য।]

১৯৯৯

সাহিত্যজীবন ও শিল্প

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন ॥ আবদুল মান্নান সৈয়দ

আ. মা. সৈয়দ : আমরা কেউই আসলে একজায়গায় থেমে নেই। আমার নিজের জায়গাও পাল্টে গেছে। যা হোক, আমি জানি যে, বিশ-পঁচিশ বছর আগে থেকেই আপনার লেখার নানারকম পরিকল্পনা ছিল। যে-স্মৃতিমূলক লেখাগুলো আপনি এখন লিখছেন, তা আত্মজৈবনিক হলেও আপনার বহির্মুখী স্বভাবের জন্য তার মধ্যে একটা সামগ্রিকতা, বহুমুখিতা আছে। আপনার আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলোর মধ্যে আপনি একটা নতুন ধারা সৃষ্টি করছেন—যা একেবারেই আপনার নিজস্ব। এরকম একটি বই এই মুহূর্তে আমার হাতের সামনে আছে—'নিষ্ফলা মাঠের কৃষক'। আপনার শিক্ষকজীবনের ইতিবৃত্ত এতে আছে। আমি জানি, আপনি একজন সফল শিক্ষক। কিন্তু আপনার বইয়ের নাম 'নিষ্ফলা মাঠের কৃষক' কেন? বাঙালিরা এমনিতেই একটু নেতিবাদী বলে কুখ্যাত। সফল শিক্ষক হয়ে কেন 'নিষ্ফলা মাঠের কৃষক' লিখতে গেলেন?

আ. আ. সায়ীদ : কৃষক নিষ্ফলা এ-কথা কিন্তু আমি বলিনি। আমি বলেছি মাঠটা ছিল নিষ্ফলা। কৃষক হিশেবে সাধ্যমতো আমি আমার কাজ করেছি। কিন্তু মাঠ ঊষর হওয়ায় ফসলটা ফলেনি। শিক্ষাঙ্গনের নৈরাজ্যের কারণে (আমার মনে হয়েছিল), যে-কর্ষণে আমি যে-ফসলের আশা করেছিলাম তা ব্যর্থ হয়েছে। সেজন্যই পরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তুলে তার প্রতিকারের চেষ্টা করেছি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে আমি যা করতে পারিনি তার কিছু অংশ কেন্দ্রের মাধ্যমে সারাদেশে করতে চেষ্টা করছি।

[আংশিক]

২০০২

কেন্দ্রের টুকিটাকি

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন : সিরাজুল ইসলাম কাদির

প্রশ্ন : সাহিত্য যেখানে সর্বজনীন, সেখানে কেন্দ্রের নাম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কেন হল?

উত্তর : আসলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নামটি আমাদের উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে খানিকটা বিভ্রান্তিকর। শুধু সাহিত্য নয়, আমাদের এখানে জ্ঞানের বহুমুখী বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে-ওঠার সুযোগ তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য। সাহিত্যের অঙ্গনে সুযোগ্য মানুষ গড়ে-তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এই কেন্দ্র শুরু করেছিলাম। তাই এর নাম দিয়েছিলাম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। এখন এর লক্ষ্য বিস্তৃততর হয়েছে। এখন আমরা জাতির প্রতিটি অঙ্গনের জন্য সম্পন্ন মানুষ গড়ে তুলতে চাই।

প্রশ্ন : কেন্দ্র সমাজের 'পশ'-শ্রেণীর কবলিত হচ্ছে কি?

উত্তর : এটা ভুল ধারণা। আমাদের সদস্যদের বড় অংশটাই গরিব। তাই এখানে পড়ার জন্যে কারো কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয় না। আমাদের কেন্দ্রের পরিচ্ছন্নতা পরিপাটা দেখে একে অনেকের কাছে পশ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ঝকঝকে তকতকে এই চেহারাটা আমরা অটুট রাখতে চেষ্টা করি। এতে খরচও নেই তেমন। সামান্য রুচি এবং যত্ন থাকলেই এটা অর্জন করা যায়। অথচ এ-থেকে যা পাওয়া যায় তার দাম অনেক। আমরা চাই একটা ভালো পরিবেশে ছেলেমেয়েরা গড়ে উঠুক; যাতে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো জায়গায় কোনো অবস্থায় নিজেদের তারা ক্ষুদ্র বা ছোট মনে না করে।

প্রশ্ন : পাঠাগার-আন্দোলনের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কেন গড়ে তুললেন?

উত্তর : পাঠাগার-আন্দোলনই আমাদের আসল লক্ষ্য। আমরা এখন যা করছি তা আসলে পাঠাগার-আন্দোলনের প্রস্তুতি।

প্রশ্ন : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র শুধু রাজধানীতে প্রতিষ্ঠা করলেই কি এর লক্ষ্য অর্জিত হবে?

উত্তর : সারাদেশে যাতে এরকম কেন্দ্র গড়ে ওঠে, আমরা তার উদ্যোগ নিচ্ছি। আগামী তিন বছরে আটাশটি শহরে এরকম কেন্দ্র গড়ে-তোলা আমাদের অন্যতম পরিকল্পনা। তবে এখানে একটা কথা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, সারাদেশের ঘরে ঘরে শিক্ষাবিস্তার করা আমাদের শক্তির বাইরে। আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নই। আমরা চাই দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আলোকিত করতে। শক্তিমান মানুষ গড়ে তুলতে। লক্ষ লক্ষ মানুষের নিয়তি আর দুঃখ-মোচনে নেতৃত্ব দিতে পারবে—এমনি সক্রিয় মানুষ।

[আংশিক]

১৯৮২

সর্বাঙ্গীণ জীবন-পরিবেশ

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন : আমান-উদ-দৌলা

প্রশ্ন : কোন্ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আপনি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তোলার চিন্তা করলেন?

উত্তর : সব সমাজেই এমনকিছু মানুষ থাকেন সংখ্যায় যাঁরা অল্প; কিন্তু যাঁদের মধ্যে জ্ঞানের ব্যাপ্তি, মূল্যবোধের বিকাশ, জীবনের উৎকর্ষ, আত্মমর্যাদার মহিমা—এসবের বড়রকম বিকাশ ঘটে। এঁরা সেই ধরনের মানুষ যাঁদের কেনা যায় না, বেচা যায় না, সমাজের তরল স্রোত যাঁদের চারপাশ দিয়ে নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলে; কিন্তু যাঁরা এর মাঝখানে থেকেও প্রবুদ্ধ বৃক্ষের মতো একটা জাতির ভারসাম্য সুস্থিত করে রাখেন। এঁরা তাঁরা; যাঁরা একটা জাতিকে রক্ষা করেন, এগিয়ে নেন, জাতিকে সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখান। এককথায় বড়মানুষ বলতে যা বুঝি এঁরা হলেন তাঁরাই। যে-কোনো উন্নত জাতির মধ্যে যত স্বল্প-সংখ্যাতেই হোক, আমরা এই মানুষদের সন্ধান পাই। সব উন্নত জাতি সম্পর্কে একথা সত্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের জাতির মধ্যে এইসব সমৃদ্ধ মানুষের ঐতিহ্য এখনো গড়ে ওঠেনি। আর গড়ে-ওঠার যা-ও বা কিছু সম্ভাবনা ছিল তা-ও এখন কঠিন হয়ে উঠছে।

ইতোমধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার নিদারুণ অধঃপতন ঘটেছে, কাজেই আমাদের গতানুগতিক স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর থেকে এই মানুষদের জন্ম ঘটবে এমন আশা করা কঠিন। আমাদের পরিবারগুলো উৎকর্ষপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনো গড়ে ওঠেনি। আমাদের সমাজে সেই পরিবার কোথায় যেখান থেকে এই বড়মানুষেরা জন্মগ্রহণ করবেন? দেশের এই সার্বিক অবক্ষয় এবং সম্ভাবনাহীনতার ভেতর সীমিত সংখ্যায় হলেও যাতে শিক্ষিত ও উচ্চমূল্যবোধসম্পন্ন

আত্মোৎসর্গিত এবং পরিপূর্ণ মানুষ বিকশিত হওয়ার পরিবেশ উপহার দেয়া যায়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি। একজন মানুষ যাতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অধ্যয়ন, মূল্যবোধের চর্চা এবং মননসাধনার যা-কিছু শ্রেয় ও মহান তার ভেতর দিয়ে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বসম্পন্ন হয়ে বেড়ে উঠতে পারে—আমরা এখানে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। কাজেই আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি একটি প্রাণহীন, কৃত্রিম, গতানুগতিক প্রতিষ্ঠান নয়; এটি একটি সর্বাঙ্গীণ জীবন-পরিবেশ।

প্রশ্ন : কখন এবং কীভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির সূচনা ঘটালেন?

উত্তর : এই চিন্তাটি প্রথম আমার মনে জাগে ১৯৬৮ সালের দিকে। তখনই কিছু মেধাবী এবং প্রতিভাবান তরুণকে নিয়ে আমি একটি স্বদ্ধিবর্মী চক্র গড়ে তোলার চেষ্টা করি। কিন্তু স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তাতে ছেদ পড়ে। তারপর স্বাধীনতা আসে। আমাদের সামনে এক বিপুল সম্ভাবনার জগৎ উন্মোচিত হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এক সার্বিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে সেই স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে যেতে শুরু করে। কাজেই আবার নতুন করে আমাদের এ-বিষয়ে চিন্তা শুরু করতে হয়।

আমাদের জাতির আজকের এই মর্মান্তিক নৈরাজ্য এবং দুঃখের কারণ হল এই জাতিকে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ্য মানুষ নেই। অক্ষম অকর্মণ্য এবং নিম্নস্তরের মানুষেরা আজ আমাদের জাতীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। জাতীয় দুঃখের অর্থপূর্ণ অবসান এবং সত্যিকার জাতীয় উন্নতি এত ক্ষুদ্র মানুষ দিয়ে সম্ভব নয়, এর জন্য চাই আলোকিত মানুষ। এই ভাবনা থেকে আবার ১৯৮৮ সালে আমরা সমবেত হলাম সেই পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে-তোলার চেষ্টায়—সেইসব মানুষদের, যারা একদিন তাদের যোগ্যতা এবং শক্তি দিয়ে, প্রয়াস এবং আত্মদান দিয়ে এই জাতির নিয়তি পরিবর্তন করতে চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন : বিগত পাঁচবছরে আপনারা আশান্বিত হওয়ার মতো কোনো আশ্বাস লাভ করেছেন কি?

উত্তর : গত পাঁচবছরের অভিজ্ঞতা আমাদের নানাভাবে আশান্বিত করেছে। আমরা দেখেছি চারপাশের অবক্ষয়ী এবং অরাজক পরিবেশের মাঝখানেও মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ মানুষের জন্মের সূচনা হতে পারে। আমাদের কেন্দ্রের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে উন্নতজীবনের জন্যে, মহত্তর আদর্শের জন্যে এবং জীবনের সার্বিক বিকাশের জন্যে যে সত্যিকারের আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি তাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে আশান্বিত।

প্রশ্ন : কেন্দ্রে তরুণদের সমাগম এখনো খুব বেশি নয়। যদি দেশের অধিকাংশ জ্ঞানপিপাসু তরুণ-তরুণী এই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে তাদের পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা দেয়া কি সম্ভব হবে?

উত্তর : দেখুন, দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে আমরা এই কেন্দ্র গড়ে তুলছি। আজ কেন্দ্র যে-পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা একদিনে হয়নি। কেন্দ্রও যেমনি ধীরে-ধীরে গড়ে উঠছে, তেমনি দেশের সম্পন্নতাপিপাসু তরুণ-তরুণীরাও ধীরে-ধীরে এই কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে। যখন তাদের সংখ্যা আরো বাড়বে, কেন্দ্রের সুযোগসুবিধার পরিমাণও হয়তো ততদিনে আরও বেড়ে যাবে। সুতরাং দেশের অধিকাংশ জ্ঞানপিপাসু অনুপ্রাণিত তরুণ-তরুণী যদি কালক্রমে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েও পড়ে, তবে ততদিনে কেন্দ্রেরও হয়তো সেই ব্যাপ্তিকে ধারণ করার সামর্থ্য এসে যাবে; সবাইকে পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা দেয়া সম্ভব হবে।

প্রশ্ন : কেন্দ্র সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ বা সন্দেহ কী যা আপনাদের শুনতে হয়?

উত্তর : কেন্দ্র সম্পর্কে কিছু মহলের সন্দেহ—আমাদের টাকার উৎস কী। যে প্রতিষ্ঠান হাঁস-মুরগি বা গবাদিপশুর উন্নতির জন্য কার্যক্রম চালায় তার অর্থের উৎস নিয়ে কিন্তু কেউ প্রশ্ন করে না। কিন্তু আমরা যারা মানুষের উন্নতি বা বিকাশ নিয়ে কাজ করি তাদের অর্থের উৎস নিয়ে করে। আমরা চিন্তা করি, ভাবি, নতুন পৃথিবী নির্মাণের কথা বলি বলেই এ প্রশ্ন করে। যা হোক এ-পর্যন্ত আমরা যেসব সূত্র থেকে টাকা পেয়েছি সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত ডোনেশন, কিছু কিছু সরকারি সূত্র এবং বিভিন্ন দেশীয় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাওয়া অর্থানুকূল্য। এই অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে যে-পরিশ্রম আমাদের করতে হয় তা অমানুষিক। আমাদের প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত যে-অর্থানুকূল্য পেয়েছে তার শতকরা ৯৫ ভাগ দেশের ভেতর থেকে প্রাপ্ত। বৈদেশিক সূত্র থেকে সামান্য কিছু বই ছাড়া তেমন কিছু পাইনি। আমাদের কেন্দ্র দেখতে এসে অনেকেই এটা বিশ্বাস করতে চায় না। তারা মনে করে এসবের পেছনে কোনো অদৃশ্য বৈদেশিক সহযোগিতা রয়েছে। আমরা এই মনোভাবের জন্যে তাদের দোষ দিই না, কারণ অতীতে বহুবারই দেখা গেছে বহু প্রতিষ্ঠান মুখে প্রচুর আদর্শের কথা বললেও অনেক সময়েই অনেক গোপন ও সন্দেহজনক সূত্রের সঙ্গে জড়িত ছিল। সেজন্যে এই ধরনের উদ্যোগের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের একটা স্থায়ী সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। তাই শুধু কথা দিয়ে কারো সন্দেহ দূর করা যাবে না। আমাদের নিজেদের সততা আর আত্মোৎসর্গ দিয়েই এই সন্দেহ দূর করতে হবে। আমাদের প্রমাণ করতে হবে কোনো বৈদেশিক শক্তির উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্যে নয়, বিদেশিদের সংজ্ঞায় এদেশকে নির্মাণ করার জন্যেও নয়; ত্যাগ শ্রম এবং নিষ্ঠার ভেতর দিয়েই আমাদের দেশের প্রকৃত সন্তানেরা এই জাতির নিয়তিকে নির্মাণ করতে চেষ্টা করছে। আমরা যদি এই সৎপ্রচেষ্টায় পথিকৃতের ভূমিকায় এসে দাঁড়াতে পারি তাহলে সাধারণ মানুষের আস্থা একদিন অবশ্যই আমরা পাব।

আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে, এই কেন্দ্রের সুযোগসুবিধা শুধুমাত্র সমাজের

সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর মানুষদের জন্যে উন্মোচিত। এই কথাটিও ঠিক নয়। এই সমাজের দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম প্রতিটি মানুষই যাতে এই কেন্দ্রের সমস্ত সুযোগসুবিধা অবারিতভাবে পেতে পারে, সেজন্য কেন্দ্রের সমস্ত সুযোগসুবিধা সবার জন্যেই সম্পূর্ণ বিনামূল্য ও অবৈতনিক করা হয়েছে। এই সুযোগ নিয়ে গিয়ে আমাদের অর্থ-সংগ্রাহের প্রচণ্ড ধকল সহ্য করতে হচ্ছে। তবু আমরা তা করছি। আমরা মনে করি, একজন মানুষ 'শুধুমাত্র দরিদ্র' এ-কারণে যদি এই কেন্দ্রের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তবে তা হবে একটা নৈতিক অন্যায়। এতে মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্যকে স্বীকার করে নেয়া হয়। এ-ধরনের দুঃখজনক ঘটনা ঘটার আগে কেন্দ্র যেন বন্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্ন : আপনাদের কোনো নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে কী না?

উত্তর : না। আমরা আগেই বলেছি মানসিক সমৃদ্ধি ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের নিজেদের কোনো মতাদর্শ নেই। সবার সামনে এই কেন্দ্রের জ্ঞান এবং আদর্শচর্চার সমস্ত সুযোগ অবারিত। যে-যার প্রবণতা অনুযায়ী এখান থেকে গ্রহণ করবে। কার মতাদর্শ কী হবে তা অংশগ্রহণকারীর সম্পূর্ণ নিজের। আমাদের সেখানে কোনো বক্তব্য নেই। দেশের বাস্তব প্রয়োজনই প্রত্যেককে নিজের নিজের পথে ডেকে নেবে।

আমাদের এই কর্মসূচি সফল করতে পারলে তা দেশব্যাপী শিক্ষা এবং মূল্যবোধের ক্ষেত্রের অধঃপতনকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে পারবে বলে মনে করি।

১৯৮৫

কেন্দ্রের প্রতিটি অঙ্গনে যোগ্য মানুষ*

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন : হাসান হাফিজ

প্রশ্ন : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা কীভাবে?

উত্তর : ১৯৭৮ সালে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের জন্ম। প্রথমে ভাবা হয়েছিল কেন্দ্রের মাধ্যমে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছু যোগ্য লোক তৈরি করব। এজন্যে এর নাম রাখা হয়েছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। কিন্তু দেখা গেল, শুধু সাহিত্যজগতের জন্যে যোগ্য ও সম্পন্ন মানুষ গড়ে তুললেই জাতির প্রয়োজন শেষ হবে না। দেশের প্রতিটি অঙ্গনের জন্য শক্তিমান ও যোগ্য মানুষ গড়ে তুলতে হবে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ, ইতিহাস অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব-ব্যাপারটা একজন বিকশিত মানুষের আয়ত্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠানটি ছিল স্টাডি সার্কল-এর মতো। নানান স্তর ও মাত্রিকতার পরীক্ষানিরীক্ষার পর এটি এখন একটা 'শেপ'-এ এসেছে। সবে কাজ শুরু হল, ফল পেতে অন্তত দশবছর লাগবে।

প্রশ্ন : এ-ধরনের প্রতিষ্ঠানের কথা কেন ভাবলেন?

উত্তর : প্রথমে আমরা প্রতিষ্ঠান হিশেবে এটাকে ভাবিনি। দেশ ও জাতির একটি গুরুতর প্রয়োজনের কথা আমাদের আলোড়িত করেছিল। একটি জাতি তৈরি হচ্ছে অথচ সে-জাতিকে পথনির্দেশ করার লোক নেই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়ার মানুষ নেই—ন্যায়পরায়ণ, আত্মোৎসর্গকৃত, বড় মাপের মানুষ; বড় মূল্যবোধ ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। আমরা জানি, পেন্টাগনের হাতে যে-বিপুল অস্ত্রসম্ভার আছে তা দিয়ে আমেরিকান আর্মি বহুবার পৃথিবী ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু সেই আর্মি আমেরিকায় সামরিক আইন জারি করতে পারে না। এতে বোঝা যায়, সে-জাতির মধ্যে নিশ্চয়ই ওই শক্তির চেয়ে অনেক বড় কোনো শক্তি কার্যকর রয়েছে। সেটা

* পশ্চিমবঙ্গে

কী? সেটা হচ্ছে ঐ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তি। যারা ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো ধারণ করে রেখেছেন তাঁদের নৈতিকতা, জ্ঞান, বিবেক ও অন্যান্য শক্তি এমন দুর্বার যে, তার সামনে সেই জাতির সামরিক ক্ষমতা হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়।

আমরা একটা খারাপ সমাজে বাস করছি যেখানে বাজে লোকেরা খুব দ্রুত একত্র হতে পারছে। কিন্তু ভালোমানুষেরা যোগাযোগরহিত অবস্থায় যে-যার আলাদা ঘরে পড়ে আছে—একা, নিরুপায়। আমাদের জাতিকে যদি সামনের দিকে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে ভালোমানুষদের একত্র করতে হবে। বড় দৃষ্টিভঙ্গি, বড় নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ আমাদের চাই। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়—যেখানে প্রথাগত শিক্ষা দেয়া হয়—সেখানে উন্নত, সুষ্ঠু পরিবেশ থাকলে উন্নত মানুষ গড়ে উঠতে পারে। অক্সফোর্ড কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বছরের পর বছর ধরে ব্রিটেনকে চালাচ্ছে। আমাদের দেশের চিত্র ভিন্ন। এখানকার প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা আজ ধুলোয় মিশে গেছে। ভেঙে পড়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাঙ্গনের সেই শূন্যতা পূরণের জন্যই আমাদের এই প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন : দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের বইপড়া কর্মসূচিটা কী?

উত্তর : সারাদেশে ভালো মানুষ তৈরির লক্ষ্যে শুরু হয় এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়ার কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ হয়ে এখন স্কুলপর্যায়ে আমরা কাজ করছি। কারণ হৃদয়টা এখানেই, এই কচিবয়সেই তৈরি হয়ে যায়। এই কর্মসূচিতে এবার দেশের প্রায় ৩০ হাজার ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করছে। এই সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। অভিভাবক, শিক্ষকমহলের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের কিছু নির্বাচিত বই পড়তে দিই আমরা। পাঠ-পরবর্তী মূল্যায়নও করা হয় তাদের। আছে প্রশংসাপত্র ও পুরস্কারের বিপুল ব্যবস্থা। তাদের পাঠ্যবইয়ের মধ্যে রয়েছে জীবনী, ওয়ার্ল্ড ক্লাসিক, সভ্যতার ইতিহাস, বাংলাভাষার অতীত ও বর্তমানের সেরা বইগুলো। এছাড়াও ছেলেমেয়েদের জন্যে রয়েছে আবৃত্তি, বিতর্ক, নির্ধারিত বক্তৃতা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মতো আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা ও সেসবের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা। তাদের মনের দিগন্তের প্রসার ঘটানো ও মূল্যবোধ আদর্শ সৃজনশীলতা—এসব গুণাবলি বিকাশের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি। আমরা চাই যদি আমাদের কেউ একজন দারোগাও হয়, সে যেন ভালো দারোগা হয়—পরিশীলিত, রুচিশীল, মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন দারোগা। এদের মধ্যে যারা প্রতিভাবান তাদের অনেকেই হয়তো একদিন দেশের নেতৃত্ব বা নীতিনির্ধারকের স্তরে চলে যাবে। তখন যেন দেশের সব অঙ্গনে তারা বড় নেতৃত্ব দিতে পারে। আপাতত আমরা চাচ্ছি বড় স্বপ্নের জন্যে তাদের মধ্যে প্রেরণা ও উদ্দীপনা জোগাতে। যে-কোনো প্রজন্মের সাফল্যের জন্যেই দরকার হয় হৃদয় ও

আত্মশক্তির জাগরণ। আমরা সেটার ওপরই জোর দিচ্ছি।

প্রশ্ন : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতাদর্শ কি?

উত্তর : আমাদের নিজস্ব কোনো মতাদর্শ নেই। উন্নত ব্যাপক ও পরিপূর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন কার্যকর ও শক্তিমান মানুষ হিশেবে গড়ে-ওঠার নিছক 'সুযোগ কেন্দ্র' এটি। কাউকে কোনো বিশেষ মতবাদে দীক্ষিত করে তোলার মতলব বা অভিসন্ধি স্পষ্টভাবেই নেই এ-কেন্দ্রের। একজন সভ্যের অন্তর্প্রবণতাকে পরিপূর্ণ যোগ্যতায় বিকশিত হবার সুযোগ দেয়াই এ-কেন্দ্রের লক্ষ্য—তারপর যার যার পথ তার নিজের।

প্রশ্ন : এই প্রতিষ্ঠানের এত-যে বিশাল কর্মকাণ্ড—এর টাকার উৎস কী?

উত্তর : সরকারের কাছ থেকে আমরা বার্ষিক অনুদান পাই। আমাদের কর্মসূচিগুলো থেকে আসে বেশকিছু টাকা। মিলনায়তন থেকেও ভালো আয় আছে। এছাড়াও আছে বিভিন্ন লোকহিতৈষী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া অর্থানুকূল্য। বাইরে থেকে আমরা সামান্য সাহায্যও পেয়েছি। তবে ওই সহযোগিতায় আমাদের তেমন আগ্রহ নেই। হয়তো বিদেশিদেরও না। আমাদের নেতৃত্ব আমরা নেব—এতে সাহায্যের ব্যাপারে তারা নিস্পৃহ। তারা আমাদের চিরদাসত্বের মধ্যেই বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

প্রশ্ন : কেন্দ্রের সামনে বাধা কী?

উত্তর : প্রকাশ্য কোনো বাধা নেই, তবে ভারি দুঃখপূর্ণ এই পথ। নানান জন এ-উদ্যোগ নষ্ট করতে চায়। আমাদের জাতির অধিকাংশ মানুষ এখনো ভারি আত্মঘাতী আর নেতিবাচক।

সাপ্তাহিক দেশ : ১৯৮৯

আনন্দময় মিলনকেন্দ্র

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন : পলাশ জুবায়ের

প্রশ্ন : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : একালের সার্বিক অবক্ষয়ের মুখে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উঁচুমাপের নেতৃত্ব দিতে পারবে এমন উচ্চচেতনাসম্পন্ন, অনুপ্রাণিত, কার্যকর ও সৃষ্টিশীল মানুষ উপহার দেয়া। বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি অঙ্গনের প্রায় সব প্রতিভাবান ও প্রধান ব্যক্তিরা এই কেন্দ্রের সঙ্গে আজ যুক্ত। এই প্রতিষ্ঠানের পরিব্যাপ্ত ও অনানুষ্ঠানিক পড়াশোনার ভেতর মানবজ্ঞানের প্রতিটি শাখার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের রচনাবলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একই সঙ্গে মানবসভ্যতা ও তার চিন্তাচৈতন্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসসহ জ্ঞানের প্রতিটি শাখার বিস্তৃত অধ্যয়ন, অনুধাবন ও চর্চা এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন শিল্পকলাসহ মনুষ্যত্বের সার্বিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এই অনুশীলনসূচির অংশ। শিক্ষিত, রুচিশীল মূল্যবোধসম্পন্ন সৃজনশীল মানুষ উপহার দেবার পাশাপাশি কেন্দ্রটিকে বাংলাদেশের লেখক, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ—এককথায় বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে জড়িত সকল সজীব ও উজ্জ্বল ব্যক্তিদের আনন্দময় মিলনকেন্দ্র হিশেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

* * *

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আর-একটা বড় অবদান হল আড্ডা। ছাদে ক্যান্টিনে আড্ডা, সবুজ চত্বরে আড্ডা, খোলা বারান্দায় আড্ডা, সর্বত্রই আড্ডা। তরুণ-প্রবীণ কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, শিল্পী, সাংবাদিক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী সবাই আসছেন—নাড়ু-মুড়ি-পায়েস-চিড়াভাজা-চা-ছোলা-পিঁয়াজু চলছে অবিরাম—আর চলছে অবিরাম আড্ডা।

রাজধানী ঢাকায় ময়মনসিংহ রোডের এই ছায়াস্নিগ্ধ পরিবেশে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন। এই ভবন থেকে একদিন ঝাঁকে ঝাঁকে সতেজ, সপ্রাণ, রুচিশীল মানুষ আলোকিত করবে আমাদের সমাজ—এ প্রত্যাশা এখন অনেকের।

[আংশিক]

দৈনিক সংবাদ : ১৯৮৭

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে

[বিটিভির জনপ্রিয় উপস্থাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে নানান কাজের ভেতর নিমগ্ন অবস্থায় যত সহজে পাওয়া যায়, একটি সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্যে তত সহজে পাওয়া যায় না। অধ্যাপনা ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মাঝেই তাঁর দৈনিক ১৪/১৫ ঘন্টা ব্যয় হয়। তাই এই সাক্ষাৎকার শেষপর্যন্ত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে নেয়া সম্ভব হয়নি, নিতে হয়েছে ঢাকা কলেজে, তাঁর পেশাগত কর্মক্ষেত্রে।
টিভি স্ক্রিনে আমরা যে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে দেখতে পাই, সত্যিকার অর্থে তা হল তাঁর মুখাবয়ব, কণ্ঠ ও রসালো উপস্থাপনা। আমরা বিশ্বাস করি, এই দীর্ঘ ইন্টারভিউটি কোনো পাঠক পাঠ করলে দ্বিতীয় এক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে আবিষ্কার করতে পারবেন—যাঁর মধ্যে আছে আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্যবোধ, নিরলস চেষ্টা এবং একটি সুন্দর স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্যে শরীরের রক্ত জল করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সংকল্প।]

ভিডিও গাইড : আপনি শিক্ষকতা পেশায় এলেন কেন?

উত্তর : আমার পিতা ছিলেন খ্যাতিমান শিক্ষক। তাঁর প্রতি ছাত্রদের যে গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দেখতাম তা দেখে ছেলেবেলাতেই আমার মনে হয়েছিল পৃথিবীতে যদি সত্যিকার বড়কিছু থাকে তবে তা হচ্ছে শিক্ষকের জীবন। সেই অনুপ্রেরণায় খুব ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষকতাকে জীবনের প্রধান কাজ হিশেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিই। ১৯৬১ সালে এম.এ. পরীক্ষা দেয়ার পরই মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজে শিক্ষকতা শুরু করি। এখন আছি ঢাকা কলেজে।

ভি. গা. : যে আশা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে আপনি শিক্ষকতায় এসেছিলেন শিক্ষকতায় তার পরিপূর্ণতার স্বাদ খুঁজে পেয়েছেন কি?

উত্তর : পাইনি। শিক্ষক হিশেবে যোগদানের দশবছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই টের পেলাম, যে-স্বপ্ন নিয়ে আমি শিক্ষকতায় এসেছিলাম তা সফল হবার নয়। আমি লক্ষ করলাম শিক্ষকতার যে উচ্চ আদর্শ সমুন্নত রাখার দায়িত্বের কথা ভেবে আমি শিক্ষকতায় এসেছিলাম, আমাদের অবক্ষয়ী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে তার বাস্তবায়ন অসম্ভব। ছাত্রদের মধ্যে যে-উন্নত জীবনের বিকাশ ঘটানোর স্বপ্ন দেখেছিলাম তা এই বৈরী পরিস্থিতিতে কিছুতেই সফল করা যাবে না।

ভি. গা. : এতে আপনার মনে কি কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, এই দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি উন্নততর ও বিকল্প কিছু-একটা করার কথা ভাবতে শুরু করি। আমার মনে প্রশ্ন আসে, সব ছাত্রছাত্রীকে না-পারলেও অন্তত দেশের সবচেয়ে মেধাবী উদ্যমী প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীদের একটা অংশকেও সত্যিকার অর্থে যদি বড় করে তুলতে পারি তাহলেও আগামীদিনে তারা হয়তো অর্থপূর্ণ নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে বাঁচাতে পারবে। তা না হলে এদেশের দায়িত্ব নেবে কারা? দেশকে রক্ষা করবে কারা? উচ্চতর স্বপ্নের দিকে এগিয়ে নেবে কারা? এই নতুন জাতি নির্মিত হবে কীভাবে?

ভি. গা. : এই প্রতিক্রিয়া থেকে আপনার মনে কি কোনো পরিকল্পনা দেখা দিয়েছিল?

উত্তর : অনিবার্যভাবেই। আমি ভেবে দেখলাম আমরা যদি সারাদেশের প্রতিটি জায়গায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে উপগ্রহের মতো করে একধরনের সজীব সপ্রাণ সাংস্কৃতিক অভিন্না গড়ে তুলতে পারি—যেখানে আমাদের দেশের মেধাবী ও উদ্দীপ্ত ছেলেমেয়েরা আলোকিত এবং সম্পন্ন মানুষ হিশেবে বিকাশের অনুকূল পরিবেশ পাবে, তবেই হয়তো শিক্ষা ও মূল্যবোধের এই বিশৃঙ্খল পরিবেশের ভেতর থেকেও কিছু আলোকিত শক্তিমান ও ঋদ্ধ মানুষের জন্ম হতে পারে—যারা দেশকে একদিন অর্থময় অগ্রযাত্রার দিকে এগিয়ে দিতে পারবে।

ভি. গা. : পরবর্তীকালে আপনার যাত্রা কীভাবে শুরু হল?

উত্তর : সময়টা ১৯৭৮ সালের শেষপর্ব। সেই সময় আমি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যায়ের আমার চেনা মাত্র বিশ-পঁচিশজন উজ্জ্বল ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে ঢাকা কলেজের লাগোয়া নিয়োয়ার*-এর একটি ঘরে এই প্রচেষ্টা শুরু করি। কয়েক বছরের মধ্যে টের পাই, ছেলেমেয়েদের উন্নততর শক্তি ও সম্ভাবনায় বিকশিত করার যে-স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম এই প্রক্রিয়ায় তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এটা বুঝতে পেরে এই পদ্ধতিটিকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা শুরু করলাম। পঁচিশজন ছাত্রছাত্রীর দল নিয়ে আমাদের যে-যুদ্ধ শুরু হয়েছিল আজ সেই কর্মকাণ্ডে

* এখন নায়েম

যোগ দিয়েছে বাংলাদেশের ৪৬টি জেলার প্রায় ৩২ হাজার ছাত্রছাত্রী।

ভি. গা. : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কার্যক্রমকে কীভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন?

উত্তর : আমরা ছেলেমেয়েদের মনকে উন্নত ও ঐশ্বর্যময় করে তোলার প্রেরণা করি মূলত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বই পড়ার ভেতর দিয়ে। বই যেহেতু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের হৃদয়ের সেরা ঐশ্বর্যের সুন্দরতম উপহার, সেহেতু আমরা মনে করি নিরন্তর ওইসব দীপ্তি ও সৌন্দর্যের সংস্পর্শে বাস করলে তাদের মনও নিশ্চয়ই হয়ে থাকবে। এই ভাবনার ওপর নির্ভিয়ে আমরা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাদের মন ও বয়সের উপযোগী শ্রেষ্ঠ বই পড়ানোর কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিই। এর ফলও আমরা ইতোমধ্যেই পেতে শুরু করেছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশের উদ্যমী, জিজ্ঞাসু এবং অনুপ্রাণিত হাজার হাজার তরুণ-তরুণী জীবনের উৎকর্ষময় বিকাশের দিকে এগিয়ে আসছে, বেড়ে উঠছে। বইপড়ার পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের পূর্ণতর বিকাশের জন্যে নানা জাতের সাংস্কৃতিক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। সেসবও সফল হচ্ছে। কাজেই আজ আমরা বলতে পারি, যত অল্প পরিমাণেই হোক, আমরা কিছুটা সফল। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জীবন্ত বিকাশ-কেন্দ্র হিশেবে গড়ে উঠছে। সারাদেশে আমাদের প্রতিটি কর্মসূচির পাশাপাশি আমরা ছোট ছোট লাইব্রেরি গড়ে তুলছি। প্রকাশনার মাধ্যমে মানবসভ্যতার সেরা বইগুলোকে পাঠকের ঘরে-ঘরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছি। সারাদেশে উচ্চতর জ্ঞানচর্চার লক্ষ্যে অনেক পাঠচক্র গড়ে তোলারও কর্মসূচি হাতে নিয়েছি আমরা। বাংলাভাষার সেরা বইগুলোর পাশাপাশি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বইয়ের প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছি। জ্ঞানচর্চা ও জীবনের শক্তিমান চর্চাকে আমরা সারাদেশের প্রতিটি অঙ্গনে ছড়িয়ে দিতে চাই।

ভি. গা. : এবার আসা যাক টিভি-উপস্থাপনার বিষয়ে। টিভি-উপস্থাপনায় জড়িত হলেন কীভাবে?

উত্তর : ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাস। হঠাৎ একদিন মুস্তফা মনোয়ার (বিটিভির উপ-মহাপরিচালক) আর জামান আলী খান (বর্তমানে পাকিস্তান টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক) আমার ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজের (বিজ্ঞান কলেজ) হোস্টেলের কক্ষে এসে হাজির। তাদের অনুরোধ : কবি জসীমউদ্‌দীনের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। রাজি হয়ে গেলাম। টিভিতে সেই আমার প্রথম আসা। পরবর্তীকালে কুইজ প্রোগ্রাম, শিশুদের প্রোগ্রাম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপনার ভেতর দিয়ে টিভির সঙ্গে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়েছি। তবে ১৯৭৩ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত টিভির সাথে পুরোপুরি জড়িত ছিলাম।

ভি. গা. : উপস্থাপনা কি শিক্ষণীয় বিষয়? একজন উপস্থাপকের কী কী গুণ আবশ্যক বলে মনে করেন?

উত্তর : উপস্থাপক ঠিক ঘোষক নন, উপস্থাপনা হল উজ্জ্বল উৎকর্ষময় ব্যক্তিত্বের একধরনের বর্ণোজ্জ্বল প্রকাশ। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কেউ ভালো উপস্থাপক হতে পারে না। এটাকে দক্ষতা ভাবলে ভুল হবে। একজন উপস্থাপকের ব্যক্তিত্ব হতে হবে রুচিশীল, সপ্রাণ, সপ্রতিভ, হাস্যময় ও বুদ্ধিদীপ্ত। তাঁর স্বভাবের মধ্যে একধরনের সারল্য থাকতে হবে; যা দিয়ে তিনি দর্শকদের আপন করে নেবেন। মনে রাখতে হবে যিনি দর্শকদের ড্রইংরুমে গিয়ে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথা বলেন, তাঁকে কোনোমতেই কৃত্রিম বা আড়ষ্ট হলে চলবে না। এই জিনিশগুলো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেখানো কঠিন। খানিকটা জন্মগতভাবে, খানিকটা শিক্ষা, রুচি ও ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ থেকেই একজন উপস্থাপক এগুলো পেতে পারেন। অবশ্য অনেক জিনিশ, যেমন উচ্চারণ, উপস্থাপনার বিভিন্ন কৌশল, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এমনি আরো অনেক কিছু প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া যেতে পারে।

ভি. গা. : উপস্থাপক হিশেবে আপনার দর্শকদের কাছে এত গ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ কী?

উত্তর : আমি যখন ক্লাসের ছাত্রদের পড়াই তখন আমার মনের কথাগুলো এমনভাবে বলার চেষ্টা করি, যাতে ক্লাসের সবচেয়ে মেধাহীন এবং বোকা ছাত্রটিও তা বুঝতে পারে। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি কতটা সহজে, স্বচ্ছন্দে ও হাস্যপরিহাসের মধ্যদিয়ে সরল ভাষায় তার হৃদয়ের কাছে পৌছানো যায়। এতে সাধারণ ছেলেরাও যেমন আমার কথা বুঝতে পারবে তেমনি ভালো ছেলেদের বোঝার পথেও কোনো বাধা থাকবে না। টেলিভিশনেও আমি অমনটাই করি। দর্শকদের কাছে গভীর কিছু তুলে ধরতে চাইলেও তার উপস্থাপনা করি রম্য উপভোগ্য ও সহজ ভঙ্গিতে। আমার বলার বিষয় যতই গভীর হোক-না কেন, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি, যাতে সবচেয়ে সাধারণ দর্শকটিও তা বুঝতে পারে। এর ফলে লাভ হয় দুটো। সাধারণ দর্শকের কাছেও আমার বক্তব্য কমবেশি পৌছে যায়। আর বুদ্ধিমান, শিক্ষিত দর্শকেরা তো নিজগুণেই তা বুঝে নিতে পারেন।

ভি. গা. : আমাদের দেশের একজন শিক্ষক ইচ্ছে করলেই সাধারণ মানুষের মতো অনেক কিছুই করতে পারেন না, যেমন পারেন না চায়ের স্টলে আড্ডা দিতে বা মেয়েদের নিয়ে হালকা হাসির কথা বলতে; আপনি সহজভাবে এসব কথা বলার সৎসাহস কোথায় পান?

উত্তর : আমি মনে করি পৃথিবীতে যে-কোনো কথাই বলা যেতে পারে এবং তা সহজ ও সাবলীল হাস্যকৌতুকের মাধ্যমেই বলা যেতে পারে যদি সেই কথার পেছনে থাকে কোনো গভীর অর্থ বা তাৎপর্য। তা না-থাকলে ওই কথাগুলো হয়ে

উঠবে নেহাত তামাশা বা ভাঁড়ামি। আমি কথা যত হালকা করে বলি না কেন, তার পেছনে কোনো-না-কোনো তাৎপর্য দেবার চেষ্টা করি। টেলিভিশনের দর্শকরা অনেক অনুষ্ঠানেই আমার মুখ থেকে হালকা কথা শুনছে কিন্তু কখনোকে ভাঁড়ামি ভেবে আমাকে বকাঝকা করেনি। অধ্যাপকের ভাবমূর্তি আর টিভি-উপস্থাপকের ভাবমূর্তির মধ্যে বিরোধিতা আছে। তারী চিন্তা আর রম্য-উপস্থাপনাকে এক করে আমি এই পরস্পর-বিরোধিতার সমাধান করতে চেষ্টা করেছি। তবে ছাত্রছাত্রীদের সামনে আমি যতটা সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত এবং অন্তরঙ্গ—টিভিতে তা থাকা সম্ভব হয় না। টেলিভিশন সময়-বাঁধা একটা জায়গা, ক্লাসরুমের একজন শিক্ষকের স্বাধীনতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ সেখানে নেই।

ভি. গা. : টিভির পর্দায় আপনি একজন রসবোধসম্পন্ন ব্যক্তি অথচ টিভি-পর্দার বাইরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রর মতো সিরিয়াস সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্রত, দুটোর মধ্যে মিল কোথায়?

উত্তর : আসলে কোনো মিল নেই। আমার স্বভাবই এরকম। আমার ভিতরটা সিরিয়াস এবং বেদনাভারাক্রান্ত কিন্তু বাইরে আমি হাসিখুশি। তবে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সাথে টেলিভিশনের এটুকু মিল যে, টেলিভিশনে আমার পরিহাসরসিক সত্তাটি হয়ে ওঠে প্রধান, সিরিয়াস মানুষটি থেকে যায় নিচে। আর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আমার সিরিয়াস মানুষটি স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ পায়। হাস্যরসিক মানুষটি তাকে সহায়তা করে।

* * *

ভি. গা. : আপনি যে টিভি-ব্যক্তিত্ব হয়েছেন তা কি আপনার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেনি?

উত্তর : আমার উপস্থাপক-জীবন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সৃষ্টিতে খুব সহায়ক হয়েছে। টিভিতে উপস্থাপক হিশেবে আমি এদেশের বিভিন্ন অঙ্গনের সাধারণ মানুষ থেকে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, শাসক, জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা—সবার কাছে প্রিয় হয়েছিলাম। তাঁরা আমাকে ভালোবেসেছেন, অন্তরের শুভেচ্ছা দিয়েছেন এবং এ-প্রতিষ্ঠান গড়ে-তোলার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। সত্যি কথা বলতে কী, টেলিভিশনের উপস্থাপক হিশেবে আমার যদি জনপ্রিয় পরিচিতি না থাকত তাহলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে-তোলা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবী পরিচয় সম্বল করে কারও পক্ষেই এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হত।

ভি. গা. : টিভিতে যদি আবার আসেন তাহলে কী-ধরনের অনুষ্ঠান নিয়ে আসার পরিকল্পনা আছে?

উত্তর : টিভিতে আমি কিছুদিনের মধ্যেই অনুষ্ঠান আরম্ভ করার কথা ভাবছি। অনুষ্ঠানটি হবে শিক্ষামূলক। তবে এ-ধরনের অনুষ্ঠান করার ঝুঁকি আছে। পৃথিবীতে

কোনো দেশের টিভিই আজ অব্দি প্রকৃত অর্থে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানকে সত্যমূল্যে তুলে ধরতে পারেনি। তার কারণ টিভি-মাধ্যমটির মধ্যে রয়েছে একধরনের দ্রুততা এবং গতি। এই গতির ফলেই একটি শিক্ষামূলক বিষয়কে আত্মস্থ করার জন্যে যে-সময় দরকার, টিভি দর্শকদের সে-সময় দিতে পারে না, তার আগেই চটুল পায়ে পালিয়ে যায়। আমার অনুষ্ঠানটি হবে এরকম : প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়, ধরা যাক খবর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে, জানার জগতের কোনো-একটি বিশেষ শাখার কোনো-একটি বিশেষ বিষয়কে উপস্থাপন করা হবে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে। আমার ধারণা, কোনো জানার জিনিশকে অল্পসময়ের মধ্যে ছোট আকারে যদি দর্শকদের সামনে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরা যায় তবে তা দর্শকদের মনের মধ্যে এমন গভীর ছাপ ফেলতে পারে, যাতে এই ধরনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল হয়েও যেতে পারে।

ভি. গা. : আপনি জানেন যে আপনি মরে গেলে দ্বিতীয় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আসবে না; এই অবস্থায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যেন আরও ব্যাপ্তি লাভ করে তার পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে এমনভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে, যাতে এটি দীর্ঘপথে এগিয়ে যেতে পারে, বড় হয়ে উঠতে পারে। আমাদের রয়েছে একটি অত্যন্ত যোগ্য, দক্ষ ও উৎসর্গিত কর্মীদল। আমরা আশা করব, যেসব পরিকল্পনা আজ আমরা গ্রহণ করেছি আমাদের সুযোগ্য কর্মীরা তাদের চেষ্টা, শ্রম ও আত্মোৎসর্গ দিয়ে তা এগিয়ে নিয়ে যাবে।

পুনশ্চ : এই সাক্ষাৎকারটি শেষ হওয়ার পর তিনি যখন কলেজ করিডোর দিয়ে নামছিলেন তখন তাঁর ছাত্ররা পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁকে একের পর এক সালাম দিতে-দিতে যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম : স্যার, বার বার সালাম নিতে আপনার কষ্ট হয় না? স্যার বললেন : একটি ছোটমেয়ে এই ভেবেই আমাকে একটা ভালো উপদেশ দিয়েছিল। বলেছিল, 'আপনার ডান হাতটা কব্জি থেকে কেটে মাথার ডানদিকে সেঁটে রাখলেই তো পারেন।' বলে হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন : ভিডিও গাইড-এর নিজস্ব প্রতিনিধি :১৯৯০

আগ্রাসী লাইব্রেরি আন্দোলন

আজকের কাগজ : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য কি?

সায়ীদ : আলোকিত মানুষ। বিপুল সংখ্যায় আলোকিত মানুষ। তাদের গড়ে-ওঠার পরিবেশ তৈরি। সেইসব মানুষ যারা উচ্চহৃদয়সম্পন্ন, যোগ্য, উদার, কার্যকর এবং শক্তিমান।

আজকের কাগজ : দেশের অন্যান্য পাঠাগারের সাথে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লাইব্রেরির পার্থক্য কোথায়?

সায়ীদ : অন্যান্য লাইব্রেরির সঙ্গে আমাদের লাইব্রেরির পার্থক্য রয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রে একটি বেশ বড় লাইব্রেরিই আছে আমাদের। বইয়ের সংখ্যার দিক থেকে দেশের সবচেয়ে বড় দু-তিনটি লাইব্রেরির একটি এটি। এর বইয়ের সংখ্যা ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরির প্রায় কাছাকাছি। তবু আর-দশটা গ্রন্থাগারের মতো এটি গতানুগতিক কোনো লাইব্রেরি নয় যেখানে পাঠকেরা এসে সুস্থ ও নির্জন পরিবেশে শুধু জ্ঞানের সাধনায় রত থাকবে। এই লাইব্রেরির রক্তপ্রকৃতির মধ্যে জন্মমুহূর্ত থেকেই রয়েছে এক অস্থির আলোড়ন, জাতির ভবিষ্যতের জন্য একটা অন্য উৎকণ্ঠা। এই লাইব্রেরি জেনে নিয়েছে আজকে আমাদের দেশে প্রকৃত জ্ঞানার্থী সংখ্যা সত্যি সত্যি বিরল, দেশ আজ সত্যিকার অর্থেই পাঠকহীন। এই লাইব্রেরিকে ধরে নিতে হয়েছে যে—হয় আমাদের জাতির মধ্যে জ্ঞানের পদপাত কখনো ঘটেনি, নয়তো ঘটে থাকলেও আজ তা অতীতের বর্ণচ্ছটার সুদূর স্মৃতিমাত্র। আজ এই জাতিকে জ্ঞানের উজ্জ্বল জগতে ডাক দেবার দায়িত্ব নিতে হবে এই লাইব্রেরিকে। জ্ঞানসংস্পর্শশূন্য নিস্পৃহ একটি জাতিকে নানা কর্মসূচির ভেতর দিয়ে বইয়ের সংস্পর্শে এনে আরও সক্রিয়, আরও কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে—তাকে নিতে হবে একটি 'আগ্রাসী লাইব্রেরি আন্দোলনে'র নেতৃত্ব।

গতানুগতিক দশটা লাইব্রেরিতে কী দেখি আমরা? লাইব্রেরি তার বইয়ের ভাণ্ডার সাজিয়ে একজায়গায় সুস্থির হয়ে বসে আছে; পাঠকেরা এসে হাজির হচ্ছে দরোজায়। কিন্তু এ লাইব্রেরির চরিত্র উল্টো। যেহেতু লাইব্রেরিতে আসার মতো পাঠক আজ দেশের ভেতর নেই, তাই এই লাইব্রেরি তার প্রথম দায়িত্ব হিশেবে বেছে নিয়েছে দেশে পাঠক গড়ে-তোলার কাজটি। এটা সে করছে কেন্দ্রের 'দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের' মাধ্যমে। সারাদেশে তরুণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বইপড়া কর্মসূচি চালিয়ে নতুন প্রজন্মের নতুন পাঠক গড়ে তুলতে চাচ্ছে সে বিপুল সংখ্যায়। সাধারণ পাঠাগারের মতো এই লাইব্রেরি তাই নিষ্ক্রিয়, ঝিমুনি-ধরা লাইব্রেরি নয়; এ লাইব্রেরি জীবন্ত। পাঠক কবে এসে আমাদের পাঠাগারের দরোজায় দাঁড়াবে তার জন্যে আমরা অপেক্ষা করি না। আমরা এগিয়ে পাঠকের দরোজায় গিয়ে দাঁড়াই। বিভিন্ন বইপড়া কর্মসূচির ভেতর দিয়ে তাদের পাঠক করে তুলি। এভাবে দেশে পর্যাপ্ত পাঠক তৈরি হওয়ার পাশাপাশি আমরা গড়ে তুলছি সারাদেশে ছোট ছোট লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার কাজ, কেন্দ্রের 'দেশভিত্তিক লাইব্রেরি কার্যক্রম'-এর আওতায়। তাই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লাইব্রেরিকে কেবল একটি পাঠাগার ভাবলে ভুল করা হবে।

আবারও বলি, এর বর্তমান মুহূর্তের প্রধান কাজ হল আমাদের দেশে আগে ওইসব জ্ঞানপিপাসু মানুষ গড়ে-তোলা, নতুবা পাঠাগারের উদ্দেশ্য সফল হবে না। সাধারণ পাঠাগারের মতো আমাদের পাঠাগার তাই নিষ্ক্রিয় নয়। সক্রিয়, সপ্রাণ ও আক্রমণাত্মক। পাঠকদের আমরা পাঠের জগতের, জানার জগতের আনন্দে অংশ নিতে ডাক দিই। টেনে নিয়ে আসি। তার দরজায় গিয়ে দাঁড়াই।

বিশ্বের সেরা বইগুলো পড়ার মধ্যদিয়ে জ্ঞানের আনন্দে ও পিপাসায় জেগে উঠে তারা একদিন পাঠাগারের দরোজায় এসে দাঁড়াবে, এই আমাদের স্বপ্ন। তাই 'দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রম'-এর মাধ্যমে আমরা সারাদেশে এই বইপড়া কার্যক্রম চালু করার চেষ্টা করছি, যাতে কেবল ঢাকা নয়, সারাদেশেই জন্ম নেয় সম্পন্ন বা আলোকিত মানুষ গড়ে-ওঠার পরিবেশ।

আজকের কাগজ : কেন্দ্র নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

সায়ীদ : সারাদেশে আমাদের দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কর্মসূচির ৫০০টি শাখা প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে রয়েছে। এর মধ্যে ১৯২টি শাখা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওই ৫০০ শাখার ৩০০টিতে গড়ে তুলতে চাই ছোট আকারের একটি করে লাইব্রেরি। এই শাখাগুলোকে আমরা গড়ে তুলতে চাচ্ছি ছোট সুনির্বাচিত বইসমৃদ্ধ লাইব্রেরি হিশেবে এবং সেইসাথে শ্রবণ-দর্শন বিভাগের কর্মসূচি ও নানা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম দিয়ে সেগুলোকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে।

শাখাগুলোকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুসংখ্যক উজ্জ্বল ও বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রছাত্রী তৈরি

হচ্ছে দেশের সবখানে। এটা একটা আশার কথা। এছাড়াও প্রথমে বড় বড় শহরে ও পরে সারাদেশে গড়ে তুলতে চাই ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি। শহরের সবখানে পাঠকদের বই পৌঁছে দেবে তারা। ইচ্ছে আছে একটি কালচারাল কমপ্লেক্স তৈরি করার। সেখানে থাকবে বড় পাঠাগার, আর্ট গ্যালারি, ফিল্ম আর্কাইভ, অডিও-ভিডিও বিভাগ, নাট্যমঞ্চ, যা একদিন রূপ নেবে সাংস্কৃতিক মিলনকেন্দ্র হিশেবে। তবে দেশব্যাপী সম্পন্ন মানুষ, যোগ্য মানুষ গড়ে তোলার কর্মসূচিকেই আমরা বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি ও দিয়ে যাব।

আজকের কাগজ : দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে আপনি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। এই সময় কি আপনি আপনার উত্তরাধিকারী তৈরি করতে পেরেছেন?

সায়ীদ : আমাদের জাতির একটা খুবই শূন্য জায়গা রয়েছে। এই জাতির সংগঠনের ইতিহাস নেই। হয় সংগঠন ছিল না বলে আমরা বহু বহু শতাব্দী বিদেশিদের পদানত ছিলাম, নয়তো আমরা পদানত ছিলাম বলে জাতীয় ভাগ্য গড়ার সুযোগ আমাদের হয়নি, তাই সংগঠন গড়ে তুলতে পারিনি। ব্যক্তিগত প্রতিভা দিয়ে যা করা যায় সেই ক্ষেত্রে বাঙালির সাফল্য শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের। এই জাতি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল থেকে আজপর্যন্ত অনেক শ্রেষ্ঠ মানুষ উপহার দিয়েছে, কিন্তু সমষ্টিগত কাজে এরকম বড় সাফল্য আমরা পাইনি। রাজনৈতিক দলগুলো আজও সুষ্ঠ সাংগঠনিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারেনি। এখনো নেতৃত্বের পারম্পর্য ও দলীয় শৃঙ্খলা তৈরি হয়নি। সে-কারণেই রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দলগুলোতে নেতৃত্বের শূন্যতা আজও এত প্রকট। এখনো একজন শেখ মুজিব বা একজন জিয়াউর রহমান নিহত হলে নেতৃত্বের উত্তরাধিকার ঠিক করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই শূন্যতার পথ ধরে তাদের সন্তান অথবা পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব নিতে হয়।,অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলো আজও সাংগঠনিকভাবে গড়ে ওঠেনি। আমাদের সমস্যা এ থেকে আলাদা নয়। সুষ্ঠু সাংগঠনিকতার অভাবে সুষ্ঠ উত্তরাধিকার গড়ে উঠছে না।

আজকের কাগজ : কেন্দ্র কি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান?

সায়ীদ : সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়। রাজনীতি আছে। তবে আমাদের রাজনীতি একটিই—প্রগতিশীলতা, উদারতা, আধুনিকতা। আমাদের বইয়ের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আমরা এই রাজনীতি করি। আমরা এমন সব বই পড়তে দিই; যা মানবিক, উদার ও উন্নততর মানুষের জন্মদানে সহায়তা করবে—প্রতিক্রিয়াশীল মানুষের নয়। আমরা মননের প্রাধান্যে বিশ্বাস করি। আমাদের রাজনীতি রাজনৈতিক দলগুলোর মতো নয়। কোনো রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ আমাদের নেই।

আজকের কাগজ : দেশের বর্তমান সাহিত্য নিয়ে বলুন।

সায়ীদ : একালের সাহিত্যে প্রেরণার জগৎ বেশ শূন্য বলেই মনে হয়। সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য খুব অল্প মানুষই লালন করতে পারছে। আমার ধারণা মূলত এটা নির্মাণের যুগ, প্রতিভার যুগ নয়। এই যুগে সৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে আছে—গোটা বিশ্বেরই প্রায় এই অবস্থা। আমাদের দেশে এখন সবে সংগঠন তৈরি হচ্ছে। পরে একসময় তা সৃজনশীলতার সুযোগ করে দেবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আজকের কাগজ : আপনি একজন সফল উপস্থাপক। আপনাকে ইদানীং টিভিতে দেখা যায় না কেন?

সায়ীদ : টিভিতে যখন নিয়মিত যেতাম তখন ভেতরের আনন্দে যেতাম। সেই আনন্দ এখন মরে গেছে তা নয়, তবে তারও চাইতে যা এখন আমাকে অনেক বেশি অধিকার করে রেখেছে তা হল জাতির ভবিষ্যৎ-চিন্তা। তাই হয়তো টিভি কিছুটা একপাশে পড়ে গেছে।

আজকের কাগজ : আপনার কি কোনো দুঃখবোধ আছে?

সায়ীদ : লিখতে চেয়েছিলাম। লিখতে পারিনি। মনে হয় লেখক হয়েই জন্মেছিলাম। সেটা পূর্ণ করতে পারলাম না। এখনো আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কোটি-কোটি জীবন্ত শব্দের গুনগুনানি। ইদানীং কিছু কিছু লিখছি। ৫টা বই বেরিয়েছে, আরো ৬টা বই শিগগির বেরোবে। যদি আর-কিছুদিন বেঁচে যাই, তাহলে হয়তো কিছু লিখতে চেষ্টা করব।

আজকের কাগজ : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র স্থাপন করতে এসে কি তাহলে আপনার ক্ষতি হয়েছে বলবেন?

সায়ীদ : তা বলব না। ক্ষতি হয়নি। আসলে ক্ষতিই আমার লাভ এক্ষেত্রে। আমি আমার কাজ করে আনন্দ পেয়েছি—কর্তব্য পালনের আনন্দ, দায়িত্ব নেবার আনন্দ। লিখতে না-পারাটা ক্ষতির কথা ততটা নয়, যতটা দুঃখের কথা।

আজকের কাগজ : আমাদের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

সায়ীদ : ধন্যবাদ আপনাকেও।

[আংশিক]

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন : মিলা মাহমুদা : ১৯৯৪

সমাজ ও রাজনীতি

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন ॥ চঞ্চল আশরাফ

আজকের কাগজ : আপনার স্বপ্নের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র জাতির স্বপ্নও বটে। এ প্রতিষ্ঠানের একটি পদক্ষেপ হিশেবে মোবাইল পাঠাগার কেমন চলছে?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : খুবই ভালো চলছে। আমাদের যা প্রত্যাশা ছিল, তার চেয়ে অনেকবেশি সাড়া ও উদ্দীপনা জাগিয়েছে মোবাইল লাইব্রেরি। আমরা ভাবতেও পারিনি যে এ এতখানি জনপ্রিয়তা পাবে। বইমেলাতে মানুষ যেমন পাগলের মতো ছুটে যায়, আমাদের লাইব্রেরি যে-পাড়ায় যায় তার আশপাশের লোকেরা সেখানে তেমনিভাবে ছুটে আসে, ভিড় করে, বিশেষ করে কিশোর তরুণেরা। লোকের ঠেলাঠেলিতে আমাদের কর্মীরা হিমশিম খায়। আমরা ঢাকা শহরে চারটি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি নামিয়েছি, নামিয়েছি মানে কয়েকদিনের মধ্যে চারটা গাড়ির সবকটা নেমে যাচ্ছে। আগামী বছর চিটাগাং, খুলনা, রাজশাহীতে এই লাইব্রেরি চালু হবে। ঢাকাতেও গাড়ি বাড়বে।

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির মাধ্যমে আমরা আসলে দুটো কাজ করছি। আপনি জানেন যে, সারাদেশে চারশো জায়গাতে আমাদের শাখা আছে। এই শাখাগুলোতে আমরা স্কুল-কলেজের তরুণ-তরুণীদের উৎকর্ষসম্পন্ন সমৃদ্ধ মানুষ হিশেবে গড়ার চেষ্টা চালাচ্ছি শ্রেষ্ঠ বই পড়ানো, বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে। কিন্তু তাদের নিয়ে বিপদ হয়েছে অন্য এক জায়গায়। আমাদের ওই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে হয়তো তারা জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করছে, কিন্তু একসময় হঠাৎ করেই সেটা থেমে যাচ্ছে। দ্বাদশ শ্রেণীর পর, দেশভিত্তিক কর্মসূচির পর্ব শেষ হয়ে গেলে, আমরা তাদের আর সহযোগিতা দিতে পারছি না। তারা বই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কর্মসূচি আমাদের নেই।

তাই আমরা চেষ্টা করছি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রত্যেক জেলা শহরে চালু করতে। তাতে জেলা শহরে তারা দুদিন কাজ করবে, আর চারদিন উপজেলাগুলোতে কাজ করবে। এভাবে সারাদেশের সব উপজেলা পর্যায়ে এই কর্মসূচি প্রসারিত হয়ে যাবে। সেইসঙ্গে সারাদেশের সংযোগকারী রাস্তাগুলোর দুধারের ছোট শহর, বাজার, গঞ্জ—সবখানে। ফলে সারাদেশের সব জায়গায়, আমাদের কর্মসূচির ছেলেমেয়েরা দ্বাদশশ্রেণী পার হয়েছে কী, ঠিক সেই মুহূর্তেই এই লাইব্রেরির বই তাদের দরোজায় গিয়ে হাজির হবে। সুতরাং বইপড়ার চর্চা তাদের আজীবনের কর্মসূচি হয়ে উঠতে পারবে।

তবে যে-কথা ভেবে শুরুতে আমরা ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির কথা ভেবেছিলাম তা হল দেশে ভালো লাইব্রেরির অভাব মেটানো। সেটা এখনো আমাদের মূল লক্ষ্য। আমাদের দেশে ভালো লাইব্রেরি খুবই কম। ঢাকা শহর এক কোটি লোকের শহর, অথচ এমন একটা লাইব্রেরি এখানে নেই যেখান থেকে বই বাড়িতে নিয়ে পড়া যায়। বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, শিশু একাডেমী লাইব্রেরি, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি—এসব রয়েছে ঢাকা শহরে, কিন্তু তারা তো বাড়িতে বই নিতে দেয় না। কাজেই শহরে যে বইপড়ার সংস্কৃতি গড়ে উঠবে তার অনুকূল পরিবেশ নেই। বাড়ির পাশে একটা পানের দোকান থাকলে বাড়ির লোকদের পান-খাওয়ার অভ্যাসটা একটু তাড়াতাড়ি শুরু হয়। হাতের কাছে পেলে যে-কোনো জিনিশের দিকে আমরা সহজে ঝুঁকে পড়ি; তার সঙ্গে আমরা উঠতে-বসতে অভ্যস্ত হই। সেজন্যে আমরা সারাদেশে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক চালু করার কথা ভাবছি। এতে দেশে ভালো লাইব্রেরি না-থাকার অভাব যেমন মিটবে তেমনি তা আমাদের কেন্দ্রের দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কর্মসূচির তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের বইপড়ার অভ্যাসকে অব্যাহত রাখার ব্যাপারেও কাজ করবে।

আজকের কাগজ : এ প্রতিষ্ঠান বিশ্বসাহিত্যের যে চিরায়ত সম্পদ, তার কিছু অনুবাদ বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে। সমকালীন বিশ্বসাহিত্য পাঠের এবং বাংলাভাষায় অনুবাদ ব্যাপারে এ-প্রতিষ্ঠানের কোনো উদ্যোগের পরিকল্পনা আছে কি-না?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : এ প্রতিষ্ঠানের নাম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র—এ থেকেই বোঝা যায় শুধু সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের বিষয় নিয়েই আমরা থাকব না। সমকালীন বিষয়ও থাকবে, আবার সারাবিশ্বের সবকালের বিষয়ও থাকবে। কয়েক বছর ধরে আমরা একটা প্রকাশনা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি যে ভালো প্রকাশনার জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা লাগে, যে-টাকা আমাদের নেই। আমাদের প্রতিষ্ঠানের কিছু সুনাম থাকলেও আমরা খুবই গরিব। দেশের ভেতর থেকে খুবই ধীরে ধীরে কষ্ট করে আমরা দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি।

প্রকাশনার জন্য বিস্তর টাকা লাগে। এজন্য আমরা ভাবছি ছোট প্রকাশনার চিন্তা ছেড়ে বড় ধরনের অর্থ সংগ্রহ করে বড় আকারের প্রকাশনা শুরু করব। আমরা বাংলায় বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বইগুলোর অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নেব। আমরা পঁচিশ বছরে ৭৫০টি শ্রেষ্ঠ বই অনুবাদ ও প্রকাশ করার কথা ভেবেছি। এর জন্য সিডমানি দরকার হবে পাঁচ কোটি টাকার মতো। বড় আকারের এই আয়োজনটা শুরু করতে পারলে ওই বইগুলোর বিক্রির টাকা দিয়ে আবার নতুন বই প্রকাশ করে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। আমার আশা, আমরা সামনের বছর এই কাজে হাত দিতে পারব।

[আংশিক]

দৈনিক আজকের কাগজ : ২০০০

শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা থেকেই জেগে উঠেছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন ॥ রাজু আলাউদ্দিন

রাজু : ইদানীং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র হায়ার-স্টাডিজের যে-আয়োজন করতে যাচ্ছে—এটা আসলে কী এবং কেন?

সায়ীদ : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আমরা চেষ্টা করি ছেলেমেয়েদের মনটাকে উন্মোচিত করতে। এটা করি একেবারে স্কুলপর্যায়ে থেকে, যাতে ওদের স্বপ্নগুলো বিকশিত হয়, দৃষ্টিভঙ্গিটা সম্পন্ন হয়। সারাদেশে ষাট হাজার ছেলেমেয়ে আছে এই কর্মসূচির আওতায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মানুষকে যে কী করে উচ্চতর জ্ঞানচর্চার মধ্যে আনব—এটা আমি এতদিন বের করতে পারিনি। একটা বাচ্চাকে যদি বলি : পড়লে তুমি প্রাইজ পাবে, তখন সে উদ্বুদ্ধ হয়, বইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু একজন বয়স্ক লোককে আমি কী করে পৃথিবীর জ্ঞানজগতের মধ্যে নিয়ে আসব? তাকে তো প্রাইজ দিয়ে ভোলানো সম্ভব নয়। এই উপায়টাই আমি খুঁজছিলাম। এতদিনে সেটা পেয়েছি। ব্যাপারটা খুব কঠিন। রুটিরুজির জন্যে নয়, আনন্দের জন্যে জ্ঞান। এতে তো কাউকে সহজে আকৃষ্ট করা সম্ভব নয়।

রাজু : ঐ-যে আপনি বলেন যে, ইউনিভার্সিটি বা কলেজগুলোর শিক্ষাব্যবস্থায় যদি দীপান্বিত মানুষ বা সম্পন্ন পাঠক হয়ে ওঠার পদ্ধতিটা থাকত তাহলে নিশ্চয়ই আপনি বিদ্যালয়ের বাইরে এসে এইসব মানুষ গড়ে তুলতে চাইতেন না বা চাওয়ার দরকার হত না।

সায়ীদ : আমাদের কলেজ-ইউনির্ভাসিটিগুলোর যে-শিক্ষাব্যবস্থা, তার ব্যর্থতা থেকেই জেগে উঠেছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। ওখানে যেটা হওয়ার কথা ছিল, যে-স্বপ্ন ওখান থেকে দেখানো যেতে পারত, তা যেহেতু সেখানে দেখানো হচ্ছে না, তাই আমরা আমাদের ছোট্ট পুঁজি নিয়ে বাইরে থেকে তা করার চেষ্টা করছি। সারাজাতির অভাব

পূরণ হয়তো আমরা করতে পারব না। একভাগও পারব কিনা তাও জানি না। কিন্তু তবুও 'আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি'। এদেশে ইউনিভার্সিটি কীভাবে ধ্বংস হয়েছে, সেটা সবাই দেখেছে। জ্ঞানের জগতে, শিল্পের জগতে, সাহিত্যের জগতে যে-উজ্জীবক শিক্ষকদের আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি সে-প্রদীপ এখন নিভে গেছে, বিদ্যালয় আজ অরাজক, বিশৃঙ্খল এবং সংকটাপন্ন ...। কাজেই এছাড়া পথ কী?

[আংশিক]

দৈনিক বাংলাবাজার ১৯৯৯

বিচিত্র প্রসঙ্গ

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন : দীলতাজ রহমান

দীলতাজ রহমান : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা আপনার মাথায় এল কী করে? এই প্রতিষ্ঠানটিকে আজকের পর্যায়ে আনতে আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : এই প্রতিষ্ঠানের আজ যে-রূপ, প্রথমে আমি একে এভাবে চিন্তা করিনি। আমি এটিকে একজন শিক্ষক হিশেবে চিন্তা করেছিলাম। প্রথমে আমি আমার চারপাশের কিছু ছেলেমেয়ের বিকাশের জন্যেই এটা শুরু করি। বইপড়ার মধ্যদিয়ে, সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যদিয়ে তাদের বড় করে তোলা যায় কীনা, দেখতে চেষ্টা করছিলাম। পাঁচবছর মেয়াদি একটা পাঠচক্র চালিয়েছিলাম ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩-এর মধ্যে। তাতে ফল পেয়ে আমি এটা বাড়াতে শুরু করি। বাড়াতে বাড়াতে এটা এখন অনেক দূর এসেছে। আরো অনেক দূর যেতে চাই।

দীলতাজ রহমান : আলোকিত মানুষের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করলেও আপনিই প্রথম এটা বলেছেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে বই-পড়ানোর যে-নেটওয়ার্ক, তরুণ প্রজন্মকে আলোকিত করার যে-চেষ্টা, তাতে আপনি কতটুকু সফল বলে মনে করেন?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : এটা তো একটা চেষ্টা মাত্র। আলোকিত মানুষ তো একটা ফুটবলের মতো নয় যে এদিক থেকে জোরে মারলাম তো ওদিকে গোল হয়ে গেল। একটা মানুষের বেড়ে-ওঠা, সমৃদ্ধ হওয়া—এ একদিনে হয় না, এ এক দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া—দীর্ঘদিনের শ্রম-চেষ্টা-দুঃখের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে একজন মানুষ পরিণত হয়। কাজেই আমি হাত গুনে বলতে পারব না যে, এ-কয় বছরে এতগুলো মানুষ আলোকিত হয়েছে। আলোকের স্পর্শ অনেকের মধ্যেই

লাগছে। অনেকেরই অন্তর্জগৎ অন্তর্বিস্তর উদ্ভাসিতও হচ্ছে। এখন কে কোন পথে যাবে, কার জীবনে কিসের প্রভাব গাঢ়ভাবে পড়বে, কে কী নিয়ে উন্মীলিত হবে, সেটা সময়েই কেবল বলতে পারবে। তারা যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করবে, অন্ত যে-হৃদয়টা তাদের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে, যখন তা তাদের কর্মের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হবে তখনই তাদের উন্নততর অবদান রাখার সময়। তখনই বুঝতে পারব কে এই প্রক্রিয়ার দ্বারা কতটুকু উপকৃত।

দীলতাজ রহমান : আজকাল বিভিন্ন স্কুল-কলেজে শ্রেণী-পাঠাগার তৈরি হচ্ছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের চিন্তা আছে যা দ্বারা এই পাঠাগারগুলো উন্নত হয়?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : না, আমাদের আন্দোলনটাই পাঠাগার-আন্দোলন নয়। আমাদের আন্দোলন বই-পড়ানোর আন্দোলন। দুটো আলাদা। আমরা প্রথমে একটা পাঠাগার করেছিলাম। অনেক টাকা ব্যয় হয়ে গিয়েছিল তাতে। ভেবেছিলাম অনেক মানুষ আসবে। জ্ঞানার্থীদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠবে পাঠাগার। কিন্তু সেখানে বেশি মানুষ আসেনি। এর কারণ, দেশে পড়াশোনার সংস্কৃতি না-থাকা। কিছুদিনের মধ্যে ভুল বুঝতে পেরেছিলাম। বুঝেছিলাম ক্রেতা তৈরি হওয়ার আগেই আমরা দোকান খুলে বসেছি, গ্রাহকের কথাটা একদম চিন্তা করিনি।

কিছুদিনের মধ্যেই আমরা কৌশল বদলে ফেলেছি। লাইব্রেরি নিয়ে বড় না, অন্যরা সেখানে আসে। কিন্তু আমরা উল্টো কাজ শুরু করলাম। করে পাঠক আমাদের কাছে আসবে তার জন্য বসে না-থেকে আমরা নিজেরাই চষে বেড়ে লাগলাম পাঠকের দোরগোড়ায়। প্রথমে হিশেব করে দেখলাম দেশের কোন-জায়গাগুলোতে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক পাঠক এসে জড়ো হয়। ধরা পড়ল, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েই এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এগুলো একেকটা মানুষের মৌচাকের মতো। শহর, নগর, গ্রাম সবখান থেকে ছেলেমেয়েরা এইখানে এসে জড়ো হয়। তাছাড়া, বয়সের দিক থেকে এরা নবীন। এরা অনুসন্ধিৎসু, অনুসন্ধিৎসু, উদ্‌গ্রীব এবং গ্রহণক্ষম। এদের হৃদয়কে পরিবর্তন করে উজ্জ্বল জীবন-স্বপ্নের দিকে উদ্বুদ্ধ করা অনেক সহজ। তাই আমরা বড় ছোট শহরগুলো থেকে আরম্ভ করে থানা এমনকি ইউনিয়নে ইউনিয়নে গিয়েও স্কুল-কলেজগুলোকে কেন্দ্র করে বইপড়ার কর্মসূচি চালু করতে শুরু করলাম।

আজ সারাদেশে এই কর্মসূচি বিশাল রূপ নিয়েছে। কাজেই পাঠাগার উন্নত করার আন্দোলন আমাদের নয়, অন্তত এই মুহূর্তে। আমাদের আন্দোলন আলাদা বই-পড়া আন্দোলন'। দেশে চিন্তাশীল মানুষ গড়ে-তোলার আন্দোলন। আমার ধারণা, ওই আন্দোলনটা দানা বেঁধে উঠলে ওই আন্দোলন থেকে যারা জন্ম নেবে তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পাঠাগার-আন্দোলন করলে তা অর্থপূর্ণ হবে।

দীলতাজ রহমান : আমাদের সাহিত্যিকদের কোনো আড্ডা দেবার ভালো জায়গা নেই। আপনি কি মনে করেন এটার প্রয়োজন আছে?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : খুবই প্রয়োজন। আমাদের নিজেরও এ-ব্যাপারে কিছু করার ইচ্ছা আছে। চেষ্টা করব। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে একটা সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স করার কথা। ওর বারো-তলার ছাদে প্রায় আট হাজার স্কয়ার ফিটের মতো রাখা হবে শুধু আড্ডার জন্য। এখানে থাকবে নানান ধরনের খাবারের ব্যবস্থা, নিরবচ্ছিন্ন আড্ডা ও আনন্দের সুযোগ। আমাদের আশা এটাকে ঘিরে জমে উঠবে অনেক শৈল্পিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দীপনা। কলকাতায় কফি হাউজকে কেন্দ্র করে লেখক-শিল্পীদের দল গড়ে উঠেছে নানা সময়ে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা অবদানও রেখেছে। আমাদের এই আড্ডার জায়গাটাও হবে এমনি একটি প্রাণবন্ত মিলনকেন্দ্র।

[আংশিক]

দৈনিক মাতৃভূমি : ১৩ আগস্ট ২০০০

পাক্ষিক প্রকৃতি

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন : রোকসানা আফরীন

রোকসান আফরীন : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে-তোলার ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত প্রেরণা কী ছিল?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : অনুপ্রেরণা মানুষের ভেতরকার তাগিদ। পত্রিকার সম্পাদনা, টেলিভিশনের কাজ, লেখালেখি এসব আমি করেছি অনুপ্রেরণা থেকে। কিন্তু বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পুরো ব্যাপারটা আমি করেছি বিবেকের তাড়নায়। এখানে আনন্দের চেয়ে জাতির প্রয়োজনের উৎকণ্ঠাই কাজ করেছে বেশি। বিবেকের তাগিদ এই কাজের পেছনে ছিল।

[আংশিক]

বক্তৃতা

চাই বড় মন, বৃহতের সংস্পর্শ

তরুণ রোটার‍্যাক্টরবৃন্দ,

কিছুক্ষণ আগে আমার নামে যেসব দীর্ঘ ও প্রশংসাসূচক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে একটি আমার জন্যে রীতিমতো উদ্বেগের কারণ। জনৈক বক্তা উৎসাহের আবেগে আমাকে বাংলাদেশের অরণ অঞ্চলের একটি বিশেষ জাতের 'ব্যাঘ্র' হিশেবে অভিহিত করে ফেলেছেন। বর্ণনাটি আমার দুর্লভ মানবজন্মের জন্যে যে কতটা গৌরবজনক হয়েছে তা বলা না-গেলেও ব্যাপারটা আমার চেয়েও আতঙ্কজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমাদের জন্যে, যারা এই মুহূর্তে আমার সামনের বসে আছ। ওই নামকরণ সঠিক হলে যে-কোনো মুহূর্তে তোমরা এই জনবহুল সভার মাঝখানে হঠাৎ ভরাট গলার 'হালুম'-জাতীয় শব্দ শুনে ফেলতে পারো এবং নিজেদের ঊর্ধ্বশ্বাস ও পলায়নপর অবস্থায় আবিষ্কার করতে পারো।

এই সভায় আমি কী বলব তার ছিটেফোঁটাও এই মুহূর্তে আমার মাথায় নেই। আসার আগে কিছুই ভেবে আসিনি। সময় হয়নি। প্রস্তুতি না-থাকলে একজন বক্তার ভাঁড়ারে যা থাকে, আমার তা আছে : স্বাধীনতা। সেই অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে মনের খুশিতে আমি কিছুক্ষণ তোমাদের সামনে যা-খুশি-তাই বকে যেতে চাই।

'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র' নামে আমাদের যে-প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে আজ গড়ে উঠছে, এটি শুধু সাহিত্যের পঠন-পাঠনের জন্যে নয়। অবশ্য প্রথমে যখন আমরা এই প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলাম, তখন বিশ্বসাহিত্যের গভীর ও বিশদ পঠন-পাঠনই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। এর নামও তাই রাখা হয়েছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

আমাদের ধারণা ছিল, বিশ্বসাহিত্যের গভীর ও ব্যাপক পাঠ ও চর্চার ভেতর দিয়ে দেশের সাহিত্যের অঙ্গনে উচ্চমানসম্পন্ন সুযোগ্য মানুষ আমরা উপহার দেব। ভেবেছিলাম সারাটা জাতির জীবনের ভেতর আজ যে-অবক্ষয়ের শিকড় নিঃশব্দে

চারিয়ে গেছে, যে-অরাজক পরিস্থিতি আজ আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছে—সবদিক থেকে তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও অন্তত সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা যদি কিছু শক্তিমান ও সুযোগ্য মানুষকে গড়ে তুলতে পারি, জ্ঞান শক্তি ও আত্মবিশ্বাসে তাদের বলীয়ান করে দাঁড় করাতে পারি, দেশের অন্তত কিছুটা জায়গা, ছোট্ট একটা কোণকেও যদি ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করতে পারি—তা হলেও হয়তো করার মতো কিছু হবে। এজন্যেই আমরা সাহিত্যকে কেন্দ্র করে আমাদের যাত্রা শুরু করেছিলাম। কিন্তু পরে বোঝা গেল যে শুধু সাহিত্যের ছোট্ট সীমাবদ্ধ পরিসরটুকু ঝাড় দিয়ে সমগ্র জাতির জীবনকে পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। তা কিছুতেই পরিপূর্ণ হবে না। আমাদের চেষ্টা করতে হবে জাতির প্রতিটা অঙ্গনকে পরিষ্কার করার জন্য, সব অঙ্গনের জন্যেই যোগ্য মানুষ গড়ে-তোলার জন্য। সেজন্যে শুধু সাহিত্যের পঠন-পাঠনই নয়, মানবজ্ঞানের প্রতিটি শাখার সামগ্রিক চর্চা ও অনুধাবন দরকার। জাতির সবক্ষেত্রের জন্যেই আজ দরকার পূর্ণায়ত মানুষ; টোটাল ম্যান। যদি একটা পুরো জাতিকে গড়ে তুলতে চাই, তাহলে পরিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ মানুষকেই আমাদের পেতে হবে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানের মতো জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় উদ্ভাসিত এবং আজকের ও আগামীদিনের মানবসভ্যতার প্রতিটি উচ্চতর চেতনায় আলোকিত, সমৃদ্ধ, কার্যকর ও শক্তিমান মানুষ পেতে হবে আমাদের।

যখন আমরা বলি যে, পৃথিবী আছে—তখন একই সঙ্গে আমরা নিশ্চয়ই মনের ভেতরে একথাটাও স্বীকার করে নিই যে, এর নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ সৃষ্টিকর্তা আছেন। সে আল্লাহই হোন, ভগবানই হোন, কোনো প্রকৃতির রহস্যময় নিয়মই হোক, অথবা কোনো মহাজাগতিক প্রক্রিয়া যাই হোক— কিছু-না-কিছু নিশ্চয়ই এটির জন্মের ব্যাপারে দায়ী। না হলে এর উদ্ভব কী করে সম্ভব?

একইভাবে আজ আমরা যদি ভাবি যে, আমরা একটি সুখী সমৃদ্ধ সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলব—তা হলে নিশ্চয়ই এ বাংলাদেশকে কে বানাবে, কারা হবে এর নির্মাতা, কীভাবে কাদের হাতে এই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ রচিত হবে—এসব নিয়ে—জাতির সেই জন্মদাতাদের নিয়ে, আজ প্রথমে ভাবতে হবে। নির্মাতা নেই, অথচ নির্মাণ ঘটে গেল, এ কি কখনো সম্ভব? শেখ মুজিব সোনার বাংলাদেশের কথা বলতেন। কিন্তু কাদের দিয়ে তৈরি হবে সেই বাংলা, তাদের খুঁজে পাননি। চারপাশে উৎসুক করুণচোখে অসহায়ের মতো কেবলই তাদের খুঁজেছেন।

আমাদের চারপাশে কেবলই ক্ষুদ্র মানুষ, আর আমরা চাচ্ছি একটা বড় জাতি! কী করে তা সম্ভব!

যারা এই জাতির নির্মাতা হবে তারা যদি ক্ষুদ্র হয়, তা হলে কী করে একটা বড় দেশ, বড় জাতি নির্মিত হবে? সৃষ্টি কি স্রষ্টার চাইতে বড় হতে পারে?

জাতিকে বড় করে গড়ে-তোলার লক্ষ্যে তাই আজ আমাদের দেশে চাই অনেক বড় মানুষ।

আমরা আজকে একটা মহান দেশ ও জাতির নির্মাণের দায়িত্বের সামনে। শেখ মুজিব স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই বাংলাদেশকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমাদের ওপর সেই বাংলাদেশ নির্মাণের ভার, তাঁর 'সোনার বাংলা'র বাস্তবায়নের দায়িত্ব। কেবল স্বপ্ন দেখে তাকে বাস্তবায়িত করা যাবে না। স্বপ্নের পাশাপাশি আমাদের বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে সেই বড় বাংলাদেশ আমরা নির্মাণ করে যেতে পারি।

বড় জাতি গড়ে-তোলার জন্যে বড় মানুষ দরকার—একথা আমি সবসময় বলি। কিন্তু, বড় হওয়ার উপায় কী? স্বাস্থ্যচর্চা করলে একজনে বড় হওয়া যায়—সেটা হচ্ছে শারীরিক বড় হওয়া। এই বড় হওয়াটা প্রাথমিক ও খুবই জরুরী। আমাদের দেশে সেই স্বাস্থ্যেরও চর্চা নেই। আমাদের জাতি পৃথিবীর সবচেয়ে রুগ্ন আর স্বাস্থ্যহীন জাতি। কিন্তু আমাদের দেশের কর্ণধারদের এই জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি নিয়ে কখনো কথা বলতে শুনি না। স্বাস্থ্যকে তাঁরা হাসপাতাল আর ডাক্তারখানার ব্যাপার বলে মনে করেন। না, আমাদের সবাইকে বড় বড় বায়ামবীর, কুস্তিগীর হতে হবে এ-কথা আমি বলছি না। কিন্তু পৃথিবীতে সাফল্য পেতে হলে যে ন্যূনতম স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা দরকার তা আমাদের কোথায়? সারাদিন কত জায়গায় ছোটাছুটি যাও, কটা প্রাণখোলা অট্টহাসির শব্দ শোনো? নিজেরাই যে-হাসি হাসো তাই-বা কতটুকু প্রাণের ধাক্কায় কেঁপে-ওঠা? আমাদের দেশে অট্টহাসি প্রায় শোনাই যায় না। কোনো একটা কিছুতে খুশি হয়ে, প্রাণখোলা হো-হো হাসির বন্যায় জীবন কাঁপিয়ে খানখান হওয়া, এটা কি আমাদের ধাতে নেই? অট্টহাসির জন্যে যে কতটা দরকার তা আমাদের শরীরে নেই। এমন নির্জীব স্বাস্থ্য নিয়ে ওই হাসি হাসতে গেলে আমরা অনেকেই হয়তো অজ্ঞান হয়েই পড়ে যাব। বেশি হাসলে বিপদ হব। তাই আমাদের অট্টহাসি নেই। সেজন্য আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যখন হাসে তখন সেটা অট্টহাস্য হয় না—যা হয়, রসিকতা করে আমি তার একটা নাম দিয়েছি : ছাগহাস্য। হাস্যকর মিহি ভঙ্গিতে হেসে-ওঠার একধরনের করুণ প্রাণহীন অপচেষ্টা। ছাগলের মতো গলা ভেঙে এহ্-এহ্ করে খুকখুকিয়ে হাসার একধরনের প্রয়াস, যাতে শক্তিও খরচ হল না, অথচ আনন্দও প্রকাশ হল। না, এ দিয়ে অট্টহাসি হয় না। অট্টহাসির জন্য স্বাস্থ্য চাই—বড় জীবনের জন্যে বড় স্বাস্থ্য চাই। শারীরিক স্বাস্থ্য চাই। মানসিক স্বাস্থ্য চাই। রবীন্দ্রনাথ বলতেন : 'অন্ন চাই, আলো চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু/ চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু/ সহস্রবিস্তৃত বক্ষপট।' সেই স্বাস্থ্য, সেই বলীয়ান জীবন, সেই দুর্মদ শক্তিমত্তা।

কেবল পরমায়ু হলে হবে না। কেবল কিছুকাল কোনোমতে খুকখুকিয়ে কেঁ

থাকলেই চলবে না। ইঁদুরের মতো, তেলাপোকার মতো টিকে থেকে জীবন পার করলে হবে না। যে-জীবনে বেঁচে থাকতে হবে সে-পরমায়ুকে হতে হবে আনন্দ-উজ্জ্বল, সে-বক্ষপটকে হতে হবে সাহসবিস্তৃত। আমাদের আজ সবার স্বাস্থ্য দরকার—শরীরের স্বাস্থ্য, মনের স্বাস্থ্য। শরীরের মতো মনটাকেও বড় করতে হবে। কেবল বেঁচে থাকা নয়, এই জীবনকে 'যাপন' করতে হবে আমাদের। কেবল খাওয়া নয়, 'ভোজন' করতে হবে। বড় মন, বড় স্বপ্ন, বড় হৃদয় দিয়ে বড় জীবনকে ধারণ করতে হবে ।

হ্যাঁ, বড়—রাজার মতো বড়। রাজপথ দেখেছ? রাজার পথের নাম রাজপথ। রাজা কে? যাঁর হৃদয় বড়, তিনিই রাজা। তিনি যে-পথ দিয়ে যাবেন, সেই পথকে কি ছোট হলে চলে? চললেও নিজের বৃহত্ত্ব দিয়ে তিনিই তাকে বড় করে তুলবেন, তা তিনি দেশের রাজা হোন বা মনোরাজ্যের রাজা—যাই হোন-না কেন। তাই রাজপথ—রাজার পথ—বড় পথ।

আজ ঢাকা শহরের করুণ অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখ। কোথায় রাজপথ এ শহরে? ঢাকা আজ যেন অসংখ্য সুরম্য অট্টালিকাবিশিষ্ট একটি বস্তি। এখানে নতুন তৈরি এমন বহু আবাসিক এলাকা আছে, যার বড় বড় ব্যয়বহুল ইমারত দেখলে অনেক সম্ভ্রান্ত শহরও লজ্জা পাবে। কিন্তু লোক মারা গেলে, সেখান থেকে লাশ বের করার মতো রাস্তা নেই। এমনই সংকীর্ণ এসব রাস্তা। আল বেরুনি লিখেছিলেন : যদি দেখ কোনো শহরের রাস্তাগুলো ছোট (সংকীর্ণ), তবে বুঝবে ঐ শহরের মানুষের মনগুলো ছোট। ক্ষুদ্র মনের এই অভিশাপ আজ মহানগরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেঁটে গেছে। আধুনিক কোন্ নগর এমন? পৃথিবীর সব আধুনিক নগরেই তো রাস্তাগুলো এমন প্রশস্ত যাতে অন্তত চারটা গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে। তা হলে আমাদের নগর এরকম কেন? কেন এইসব কষ্টকর গলি আর খুপরির অন্ধকারের ভেতর শ্বাসরুদ্ধকর জীবন? ছোট মনের কারণে একটা জাতিকে যে কী নির্যাতন আর কষ্ট সহ্য করতে হয় এটা তারই একটা প্রমাণ।

এই নওয়াবপুর রোড যেদিন তৈরি হয়েছিল, সেদিন গাড়ি কটা ছিল ঢাকা শহরে? নওয়াবের লোক-লস্কর-পারিষদ সব মিলিয়ে হয়তো দুশো চারশো পাঁচশো ছিল। তাও আবার ঘোড়ার গাড়ি। সেই পঞ্চাশটি গাড়ির জন্য রাস্তাটা কি এতবড় হওয়ার দরকার ছিল?

হ্যাঁ, দরকার ছিল। রাজাদের আভিজাত্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই পথ তৈরি হয়েছিল। এর চেয়ে ছোট হওয়া এর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দিল্লির রাজভবনের সামনের বিশাল রাজপথে হেঁটেছ কখনো? কলকাতা বা প্যারিসের রাজপথ, সঁজেলিজে, চৌরঙ্গি—রাজকীয় মনের কী সমুন্নত উদাহরণ! কিন্তু এর তুলনায় আমরা কি রাস্তা বানাচ্ছি এই নগরীতে? কেন এমন হল? কারণ বের করা কঠিন

নয়। এইসব রাস্তা, এই বাড়ি, এই নগর বানাচ্ছে কারা? কোথা থেকে এই মানুষরা এসেছে? এই মানুষেরা এসেছে গ্রাম থেকে। মাত্র সেদিন এসেছে। এসে এই শহর গড়ে তুলছে। বিত্তের জগতে প্রথম প্রজন্মের মানুষ এরা। গ্রামে রাস্তা বেশি নেই, বড় রাস্তা দেখেনি এরা প্রায়। গ্রামের ক্ষেতের ভেতর একধরনের রাস্তাই কেবল এরা দেখত। না, রাস্তা ঠিক নয়—ক্ষেতের সীমানা—আল; দুই ক্ষেত বিভক্ত করা সরু চিকন আল। কোনোমতে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়, এমন। এরা হিসাব করে দেখত ওই আল থেকে এক আঙুল পরিমাণ জায়গাও যদি নিয়ে নেওয়া যায় তাহলেও বিশ-পঞ্চাশ বছরের মাথায় দশবিশ মণ বাড়তি ধান লাভ হবে। এসব ভেবে যখনই সুযোগ পেত ওই আলের কিছুটা নিজের জমির ভেতর নিয়ে নেবার ফিকির খুঁজত।

আলের এই এক-আঙুল জমির জন্য কাইজা-কলহ করে এরা মানুষের মাথায় দায়ের কোপ বসাত। ভাই ভাইকে খুন করত। যুগ-যুগ ধরে চলেছে এটা। আমরা, সেই মানুষরাই গত চার দশক ধরে এই শহরটাকে গড়ে তুলেছি। শহরে এসেও যুগ-যুগের মনমানসিকতাকে আমরা ফেলে আসতে পারিনি। শহরে এসে প্রথমেই বাড়ির সামনের রাস্তার ওপর আমাদের চোখ পড়েছে। রাস্তা দেখেই আমাদের গ্রামের সেই আলের স্মৃতি জেগে উঠেছে। ভেবেছি ওটা দখল করতে পারলে দীর্ঘমেয়াদে আমরা লাভবান হব। তাই আল-দখল বা চর-দখলের মতো শুরু হয়ে গেছে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা-দখলের পর্ব। বাড়িকে যদ্দুর সম্ভব এগিয়ে নিয়ে রাস্তার ওপর চড়াও হয়েছি আমরা। বুঝিনি, রাস্তা আল নয়। রাস্তা-দখল আল-দখল নয়। এ লাভজনক নয়। এ ক্ষতিকর। নিজের জন্যে এবং নগরবাসীর জন্যে—দুইয়ের জন্যেই ক্ষতিকর।

রাস্তা দখল করে আমাদের বাসযোগ্যতার সঙ্গে আমরা শত্রুতা করেছি। আমরা বাড়ির দাম কমিয়েছি। পরবর্তী বংশধরকে দরিদ্রতর করেছি। রাস্তা দখল করে সমস্ত শহরকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় ফেলে নাগরিক জীবনকেই ধ্বংস করে ফেলেছি। অভ্যাস এবং দূরদৃষ্টির অভাবেই আমরা এটা করেছি। প্রথমে বাড়ির দেয়াল বাড়িয়ে দিয়ে রাস্তা দখল করেছি। কংক্রিটের পাকা গাঁথুনি দিয়ে এভাবে বাড়ি গেঁথে ফেলেছি; যাতে চাইলেও জায়গাটাকে আর-কোনোদিন রাস্তার ভেতর নেওয়া না-যায়।

ব্যাপারটা-যে কতটা ভয়াবহ তার একটা সামান্য পরিচয় দিই। তোমরা জানো ভূতের গলি নামে গ্রিন রোড এলাকায় একটা সরু রাস্তা আছে। রাস্তাটা দিয়ে পাশাপাশি দুটো গাড়ি চলতে পারত না। এলাকার জনসংখ্যা ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে যাওয়ায় রাস্তাটা যানবাহন চলাচলের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় রাস্তাটার পাশে অন্তত দু-ফুট করে ছেড়ে যানবাহনের যোগ্য করে তোলার দরকার হয়। কিন্তু দুপাশের বাড়ির মালিকেরা জায়গা ছাড়বে না। শেষপর্যন্ত মালিকদের

বুঝিয়েসুঝিয়ে ওই দু-ফুট জায়গা ছাড়াতে রাজি করানোর জন্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি স্বয়ং জিয়াউর রহমানকে ওখানে গিয়ে সভা করতে হয়।

বলো, সারা ঢাকাশহরের প্রত্যেকটা রাস্তা ঠিক করতে যদি রাষ্ট্রপতিকে যেতে হয় তবে দেশ দেখবে কে? এত রাষ্ট্রপতি আমরা কোথায় পাব? অথচ এসব কাদের স্বার্থে? হ্যাঁ, তাদেরই। দেখ, মানুষের মন ছোট হলে নিজের স্বার্থটুকু বোঝার বুদ্ধিও কীভাবে হারিয়ে যায়।

আজ আমরা একটা জাতি নির্মাণ করতে যাচ্ছি। এ-সময় যদি আমাদের মন ছোট থাকে তাহলে কিন্তু সমস্ত কালের জন্যে এই জাতি ছোট হয়ে যাবে। এই জাতির নির্মাণ ছোট হয়ে যাবে। সেইজন্যে আজ আমাদের তরুণ প্রজন্মের মন বড় করে তুলতে হবে। বড় মনের মানুষেরাই তো বড় বাড়ি বানাতে পারবে। এই মন গড়ে-তোলা বইয়ের ভেতর দিয়ে খানিকটা সম্ভব। বিশ্বের বিচিত্র সংস্কৃতির ও চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচয়ের ভেতর দিয়ে সম্ভব। কথাটা হঠাৎ শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু তা নয়। আমরা এই-যে শ্রেষ্ঠ বই পড়ার কথা বলি তা এই কারণেই।

শ্রেষ্ঠ বই কীভাবে মনকে বড় করতে পারে? এসো এবার এর উত্তর দিই। বলো তো, শ্রেষ্ঠ বইয়ের লেখক কারা? ক্ষুদ্র মানুষ কি বড়বইয়ের লেখক হতে পারে? না। শ্রেষ্ঠ বই, শ্রেষ্ঠ মানুষদের শ্রেষ্ঠ চেতনার ফসল। তাঁদের উদার আর ব্যাপ্ত জীবনের যা-কিছু মহান, অনিন্দ্য আর স্বপ্নময়, সেইসব জিনিশ দিয়েই তো রচিত তাদের বইগুলো। প্রতিনিয়ত ওই বইয়ের অনবদ্য জিনিশগুলো যদি আমরা আমাদের ভেতর নিয়ে নিতে পারি তবে আমরাও কি বড় হয়ে উঠব না?

সৌন্দর্যের সান্নিধ্য পেয়ে কী মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের? কী লিখেছিলেন তিনি?

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর
পুণ্য হল অঙ্গ মম ধন্য হল অন্তর।

সুন্দরের সঙ্গ পেয়ে অপরিসীম প্রাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত উপচে উঠেছিল। কেন উঠেছিল? তিনি অনুভব করেছিলেন যে জোছনাধারার মতো ওই 'সুন্দর' কেবল তাঁর দু-চোখই উপচে দিচ্ছে না, অন্তরের খাঁজে-খাঁজে প্রবেশ করে তাঁর মানব-অস্তিত্বকেই ধন্য করে দিচ্ছে, পুণ্য করে তুলছে। বড় বই এটা করে। আমাদের ভেতরটাকেও বড় করে তোলে। আমাদের অঙ্গের ভেতর অন্তরের ভেতর ফলে-উঠে পুরো জীবনটাকেই সম্পূর্ণতা দেয়।

পাইনগাছ তো দেখতে খুব সুন্দর, তাই না? একটা পাইনগাছের নিচে থাকে ছায়া, সৌন্দর্য আর শান্তির জগৎ। এমনি এক ঝিরঝিরে স্নিগ্ধ রূপময় পাইনগাছের নিচ দিয়ে তুমি যদি হেঁটে যাও তখন কী ঘটবে? হেঁটে যাবার আগে তুমি যে-মানুষটি ছিলে, হেঁটে যাবার পরেও সেই মানুষটি কি তুমি থাকবে? নাকি তোমার জীবনের সাথে নতুন

কিছু যোগ হবে? পাইনগাছের ওই ছায়া, গাছের ওই রূপ, ওই শান্তি, স্নিগ্ধতা তোমার চেতনার সাথে লগ্ন হয়ে যাবে। তোমার মনটা আরও স্নিগ্ধ, সৌন্দর্যময় শান্তিময় হয়ে উঠবে। ঠিক একইভাবে আমরাও যখন একটা নরম আলোস্নিগ্ধ কবিতা পড়ি তখন কী হয়? আমাদের ভেতরটাও কবিতার ওই সৌন্দর্যের ছোঁয়ায় স্নিগ্ধ হয়ে যায়। একটা বিশাল পর্বত—ধরা যাক হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র বিশাল সৌন্দর্যমালার সামনে যখন আমি দাঁড়াচ্ছি, তখন আমি কি আগের সেই ক্ষুদ্র সংকীর্ণ আমিটাই থেকে যাচ্ছি, নাকি ওই অপার্থিব মহিমান্বিত অভ্রভেদী শুভ্র সৌন্দর্যের সান্নিধ্যে আমি কিছুটা পাল্টে যাচ্ছি? আমি আমার চেয়ে বড় আর পরিপূর্ণ হয়ে উঠছি!

তোমাদের ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই। পরিবেশের সংস্পর্শে এসে মানুষের কীরকম পরিবর্তন হয় তার উদাহরণ। ধরো, হঠাৎ করে তুমি বন্ধুবান্ধব নিয়ে চাইনিজ হোটেলে খেতে গিয়েছ। পাঁচশো বা এক হাজার টাকা হাতের তুড়িতে উড়িয়ে দিতে বাধছে না। অথচ সেই তুমি বাসার সামনে রিকশা থেকে নামার সময় আটআনা নিয়ে রিকশাওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করলে। করো নাকি অনেক সময়? তোমরা না-করলেও আমার এক বন্ধুকে একবার আমি এ করতে দেখেছি। কেন হয় এমনটা? যে বন্ধু অনায়াসে একহাজার টাকা রেস্তোরাঁয় উড়িয়ে দিতে পেরেছে—পঞ্চাশ টাকা বকশিশ দিতে যার কিছুই এসে যায়নি—সেই মানুষের কাছেই আটআনাকে কেন এতবেশি মনে হচ্ছে? এর কারণ বের করা কঠিন নয়। রেস্টুরেন্টের ভেতর তার যোগাযোগ ঘটেছিল ওই রেস্টুরেন্টের জৌলুশ, অভিজাত্য আর বৈভবের সঙ্গে। ওর জৌলুশময় পরিবেশ, সুসজ্জিত ঘর, নিমীলিত আলো, সুবেশ ওয়েটার, দামি খাবার—সবকিছু মিলিয়ে তাকে তার ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি দিয়ে এক সম্পন্ন-জগতের মানুষ করে তুলেছিল। ওর বৈভব তার মধ্যে চলে এসেছিল। তখন সে আর কেবল সে ছিল না। তখন তার কিছুটা ছিল সে, কিছুটা ওই রেস্টুরেন্টের অভিজাত্য। ফলে তখন সে তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। এজন্য এক ঝটকায় এতগুলো টাকা উড়িয়ে দিতে তার বাধেনি। কিন্তু রিকশাওয়ালার সামনে যখন সে এসেছে, তখন তার কিছুটা সে, কিছুটা ওই রিকশাওয়ালা। রিকশাওয়ালার অসম্মানিত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট বঞ্চিত জীবন তাকে অতিক্রম করে বন্ধুটির মধ্যে চলে এসেছে। বন্ধুটিকে সে তার প্রভাব-বলয়ের মধ্যে নিয়ে গিয়েছে। সে তার চাইতে ছোট হয়ে গিয়েছে। হাজার টাকা উড়িয়ে দেওয়া মানুষ আটআনার জন্য কুৎসিত চেঁচামেচি শুরু করেছে। এই হচ্ছে পরিবেশ, পরিপার্শ্বের প্রভাব। এই প্রভাবে এভাবেই আমরা কখনো উদার আর বৃহৎ, কখনো ক্ষুদ্র আর নোংরা, কখনো নিচে, কখনো ওপরে ওঠানামা করি।

আমাদের জীবনের ওপর পরিবেশের প্রভাব সত্যিই বিপুল। তাই জীবনকে বড় করতে হলে জীবনের পরিবেশকে বড় করে তুলতে হয়।

একটা বিশাল জায়গাতে—ধরা যাক হিমালয়ের সামনে যখন গিয়ে দাঁড়াই—সামনে বরফে-ঢাকা দেবতার মতো মহান পর্বতমালার সামনে—তখন কী হয়? তখন আমি কি আজকের এই মুহূর্তের এই আমি থাকি? যে-আমি এই মুহূর্তে তোমাদের সামনে ছোট ছোট লাভলোভের কথা বলে বেড়াচ্ছি? না, সেই আমি অনেক বড় আমি। পর্বতের মহিমান্বিত বিশালতা আমার অস্তিত্বে প্রবেশ করে আমাকে সেখানে বড় করে তুলেছে। নিজের ভেতর আমি পর্বতের মহিমা অনুভব করছি। সমুদ্রের পারে গেলে কী হয়? মনে হয় না কি, আমি আমাকে ছাপিয়ে অনেক বড় হয়ে গেছি। হয় এজন্যে যে সমুদ্রের নোনা নীল বিশালতা তখন আমার ভেতর উদ্বেল হয়ে ওঠে, আমাকে বড় করে ফেলে। আবার একটা ঘুপচি-ঘরে—বস্তির মধ্যে ঢুকলে কী হয়? আমার ভেতরেও কি এই সীমাবদ্ধ ঘরের সংকীর্ণতা চলে আসে না?

সেজন্যে যদি বড় হতে হয়, তাহলে দরকার বড় জিনিশের সংস্পর্শ। পৃথিবীর বড়মানুষেরা তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম চিন্তা-অনুভূতি রেখে গেছেন তাঁদের মহান বইগুলোর মধ্যে। আমি যদি সেই বই পড়ি তবে সেসবের স্পর্শে আমার বোধ, আমার চিন্তা, পূর্ণিমার জোয়ারের মতো উথলে উঠবে। আমি বড় হয়ে উঠব। ধরা যাক তুমি একটা প্লেটো বা এরিস্টটলের বই পড়ছ। কী হচ্ছে ওই মুহূর্তে। তাঁদের সাথে আসলে তখন তুমি বসবাস করছ। কথাবার্তা বলছ। ওইসব মহৎ মানুষেরা তাঁদের ভেতরের বিশাল জগতে তোমাকে টেনে নিচ্ছে। তুমি তাঁদের মুখোমুখি হচ্ছ, বলছ : এরিস্টটল সাহেব, আপনি কথাটা বলছেন বটে, তবে আমি ঠিক আপনার কথাটাকে মেনে নিতে পারছি না। আমার জীবনের দীর্ঘ আঠারো বছরের বিপুল অভিজ্ঞতা থেকে মনে হচ্ছে...ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভেবে দেখ তো, কেমন একজন বড়মানুষের সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হচ্ছে? কতবড় চিন্তার সমুদ্রে তখন তুমি ভাসছ! সেই মানুষের বড় ব্যক্তিত্ব ঐশ্বর্য সৌন্দর্য আর প্রতিভায় তুমি কত সমৃদ্ধ হচ্ছ। যখন প্লেটো পড়ছ, তখন তুমি প্লেটো। যখন আইনস্টাইন পড়ছ, তখন তুমি আইনস্টাইন।

এইভাবে এক এক করে তুমি যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের লেখা পড়তে থাকো তখন কী হবে? ওইসব বড়মানুষের ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে তোমার ভেতরেও চলে আসবে। তোমাকে অনেকখানি তাঁদের মতো করে ফেলবে। তখন তুমি আগের সেই করুণ 'আব্দুল কুদ্দুস' আর থাকবে না। ওইসব মানুষের শক্তিতে প্রাচুর্যে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার চেয়ে অনেক বড় হয়ে যাবে। তুমি নিজের মধ্যে তখন সেই মানুষদের বিশালতা অনুভব করবে; যা তুমি অনুভব করো হিমালয় পর্বতের সামনে বা সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালে। কিন্তু এমন সব বড় জিনিশের সান্নিধ্যে যদি তুমি না আসো, যদি অভিজাত রেস্তোরাঁয় নিয়মিত আসা-যাওয়ার অভ্যাস না গড়ো,

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বইগুলো পড়ার ভেতর দিয়ে বড় হয়ে না-ওঠো—তবে ওই আটআনা নিয়ে ঝগড়া করা তোমার থামবে না, জমির আলের এক আঙুল মাটির জন্যে চিরদিন ভাইয়ের মাথায় দায়ের কোপ বসিয়ে যাবে—একধরনের হীন, ক্ষুদ্র ইতর চিন্তাধারার মধ্যে নিমজ্জিত থেকে শেষ হবে। আজ আমাদের এই জাতি ছোট হয়ে আছে কেন? এর উত্তর পেতে হলে তাদের দিকে তাকাও, যারা জাতিকে পরিচালনা করছে। তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের ঐ বড় গুণগুলো, শক্তিগুলো, মহত্ত্ব বা ঐশ্বর্যগুলো কোথায়? দুঃখের বিষয়, তাদের ওপর সমস্ত জাতি-নির্মাণের দায়িত্ব আজ! তাদের ক্ষুদ্রতার অভিশাপে সারাজাতি ছোট হয়ে আছে।

দেখ, আমাদের দেশে প্রধান সমস্যা দুটো। এক, জনসংখ্যা সমস্যা; দুই, দারিদ্র্য। এগুলোর কথা মনে রাখলে এইমুহূর্তে এই জনবহুল নগরীর প্রধান যানবাহন কী হওয়া উচিত? নিশ্চয়ই ডবলডেকার বাস। একটি ডবলডেকার বাস আসবে এক ধাক্কায় এক-দেড়শো লোক ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলে যাবে। মানুষ শস্তায় যেতে পারবে। অনেক মানুষ যেতে পারবে। এই তো আমাদের যানবাহন-সমস্যার সমাধান। এতে রাস্তার যানজট যেমন কমবে তেমনি ভাড়াও লাগবে অনেক কম। কিন্তু আমাদের শহরের দিকে তাকিয়ে দেখ। আজও আমাদের প্রধান বাহন রিকশা, যাতে দুজনের বেশি কিছুতেই ওঠা যায় না। দেখেশুনে মনে হয় আমাদের দেশের লোকসংখ্যা এত কম যে রিকশাকে প্রধান বাহন না করে যেন কোনো উপায়ই ছিল না। তাই তার ভাড়া এত বেশি—বাসের মাত্র আট গুণ!

আমরা যাব ছোট থেকে বড়র দিকে অথচ আমরা শুধু বড় থেকে ছোটর দিকে যাচ্ছি। বানাব ডবলডেকার বাস, বানাই মিশুক, আমদানি করি স্কুটার, তিন- চাকার দুই-সিটওয়ালা ছোট ছোট অটোকার—পরিবেশ-দূষণে যে-যুগে দানবগুলোর জুড়ি নেই। একটা বড় বাস যে-পরিমাণ পরিবেশদূষণ করে—একটা দুই-স্ট্রোক ইঞ্জিনের বেবিট্যাক্সির দূষণ তার চেয়ে বেশি। অথচ ডবলডেকার টানে একশো প্যাসেঞ্জার, স্কুটার—দুজন। ১০০০ বড় বাস দিয়ে যেখানে ঢাকা শহরের যানবাহন-সমস্যার সমাধান করা যায়—সেখানে ষাট হাজার বেবিট্যাক্সি নামানো হয়েছে রাস্তায়। ফলে পরিবহন ব্যয়ের পাশাপাশি নগরবাসীর স্বাস্থ্যও পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

আমাদের সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে একটা ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র মানসিকতা দেখতে পাবে তোমরা। সবখানে কেবল বড়কে ছেড়ে ছোট, আরো ছোটর দিকে যাবার পাঁয়তারা। মানিক মিয়া এভিনিউ তৈরি করেছিল পাকিস্তানিরা, আমরা নই। এতবড় জাতীয় সংসদ ভবন সে-ও তাদেরই তৈরি। তোমরা কি মনে করো বাংলাদেশ আমলে এটি বানানো সম্ভব হত? আমার সন্দেহ আছে। এমন বিশাল স্থাপত্যকর্ম তৈরির জন্যে যে বলীয়ান স্বপ্ন আর হৃদয় দরকার তা কি আমাদের আছে? নেই। সারাজাতি এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেত। বলত—'অসম্ভব! যেখানে দেশের কোটি

কোটি মানুষ না-খেয়ে মরে যাচ্ছে সেখানে এতবড় বিল্ডিং, এতবড় রাস্তা, এত জায়গার অপচয়! এসব কি আমাদের সাজে?'

আমার ছেলেবেলায়, শাহবাগ হোটেল বানানো হয়েছিল ঢাকা শহরে। এখন সেটা পিজি হাসপাতালের একটা সামান্য অংশ। মাত্র তিনতলা একটা দালান। অথচ সারাদেশে তাই নিয়ে কী মহামারী কাণ্ডই না বেধে গেল। আরে বাবারে! সাদ্দাদের প্রাসাদ বানিয়েছে। আল্লাহর সঙ্গে পাল্লা দিতে চায় নূরুল আমীন। শুনেছি সেকালে মুসলিম লীগ সরকারের পতনের অন্যতম কারণ ছিল ওই ছোট্ট তিনতলা একটুখানি দালান। এই তো আমাদের মন! একটা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তঃকরণ এর চেয়ে আর কী-ই-বা বড় হবে। অথচ দারিদ্র্য ঘোচাতে এই হৃদয়কে আজ বড় না করলেই নয়।

আজ সারাদেশে বড় জিনিশ তৈরি না হলে, বড় বিশাল জিনিশে আমাদের চারপাশ ভরে না উঠলে, আমাদের হৃদয় বড় হবে না। যদি বড় জিনিশ নিজে দেখে আমরা আমাদের হৃদয়কে সেসবের সমান করে তুলতে না-পারি তবে আমরা বড় জিনিশ তৈরি করব কী করে! জাতির নির্মাতারা ধনী না হলে ধনীজাতি কী করে তারা তৈরি করবে? ওই-যে সাভার স্মৃতিসৌধ। কী বিশাল। সেখানে গেলে কী হয়? মনটা বিশাল হয়ে ওঠে। মনে হয়, হ্যাঁ, আমার জাতির মধ্যে বড় কিছু আছে—বড় সম্পদ বড় বৈভব—সেই বৃহৎ জাতীয় বৈভবের আমি অংশ। আমি মনে করি দেশের ছেলেমেয়েদের ওই স্মৃতিসৌধ, ওই সংসদ ভবন দেখাবার নিয়মিত ব্যবস্থা থাকা উচিত। ছেলেমেয়েদের মনে হোক আমাদেরও বড়কিছু আছে, ওই সৌধগুলোর মতো আমরাও বড়। ছেলেমেয়েদের ভেতর কেবল দারিদ্র্য আর ক্ষুদ্রতার চেতনা জন্মালে তারা বড়কিছু তৈরি করতে পারবে না।

দশ মাইল দূর থেকে ইচ্ছা করলে তুমি তাজমহল দেখতে পারো। সে-সুযোগ রেখেছিলেন তাজমহলের স্থপতিরা। আমি বিশ্বাস করি স্মৃতিসৌধের চারপাশেও প্রচুর খালি এলাকা রাখা উচিত—যাতে অনেকদূর থেকে ওটাকে দেখা যায়, দেখে উদ্দীপ্ত হয়ে তার সৌন্দর্যে অভিভূত হওয়া যায়। গাড়ি দিয়ে উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গ থেকে আসার সময় অনেকদূর থেকে যখন এই স্মৃতিসৌধের রূপ আর বিশালতা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন দেশ আর জাতির ভালোবাসায় গর্বে বুকটা ভরে ওঠে। জাতির শ্রেষ্ঠ গৌরবস্তম্ভের সম্মানে এই বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গাটা কি ফাঁকা রাখা উচিত নয়? কিন্তু শুনতে পাচ্ছি উল্টো ব্যাপার। ওখানে মাপজোক হচ্ছে। হিসাবটিসাব চলছে। চারপাশ আবাসিক এলাকা, হাউজিং প্রকল্প, ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট—এসব দিয়ে ওকে ঢেকে দেবার ষড়যন্ত্র চলছে। যেমন ঢেকে দেওয়া হয়েছে কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটের বিদ্যাসাগরের মূর্তিকে। যে বিদ্যাসাগর ছিলেন বাঙালি জাতির অন্যতম প্রধান স্থপতি, সেই বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচু যে

কোথায়, আজ কলকাতায় হেঁটে তুমি বের করতে পারবে না। ফুটপাতের অসংখ্য দোকানের দুর্ভেদ্য অরণ্যের মাঝখানে বিদ্যাসাগরের মাথাটা দেখা যায় কেবল। না, নিচ থেকে বা সামনে থেকে নয়—ওপর থেকে। এরোপ্লেন থেকে তুমি যদি দেখ তাহলেই কেবল তার মাথাটা দেখতে পাবে—দেখবে অসংখ্য কাক কীভাবে জায়গা না-পেয়ে তাঁর মাথাটাকে তাদের প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের নিরাপদ জায়গা বানিয়ে নিয়েছে। জাতির বড় জিনিশগুলো দু-হাতে ধরে উঁচু করে না রাখলে একটা জাতি এভাবেই মরে যায়।

আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদেরও শ্রেষ্ঠ করে গড়তে হবে আমাদের। এরকমভাবে গড়লে চলবে না। আজ সবার বড় হৃদয় চাই। রাজার মতো হৃদয়। রাজার মতো ভাবতে হবে আমাদের। স্বপ্ন দেখতে হবে রাজার মতো। বড়কে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। প্রকৃতির কাছ থেকে অন্তত একটা বড় জিনিশ আমরা পেয়েছি—আমাদের নদীগুলো। আমাদের মানুষগুলো, ঘরগুলো, মানুষের নির্মাণগুলো উপেক্ষা করার মতো হলেও আমাদের নদীগুলো আজও বড়। পদ্মার মধ্যে গেলে, মেঘনার বা ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে বুকটা বিশালতার অনুভূতিতে ভরে ওঠে। মনে হয় একটা সত্যিকার বড়কিছুর বৈভবে ভাগ্যবান আমরা। নদী কূলকিনারাহীন বলেই আমাদের চেতনাতেও আছে সেই কূলকিনারাহীনতা। আমাদের প্রাণেও আছে কূলকিনারাহীনতার আকুতি।

আমাদের সব নির্মাণকেও ওইসব বিশাল বিশাল নদীর চেতনা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের জাতিকে বড় পরিচয়ে পরিচিত করে, ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালির মতো আমরা যেন পৃথিবীকে বড় হৃদয়ের গান শোনাতে পারি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকা যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন ইংল্যান্ডের সাথে তার যুদ্ধ বেধে যায়। এ ইতিহাস সবারই জানা। আমেরিকা স্বাধীনতা চায়—ইংল্যান্ড তা দেবে না। সেনাবাহিনী দিয়ে বিদ্রোহ দমন করবে। এই সংকটকালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সাংসদ এডমন্ড বার্ক বলেছিলেন : 'হে ব্রিটিশ জাতি, তোমরা আমেরিকাকে স্বাধীনতা দিয়ে দাও। কারণ তোমাদের মন ছোট। ছোট মন নিয়ে এতবড় সাম্রাজ্য শাসন করা যায় না।' খুব সুন্দর একটা বাক্যে কথাটা বলেছিলেন তিনি কথাটা : 'লিটল মাইন্ড এ্যান্ড বিগ এম্পায়ার গো ইল-টুগেদার।' হৃদয় ছোট আর জাতি বড়, এটা হয় না। ছোট হৃদয় দিয়ে ছোট বাংলাদেশই আমরা তৈরি করতে পারব। এতদিন তো ছোট মন দিয়ে ছোট বাংলাদেশকেই আমরা তৈরি করেছি। পারমিট, ঘুস, অবৈধতা আর ছুঁচোমির বাংলাদেশ। চলো আজ নির্মাণ করি বড় বাংলাদেশ। তার জন্যে বড় হৃদয় চাই। প্রতিনিয়ত বড়র সান্নিধ্যে থেকে-থেকে বড় হৃদয়।

অনেকে আমাকে বলে, 'আপনারা কি জিনিয়াস তৈরি করবেন?' আমি বলি, 'না, প্রতিষ্ঠান তো জিনিয়াস তৈরির জায়গা নয়। জিনিয়াসরা একধরনের পরাক্রান্ত আদিম স্বজাসম্পন্ন আকস্মিক মানুষ। মানুষ চেষ্টা করলে সভ্যতা তৈরি করতে পারে, আদিমতা কী করে তৈরি করবে। না, জিনিয়াস আমরা তৈরি করতে পারব না, তবে এটুকু বলতে পারি, কোনো জিনিয়াস যদি আমাদের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে যায় সে অশেষভাবে উপকৃত হবে।'

নজরুল ইসলামের প্রচুর প্রতিভা ছিল। রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। কিন্তু নজরুলের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের একটা বড় সুবিধা ছিল। কী সেটা?

(একজন সদস্য : 'পরিবেশ'।)

হ্যাঁ, ঠিক। ওই পরিবেশ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক বড় হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্ন, সৌন্দর্য, জীবনদৃষ্টি, চেতনা-জগৎ সবকিছু পরিপুষ্ট হয়েছিল। ঠাকুর-পরিবারে না জন্মে যদি তিনি দরিদ্র-পরিবারে দুঃখ আর ক্লিষ্টতার ভেতর জন্মগ্রহণ করতেন, যদি আসামের জঙ্গলের কোনো অজপাড়াগাঁয় জন্মাতেন—তাহলে রবীন্দ্রনাথ কি এমন সর্ববিকশিত মানুষ হতে পারতেন?

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আমরা এই উর্বর পরিবেশকে মেলে রেখেছি। উন্নতজীবনে বেড়ে-ওঠার জন্যে যা-কিছু দরকার—এখানে পাবে তার অনেক কিছু। তুমি যদি এসব নিজের ভেতর নিতে পারো—কেউ যদি নিতে পারে, তা হলে আমি জানি তার যা হওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে কিছুটা হলেও বড় সে হবে।

আমাদের কেন্দ্রে অনেক পাঠচক্র আছে, যেখানে প্রতি সপ্তাহেই একটি করে বই পড়া হয়। একবার একটা পাঠচক্র এখানে চলেছিল। সেখানে ৫ বছরে দেড়-দুশো বই আমরা পড়িয়েছিলাম। সেই পাঠচক্রে যারা ছিল তাদের যে-বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল সেটা আমার কাছে এখনো বিস্ময়। এত বই, এত শ্রেষ্ঠ মানুষের এত শক্তিমন্ত চিন্তাপ্রবাহ যখন একটা মানুষের ভেতর দিয়ে বয়ে যায় তখন তার সমৃদ্ধ না হয়ে উপায় থাকে না? তোমরাও এমনি একটা পাঠচক্রে অংশ নিতে যাচ্ছ। তোমাদের বিকাশও অনিবার্য।

এবার একটা গল্প বলে আজকের কথা শেষ করি। একবার আমি গিয়েছিলাম কক্সবাজারে। সমুদ্রের ধারের একটা মোটেলে বসে দিনরাত ঢেউয়ের বুক-কাঁপানো গর্জন শুনতাম। ওভাবে মাস-দেড়েক ছিলাম। তো, একদিন গিয়েছি মাছের বাজারে। গিয়ে দেখি বিরাট লম্বা কী একটা মাছ বাজারের এদিক-ওদিক জুড়ে পড়ে আছে। আস্ত একটা আজদাহা। লম্বায় সাত-আট হাত হবে। অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম : কী মাছ এটা। একজন বলল : বাইন মাছ। অবাক হয়ে বললাম : বাইন মাছ এতবড় হয়? উত্তর দিল : হয় স্যার, সমুদ্রের বাইন এতবড়ই হয়।

ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, নদীতেও তো এমনি ধরনের বাইন মাছ দেখেছি।

বাজারে ওঠে। ঠিক এতবড় নয়। বড়জোর হাত দুই আড়াই। বেড়ের দিক থেকেও অনেক কম। মনে হল ওগুলো তো ছোট হবেই। নদীর প্রস্থ আর কতটুকু? এক ঝটকায় ছুট দিয়ে কদ্দুরই বা যেতে পারে এরা। আধ-মাইল যেতেই পাড়ের সঙ্গে ঠোক্কর খায়। এদের বিকাশ থেমে যায়। এরা ছোট হয়ে আসে। মনে পড়ল, এর চেয়েও ছোট ঠিক এ ধরনের একজাতের মাছও পাওয়া যায় আমাদের খালগুলোয়। ওগুলোর নাম ঠিক বাইনও নয়, অন্য কী একটা যেন। আধ-হাতের চেয়ে লম্বা হয় না। কী করে হবে? ছোট্ট খালে সংকীর্ণ পরিসরে কী করে বড় হবে। কী করে নিজেদের অস্তিত্বকে মেলে ধরবে। খালের পানিতে জোরে ছুটতে গেলেই তো কোনায়-কাঞ্চিতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে হবে। পাড়ে পাড়ে আঘাত পেয়ে কেবলই ছোট থেকে ছোট হতে হবে। তাই ছোট জায়গায় শরীর আঁকাবাঁকা করে আমাদের বাজারে থলির ভেতর করুণভাবে এরা মোচড়ামুচড়ি করে।

কিন্তু ভেবে দেখ সমুদ্রের বাইনমাছের কথা। জোর ঝটকায় এরা এক দমকে চলে যায় মাইলকে মাইল। কী স্বাধীন কী রাজকীয়! দিগ্বিজয়ীর মতো কী পরাক্রান্ত আর উদ্দাম! এই অফুরন্ত অন্তহীন আনন্দ এদের! কোথাও বাধা নেই, বাধা পাওয়ার ভয় নেই। সমুদ্রের বিপুল পরিবেশে নিঃশঙ্ক আনন্দে কেবল উদ্দাম বেঁচে-থাকা। শরীরের কণায়-কণায় জীবনের প্রাণোল্লাসের গান। স্বাস্থ্যে দৈর্ঘ্যে প্রাণশক্তিতে প্রাণীজন্মের নিয়তিকে অতিক্রম না করে তার উপায় কী বলো?

আমি আশা করছি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের এইসব শ্রেষ্ঠ বই আর অবারিত পরিবেশের বিশাল বলীয়ান সমুদ্রে তোমরা তেমনি স্বাস্থ্যময় আর পরাক্রান্ত হবে। তোমরা বড় হও। তোমরা বড় হলে বাংলাদেশ বড় হবে।

শেষ করার আগে একটা দুঃখের কথা বলতে ইচ্ছে করছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের টাকা নেই বলে আমরা সারাদেশের অসংখ্য ছেলেমেয়ের মধ্যে এই কর্মসূচি পৌঁছে দিতে পারিনি। কিন্তু একদিন দেব। একদিন দেবই দেব। আমরা যদি কেবল ছাত্রপ্রতি আজ একটা করে বইও কিনতে পারতাম তা হলে আরো সত্তর-আশি হাজার ছেলেমেয়েকে আমাদের এই প্রক্রিয়ার অংশ করে নিতে পারতাম। দুঃখের বিষয়, আমাদের তাও নেই। তোমাদের মধ্যে সদিচ্ছা থাকায়, আগ্রহ থাকায়, তোমরাই টাকা জোগাড় করে এই পড়াশোনায় অংশ নিতে এসেছ। তাই তোমাদের জন্য অভিনন্দন। কত উৎসাহী ছেলেমেয়ে এসে কত সময় আমার কাছে কত কিছু চায়, চেয়ে-চেয়ে একসময় নীরব হয়ে ফিরে যায়। আমাদের টাকা নেই বলে চুপ করে থাকি। এসব কষ্ট কি একটা দুটো?

এই কর্মসূচি চলতে থাকলে, আমার বিশ্বাস—আগামী দশবছরে তোমাদের মধ্যে বেশকিছু চিন্তাশীল ছেলেমেয়ে আমরা পাব। রোটারি ক্লাবগুলো হয়ে উঠবে মননশীল আর উন্নতমাপের তরুণদের ক্লাব। বহু বুদ্ধিমান মানুষ আসবে এদের

মতিঝিলে কমার্শিয়াল এরিয়াতে যাও, চটপটে চৌকশ সেসব মানুষদের দেখতে পাবে—প্রায় প্রতি তিনজনে একজন। ব্রিফকেস হাতে, বুকপকেটের ভেতর থেকে বেনসন সিগারেটের ঈষৎ আভাস। হ্যাঁ, এমনি অসংখ্য বুদ্ধিমান মানুষ। চোখেমুখে তাদের এমন কথা, একেকজনকে মনে হয় পুরো ফিউচার টেন্স!

কিন্তু আমাদের দেশ আজ যার অভাবে মরে যাচ্ছে, সেটা বুদ্ধিমান মানুষ নয়—বেদনাবিদ্ধ, চিন্তাশীল, আত্মোৎসর্গিত মানুষ।

সেই মানুষ তোমরা হও। আমি তোমাদের জন্যে শুভেচ্ছা রাখছি।

ধন্যবাদ।

নিয়মকানুন

তোমরা নিশ্চয়ই জানো প্রতি সপ্তাহে তোমাদের পড়তে হবে একটা করে বই। এভাবে বছরের বাইশ সপ্তাহে পড়বে ষোলোটা বই। পড়লেই বুঝতে পারবে কী সব অনবদ্য বই আমরা তোমাদের পড়তে দিয়েছি।

তোমাদের জন্যে একটা মূল্যায়ন-পর্ব আছে। পুরস্কার আছে, লোভের ব্যবস্থা আছে। লোভ এবং লাভ এই দুটো নিয়ে হাসাহাসি করতে নেই। এটা না হলে মানুষ কাজ করতে পারে না। কেবল নিজের জন্যে কাজ করাই কি স্বার্থ? পরের জন্যে কাজও কি স্বার্থ নয়? পাড়ায় আগুন লেগেছে, একটা লোক ছুটে চলে গেল আগুন নেভাতে। বালতি বালতি পানি ঢেলে, ফায়ারব্রিগেডে ফোন করে অস্থির করে তুলল। লোকে দেখল লোকটা অন্যের জন্যে দৌড়োচ্ছে। কিন্তু আসলে কি কেবল অন্যের জন্য? নিজের জন্য কি একেবারেই নয়? নিশ্চয়ই নিজের জন্যও। কারণ সে জানে ওই আগুন যদি সে না-নেভায় তাহলে সেই আগুন একসময় তার নিজের বাড়িকেও আক্রমণ করবে। অধিকতর বুদ্ধিমান বলে সে এটা বোঝে। অল্পবুদ্ধির মানুষেরা এটা বুঝতে পারে না। নিজের স্বার্থ যেমন স্বার্থ, তেমনি পরের স্বার্থরক্ষার মাধ্যমে নিজের স্বার্থরক্ষাও স্বার্থ। আমরা সকলে যদি বাঁচি তা হলে আমিও বাঁচব—এটা হচ্ছে উচ্চতর স্বার্থচিন্তা।

আমাদের দেশে বর্তমানে কোন্ স্বার্থ চলছে? কেবল আমার স্বার্থ। আজ সেই মানুষ আমাদের চাই যারা নিজের চেয়ে পরের স্বার্থকে বড় বলে ভাববে। আমাদের দেশে দান করার সময়ও মানুষ নিজের স্বার্থ ভোলে না। আমাদের কাছে অনেকে বলে, 'একটা শেলফ আপনাদের লাইব্রেরিতে দিতে চাই—শুধু শেলফের গায়ে আমার নামটা...।' আরে, তোমার নাম মুজিবর রহমান। এই শেলফের গায় সে নাম লেখা থাকলে কে বুঝবে এটা তোমারই নাম। কেউ তো ভাবতেও পারে, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানই শেলফটা দিয়ে গেছেন। বলো, এসব ভাবনার কোনো মানে হয়? কত মুজিবর রহমানই আছে তো দেশে। হাদিসে কী বলে? 'ডান হাত দিয়ে দান করলে বাঁ হাত যেন জানতে না পারে।' আর আমরা! 'কী রে কেমন দিলামটিলাম? লোকে বলছেটা কী?' আর চারপাশে তো চামচার

দল আছেই : 'হুজুর ওরা বলে, আপনার নাম ছাড়া আর কারো নাম ওরা নাকি জানেই না। আপনাকে পেয়ে ওরা যে কী খুশি হয়েছে হুজুর, ওরা আজ কদিন ধরে নাকি সেই আনন্দে ঘুমোতেই পারেনি। ঠিক করেছে, আরো এক মাস ঘুমোবে না।'

এবার, তোমাদের মূল্যায়ন পরীক্ষার নিয়মকানুন বলে দিই। বইগুলো পড়ার পর তোমাদের একটা মূল্যায়ন পরীক্ষা হবে। এই মূল্যায়ন পরীক্ষা একটা খুব সহজ জিনিস। এই প্রসঙ্গে একটা চুটকি মনে পড়ছে।

ব্রিটিশ আমলে পূর্ববঙ্গের বাঙালরা কলকাতায় গেলে, কলকাতার ছেলেছোকরারা তাদের নানাভাবে হেনস্থা করত। তাদের নিয়ে হাসাহাসি করত। একবার বরিশালের এক লোক গেছে কলকাতায়। তার হাতে ঘড়ি। সে রাস্তায় বেরিয়েছে, কলকাতা ঘুরতে। এক জায়গায় দেখল দুটো ছোকরা—দুই ভাই—রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই ছোটভাইটা তাকে জিজ্ঞেস করল : 'ক'টা বাজছে দাদা?' বরিশালের লোকটা দেখল ঘড়িতে দুটো বাজে। কিন্তু বলতে গিয়ে ভাবল বরিশালের উচ্চারণে 'দুইটা' বললে ওরা তো বাঙাল ভেবে হাসাহাসি করবে। কলকাতার ভাষাতেই বলি। হেসে বলল, 'দুইটো।'

ছোটভাই বাঁকা হেসে বড়ভাইকে বলল : 'দেখলি দাদা, বেরিয়ে গেছে।'

তোমাদের এইসব মূল্যায়ন পরীক্ষা থেকেও তেমনি বেরিয়ে যাবে তোমাদের কে 'দুটো' আর কে 'দুইটো'।

তোমরা তো জানো, বইপড়ার জন্য আমরা পুরস্কার দিই। তোমাদেরও দেব। আমাদের এই পুরস্কারের বুদ্ধিটা খুব খারাপ নয়, কী বলো?

দেখবে লাভের পথ ধরেই মানুষ প্রথমে কাজের ভেতরে আসে।

যদি বলা হত, 'শুধু বই পড়িতে হইবে, আর কিছুই দেয়াথোয়ার নেই'—আমার ধারণা এখানে এত জ্ঞানতাপসের সমাগম হত না। তোমরা ঠোঁট উল্টিয়ে বলতে, 'ও, সবই তাহলে মুখে-মুখে।'

আমি অনেক সময় ছাত্রদের বলি, কেউ যদি তোমাদের বলে, 'তোমরা খুব ভালো করে পড়াশোনা করো, ভালো রেজাল্ট করো, স্ট্যান্ড করো, ডক্টর হও, পিএইচ.ডি. ডি. এসসি. যা-কিছু ইচ্ছে হও, তবে এক শর্ত পাস করলে ওই ডিগ্রি দিয়ে চাকরি মিলবে না।' তা হলে কয়জন জ্ঞানতাপস ক্লাসে বসে থাকবে তা আমি একটু জানতে চাই।

আসলে, মানুষ প্রথমে স্বার্থের প্রয়োজনে এসে জড়ো হয়। তারপর স্বার্থকে অতিক্রম করে। সে-কারণে, আমরা পড়ার সঙ্গে একটু মধুর সংযোগ রেখে দিয়েছি। এই পুরস্কারগুলো সেই মধু। মধু না-থাকলে মাছি আসবে কেন? মাছি আসলে, কিছু মাছি মধুর মধ্যেই থেকে যাবে আবার কিছু মাছি মধুর প্রাথমিক লোভ অতিক্রম করে উচ্চতর লোভের দিকে চলে যাবে।

[বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে রেকর্ডসংখ্যক [illegible] অংশগ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে [illegible] কর্মকর্তা ও সদস্য-সদস্যাদের উদ্দেশে বক্তৃতা : [illegible]]

সম্পূর্ণতর জীবনে বাঁচো

ছোট ছোট ছাত্রবন্ধুরা,

ছাত্রদের আগে আমি বন্ধু বলেই সম্বোধন করতাম—এখন সাহস হয় না। ভয় লাগে হয়তো বলে বসবে : আপনি বুড়ো হয়ে আমাদের বন্ধু বলেন কেন? আপনার সাহস তো কম নয়!

খুব ভালো লাগছে তোমাদের দেখে; মনটা ভরে যাচ্ছে। অনেক বছর ধরে তোমাদের এই কলেজে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচি চলছে। বরাবরের মতো এবারেও তোমরা অনেকে এতে যোগ দিয়েছ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমরা পুরস্কার পাবে। ওখানে পুরস্কারগুলো সাজানো আছে। সবার সামনে দিয়ে পুরস্কারগুলো তোমরা নিতে আসবে বিনীত ভঙ্গিতে, পুরস্কার নিয়ে ফিরে যাবে গর্বিত পায়ে। স্কুল ছুটি হলে এগুলো নিয়ে বাড়ি যাবে। হয়তো একটু লুকিয়েই ঢুকবে বাড়িতে, ভাবটা এমন যেন কিছুই নেই তোমার হাতে। তোমাকে ওভাবে ঢুকতে দেখে মা'র হয়তো সন্দেহ হবে। বলবেন : 'কিরে, ওভাবে ঢুকছিস কেন? হাতে তোর কী যেন দেখছি।' তুমি সসংকোচে বলবে, 'না, না, কী আবার, এমন কিছু না।' তবু মা নাছোড়বান্দা। 'দাঁড়া তো দেখি তোর হাতে কী।' তারপরে পুরস্কারগুলো দেখে তো তাঁর চোখ ছানাবড়া। 'এ্যাঁ, বই, মানে বই পুরস্কার পেয়েছিস তুই? এতগুলো বই!' তুমি তখন সহাস্য গর্বের সঙ্গে বলবে, 'কী আর করা বলো! না দিয়ে যে ছাড়ল না!' (ছাত্রছাত্রীদের হাসি।)

এইরকম এক-আধটা ঘটনা হয়তো আজ ঘটবে তোমাদের কোনো কোনো বাসায়। তোমাদের দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছে এজন্য যে, আমি যখন তোমাদের বয়সী ছিলাম তখন এই ধরনের কোনো পুরস্কারের সৌভাগ্য আমার হয়নি। যেটা করতে গেছি সেটাতেই ব্যর্থ। একবার নাম দিয়েছিলাম ইংরেজি কবিতা আবৃত্তিতে।

আশা ছিল কিছু-একটা পাব। খুব মন দিয়ে প্র্যাকটিস করেছি। আবৃত্তিও করছি চমৎকার। বিচারকদের চেহারাও সপ্রশংস। প্রাইজ জুটেই যায় আর কী। এমন সময় হঠাৎ ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। মন দিয়ে আবৃত্তি করছি, হঠাৎ উইংস-এর পাশ থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল—'তাড়াতাড়ি'! কে কাকে 'তাড়াতাড়ি' বলল কে জানে। হয়তো কেউ আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিল, তাই কেউ চিৎকার করে উঠেছে : 'তাড়াতাড়ি'! কিংবা কাউকে বলা হয়েছে দৌড়ে এক গ্লাস পানি আনতে, সে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, তাতে কেউ চেঁচিয়ে উঠেছে : 'তাড়াতাড়ি।' কিন্তু আমার কেন যেন মনে হল কথাটা আমাকেই বলেছে। হয়তো আমি কবিতাটা আস্তে আস্তে পড়ছি দেখে চেঁচিয়ে বলেছে : 'তাড়াতাড়ি'। মানে : 'এত আস্তে আস্তে পড়ছিস কেন রে গাধা? ওতে কি প্রাইজ হবে? জলদি পড়—'তাড়াতাড়ি।' আর যায় কোথায়। ছুটিয়ে দিলাম পাগলা ঘোড়া। পড়ছিলাম আস্তে আস্তে, হঠাৎ একশো মাইল গতিতে পড়া শুরু করলাম। বিচারকরা হতভম্ব। 'কী হল রে ছেলেটার? ভালোই তো পড়ছিল। হঠাৎ ইঁদুরের মতো দৌড় লাগাল কেন?'

পুরস্কারের আশা মাঠে মারা গেল। কিন্তু ও না হলেই যে নয়। কী করে পুরস্কার পাই? অনেক ভেবে ঠিক করলাম স্পোর্টসেই নাম দেব। কিন্তু তাতেই পুরস্কার কি অত সোজা! মাসের পর মাস প্র্যাকটিস করলে তবেই না পুরস্কার। কিন্তু আমি তো কিছুই প্র্যাকটিস করিনি। কী করে পারব? না, লংজাম্প-হাইজাম্প হবে না। আমি এমনই মোটা ছিলাম যে আমার পক্ষে নিচের দিকে পড়া যত সহজ, ওপরের দিকে ওঠা ততটাই কঠিন। কাজেই ওতেও আশা নেই। পোল-ভল্টও হবে না—বাঁশ ভেঙে যাবে। ভেবে দেখলাম কোনোকিছুতেই আশা নেই। কিন্তু প্রাইজ-যে না পেলেই নয়। অন্তত একটা প্রাইজ।

হঠাৎ মাথায় একটা চিন্তা এসে গেল। না, আছে। আছে একটা আইটেম। প্র্যাকটিস ছাড়াও ওতে অনেক সময় প্রাইজ মিলে যায়। দৌড়, পেছনদিকে দৌড়। কেউ ওটা প্র্যাকটিস করে না। ব্যস, নেমে গেলাম কোমর বেঁধে। স্বপ্ন ব্যর্থ হল না। প্রথম দ্বিতীয় পুরস্কার না-পেলেও জুটে গেল 'থার্ড' প্রাইজটা। (সবার হাসি) পুরস্কার হিশেবে যা পাওয়া গেল তা-ও খুব সম্মানজনক নয়। একটি চায়ের চামচ। তাও আবার প্লাস্টিকের। (সবার হাসি) কিন্তু সম্মানজনক না হলে হবে কী? ঐ চামচ দিয়ে আমি চারপাশের সবাইকে একেবারে অস্থির করে তুললাম। আব্বার বন্ধুরা যখন ড্রয়িংরুমে বসে সরগরম আড্ডা দিতেন, তখন আমি ঘরের এককোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে ঐ চামচটা নাকের সামনে ধরে এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করতে থাকতাম। আশা : কেউ নাকি তবু জিজ্ঞেস করে : 'খোকা, তুমি চামচ নাড়ো কেন?' তখন আমাকে আর পায় কে? গর্বের হাসি হেসে বলা যাবে, 'হুঁহ, হুঁহ, হুঁহ, অত সোজা এ প্রাইজ নয় গো। এ হল গিয়ে 'থার্ড প্রাইজ'। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে তবে এ পাওয়া।'

যা হোক, এই হল আমার শৈশবের ইতিহাস। এজন্য কাউকে পুরস্কার পেতে দেখলে আমি একদিকে যেমন খুশি হই তেমনি মনের ভিতরে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাসের শব্দও শুনতে পাই। প্রতিটা প্রাইজ-পাওয়া ছেলেমেয়েকে দুর্লভ জগতের মানুষ বলে মনে হয়।

যাই হোক, তোমরা তো আমাদের বইপড়া কার্যক্রমে অংশ নিয়ে আজ পুরস্কার পেতে যাচ্ছ। কিন্তু কেন এই কর্মসূচি আমরা করি; কেন দেশ-বিদেশের মজার মজার বই, সুন্দর সুন্দর বই, স্বপ্নের মতো বই তোমাদের পড়তে দিই; এসো এবার সে-সম্বন্ধে কিছু বলি। প্রথমে আমাকে তোমরা বলো, তোমরা ক্লাসে যেসব পাঠ্যবই পড়ো সেগুলো তোমাদের পড়ার দরকার আছে কি নেই।

(ছাত্ররা : আছে।)

নিশ্চয় আছে। মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে, মর্যাদার জীবন পেতে হলে, ঐ বই আমাদের পড়তেই হবে। যদি আমরা এসব বই ঠিকমতো না পড়ি—তাহলে আমরা কোনোদিন আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারব না। মানবসভ্যতাকেও এগিয়ে নিতে পারবে না। আমাদের বেঁচে-থাকাটাই ছোট হয়ে যাবে। তাই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ওটা আমাদের করতেই হবে। বিশেষ করে তোমাদের মতো এমন ছবির মতো সুন্দর আর পরিপাটি একটা স্কুলে যদি পড়ার কারো সৌভাগ্য হয় তবে তো এ আরও বেশি করে করতে হবে।

চিন্তা করে দেখ কত সুন্দর বিশাল একটা স্কুলে তোমরা পড়ো। কী বিরাট মাঠ তোমাদের, কী অনবদ্য পরিবেশ। আমাদের তুলনায় কত ভাগ্যবান তোমরা। মনে আছে, তোমাদের তুলনায় কত আলোহীন, ভ্যাপসা, অন্ধকার স্কুলের মধ্যে আমি পড়েছি। সেই ইশকুলের দম-আটকানো ঘুপচির ভেতর আমাদের কল্পনা আর অনুভূতিগুলো কীভাবে তিলে তিলে শেষ হয়ে গেছে। তোমরা যখন বড় হবে আর ছেলেবেলার কথা মনে করবে তখন তো ভাবতে পারবে : কত সুন্দর আর অনিন্দ্য একটা স্কুলে/কলেজে তোমরা পড়েছিলে। পরিতৃপ্তিতে তোমাদের মন ভরে যাবে। জানো তো, এদেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই কিন্তু তোমাদের মতো এমন সুযোগ পায় না।

তো, পাঠ্যবই তো তোমাদের পড়তেই হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি কিছু অপাঠ্যবইও আবার পড়া দরকার। দিনের সঙ্গে রাত যেমন দরকার, প্রাসাদের সঙ্গে সরোবর যেমন দরকার তেমনি। পাঠ্যপুস্তক পড়ে তোমরা সুশিক্ষিত হবে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে, বৈষয়িক জীবনকে জয় করবে। আর এই-যে বাইরের বই, যেগুলোকে অনেকে অপাঠ্য মনে করে দূরে সরিয়ে দেন—এগুলো পড়লে তোমাদের মন বিকশিত হবে। ভেতরের স্বপ্নগুলো বড় হবে। তোমরা সুন্দর মানুষ হিশেবে গড়ে উঠবে।

মৌলবীবাজার নামে ঢাকায় একটা জায়গা আছে জানো? কোথায় বলো তো?

(একজন ছাত্র : পুরোনো ঢাকায়।)

ঠিক বলেছ, পুরোনো ঢাকায়। সেখানে কী হয় জানো? সে এক অদ্ভুত কাজের জগৎ। সেখান থেকে ঢাকা মহানগরীর যাবতীয় চাল, ডাল, গম, তেল, আলু, মশলার চালান আসে। তাই সেখানে আছে গুদাম, আড়ৎ, হাজারো কেনাবেচার ব্যবস্থা। সেখানে অনেক কাজ, অনেক ব্যস্ততা, হুড়োহুড়ি, আর ঠাসাঠাসি। মানুষ-গাড়ি-জিনিশপত্রের বিকট শব্দে উত্তেজনায় দম-আটকানো অবস্থা। তোমরা সেখানে গেলে দেখবে সেই অন্ধকার গলিঘুঁজিওয়ালা গিঞ্জি জায়গায় তোমাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, ভিড়ের চাপে চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছ।

এবার বলো তো, এই জায়গাটার দরকার আমাদের আছে, না নেই? আছে। ঐ-জায়গা থেকে যদি আমাদের চাল-ডাল, নুন তেল বা প্রতিদিনের দরকারি জিনিশগুলো না আসত তাহলে আমাদের দৈনন্দিন বেঁচে থাকাই সম্ভব হত না। এই মিলনায়তনে এভাবে দার্শনিকের গাম্ভীর্য নিয়ে তোমরা বসে থাকতে পারতে না। খাবারের জন্য এতক্ষণ ছোটাছুটি শুরু করতে। পেট চোঁ-চোঁ করত। জানচর্চা শিকেয় উঠত। আমাদের প্রথম কাজ বেঁচে থাকা। ভালোভাবে, সুষ্ঠুভাবে বেঁচে-থাকা। তারপরে আমাদের বিকাশ : বড় হওয়া; সমৃদ্ধ হওয়া।

তাই ঢাকা শহরে কেবল মৌলবীবাজার চকবাজার নেই, এদের মতোই আরেকটা জায়গা আছে, এসো এবার তাদের দিকে তাকাই। জায়গাগুলো চকবাজার মৌলবীবাজারের ঠিক উল্টো। মৌলবীবাজার যেমন সারাক্ষণ কাজে শ্রমে ঘামে জ্যাবজেবে, ওগুলোতে তেমনি কোনো কাজই নেই। কোন্ জায়গা বলো তো এটা? বলো তো, ঢাকা শহরে এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে কোনো কাজ নেই? কেবল সারবাধা গাছপালা আর বসে বসে গল্প করা।

(একজন ছাত্র : রমনা পার্ক।)

ঠিক বলেছ, রমনা পার্ক। মানুষের কোনো কাজ নেই ওখানে! মানুষ সেখানে অযথাই বসে থাকে, গল্প করে, চিনাবাদাম খায়, ঘুরে বেড়ায়, প্রেম করে। আলসেমিতে, অবসরে, অর্থহীন আনন্দে সময় কাটানোর জন্যে সেখানে যায়। জীবনের বাস্তবতা থেকে দূরে নীল আকাশের নিচে সবুজের রাজ্যে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয়। তো, এখন তোমরা বলো, ঢাকা শহরে শুধু মৌলবীবাজার চকবাজার থাকলেই কি চলবে? নাকি রমনা পার্কও থাকতে হবে?

(সবাই : রমনা পার্কও থাকতে হবে।)

ঠিক। থাকতে হবে, কারণ কেবল কোনোমতে টিকে থাকলেই আমাদের চলে না, আমাদের পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে হয়। কেবল ক্ষুধার খাদ্য হলেই চলে না, ফুলেরও দরকার হয়। কী বলেছিলেন রসুলুল্লাহ (সা.)? যদি একটা পয়সা জোটে তবে

ক্ষুধার খাদ্য কিনো, যদি দুটো পয়সা জোটে তবে দ্বিতীয় পয়সা দিয়ে কিনে নিও ফুল। এর জন্য দেখ সরকার কী খরচটাই না করেছে। রমনা পার্কের ভেতর যে-জায়গাটুকু আছে তার দাম কম করে হলেও কত হবে বলো তো? অন্তত পাঁচ হাজার কোটি টাকা! কী বোকা আমাদের সরকার, তাই না? কাজকর্ম নেই পাঁচ হাজার কোটি টাকার জায়গা অযথাই ফেলে রেখেছে। কত কিছুই তো করা যেতে পারত ও দিয়ে! হাজার হাজার দালান তুলে আর দশটা চকবাজার, মৌলভীবাজার বানাতে পারলে কত লাভই না হত! কিন্তু মনে রেখো, মানুষ অত বোকা না। নিশ্চয়ই এ দিয়ে কোনো কাজ হয়। না হলে ও-জায়গা ওভাবে ফেলে রেখেছে কেন?

কী কাজ হয় রমনাপার্ক-চন্দ্রিমা উদ্যান দিয়ে? এসো এবার তাই নিয়ে কথা বলি। বেঁচে থাকার জন্য মৌলবীবাজারের যেমন দরকার তেমনি মনের আনন্দের জন্য, সম্পন্ন জীবনের জন্য রমনা পার্কেরও দরকার। দুটোর কোনোটাই না হলে হবে না। কেন দুটোই দরকার, এই কথাটা এবার বুঝিয়ে বলি। যে-জিনিশ যতবেশি কাজ করে, গায়ে খাটে, পরিশ্রম করে, তার চেহারা ততো কদাকার হয়ে পড়ে। যেমন বিশাল বিশাল ট্রাক। সারাদিন গোঁ-গোঁ করে মাল টানছে, পশুর মতো খাটছে। সবই আছে তাদের, টাকাপয়সারও রোজগার অনেক। কিন্তু একটা জায়গাতে অভিশপ্ত। ওরা দেখতে বড় কদাকার আর বদখত। একেবারেই সুন্দর না। যাকে খুব বেশি শরীরের খাটনি খাটতে হয়, তার সৌন্দর্য মরে যায়। চকবাজার মৌলবীবাজারকে অনেক ভারী ভারী মোট টানতে হয়, তাই ওর সৌন্দর্য নেই। তুমি কোনো বন্ধুকে বলে দেখ না : চলো না ভাই, মৌলবীবাজার থেকে একটু হাওয়া খেয়ে আসি। দেখ সে কী বলে? একইভাবে যে-জিনিশের ব্যবহার কম, প্রয়োজন কম, জীবনের কোনো কাজেই প্রায় আসে না, দেখবে তার মধ্যে ততবেশি সৌন্দর্য। এজন্য রমনাপার্ক ঢাকাশহরের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা।

তোমাদের এই স্কুলের মধ্যে দালান আছে, কোঠা আছে, অফিস আছে, ক্লাস আছে। কিন্তু এসব কিছুর চেয়ে সবার চেয়ে সুন্দর কী এই স্কুলের? ওই বিরাট দিগন্তছোঁয়া মাঠটা, তাই না? এই মাঠ দিয়ে কি কোনো কাজ হয়? মাত্র একটা জিনিশই হয় : তা হল আনন্দ। সেখানে খেলা হয়, প্রাণভরে নিশ্বাস নেওয়া হয়। ঐ অফুরন্ত সবুজের ভেতর নিজেকে প্রজাপতির মতো হারিয়ে ফেলা যায়। এই মাঠ দিয়ে জীবনের কোনো বাস্তব কাজ হয় না। অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানদারি, লাভ-মুনাফা কিছুই না।

তাজমহলের কথা ধরো, তাজমহল দিয়ে কি কোনো কাজ হয়? এতবড় একটা স্মৃতিসৌধ। পৃথিবীর রমণীয়তম দালান। সেকালে নয় কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছিল। সে-টাকা একালের হয়তো ষাট হাজার কোটি টাকার সমান। অথচ দেখ, এতবড় আর অনিন্দ্যসুন্দর একটা দালান, একুশ হাজার লোক বাইশ বছর

পরিশ্রম করে যে-দালান বানিয়েছে, সেই দালানে এক রাত্রির জন্য থাকাও যায় না। কোনো কাজেই লাগে না সে। কাজে লাগে না বলেই ও অত সুন্দর। তুমি যাও না, গিয়ে বলো না, 'বাবা, আমি একজন বাংলাদেশী মুসাফির, দেন না আমারে এইখানে এক রাত্রের মতো থাকতে।' দেবে থাকতে? ঐ তাজমহলকে কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না। করলে ও আর তাজমহল থাকবে না। ওর সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে। সে মৌলবীবাজার হয়ে যাবে। এতবড় একটা দালান, মাত্র একদিনের জন্য ওখানে শ-দুই গরু রাখো না? ও কি তাজমহল থাকবে?

এই জীবনের যত জিনিশ আছে সবই আমাদের লাগবে। আমাদের যেমন মৌলবীবাজার লাগবে, তেমনি আবার রমনা-পার্কও লাগবে। এতে একদিকে যেমন বাস্তব প্রয়োজন মিটবে, তেমনি সৌন্দর্যের বা উচ্চতর আনন্দের প্রয়োজনও মিটবে। তাই দুয়ে মিলে আমরা পূর্ণ হব। আমাদের পাঠ্যপুস্তকও লাগবে, আবার আউট-বইও লাগবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের সুন্দর সুন্দর বইগুলো লাগবে। কেন লাগবে? একটা বই মানে কী? রবীন্দ্রনাথের একটা বই মানে কী? এর মানে কি কেবল কতগুলো পৃষ্ঠা, কতকগুলো কালো-কালো অক্ষরের টানা-টানা লাইন? তা তো নয়। রবীন্দ্রনাথের একটা বই মানে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু আনন্দময়, যা-কিছু আলোময় ছিল, সেসবেরই তো সমাহার। সুতরাং তাঁর কোনো বই যখন পড়ি তখন কতগুলো কাগজের পৃষ্ঠাই শুধু পড়ি না, রবীন্দ্রনাথের অন্তরের সমস্ত সৌন্দর্য, দীপ্তি, আলোকেও আমরা স্পর্শ করি। সে-আলো আমাদের মধ্যে চলে আসে। আমি কিছুটা হলেও রবীন্দ্রনাথ হয়ে যাই। অন্তরের মধ্যে একটা জ্যোতিপ্রবাহ তখন খেলা করে। আমি যদি শেক্সপিয়ার পড়ি তবে তাঁর জ্যোতিও আমার মধ্যে আসবে। যদি প্লেটো পড়ি তবে তাঁর জ্যোতিও আসবে। যদি এ্যারিস্টটল পড়ি, হাদিস পড়ি, কালিদাস পড়ি, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মানুষদের শ্রেষ্ঠ ও সৌন্দর্যময় লেখা পড়ে যাই, তাহলে একদিন আমি কি এই আমি থাকব? থাকব না। আমি আমার চাইতে অনেক সুন্দর, অনেক সৌন্দর্যমণ্ডিত, বড় স্বপ্নে বড় ভালোবাসায় আর মূল্যবোধে-ভরা একজন মানুষ হয়ে যাব। এইজন্যে এই বইগুলো আমরা তোমাদের পড়তে দিয়েছি।

আমাদের মৌলবীবাজারও লাগবে, আবার তাজমহলও লাগবে। মানুষের দরকার বড় বিশাল। পৃথিবীর সবকিছু না হলে মানুষ বাঁচে না। শেখ সাদির একটা অসাধারণ কথা আছে। কথাটা হল : এক জায়নামাজে নয়জন সুফির জায়গা হয় কিন্তু একরাজ্যে দুজন রাজার জায়গা হয় না। হৃদয়ের ভেতর প্রতিটি মানুষই রাজার মতো, বাঁচতে তার অনেক কিছু লাগে। ছোট্ট ঘরের সংকীর্ণ কুঠুরির মধ্যে সে বাঁচতে পারে না। তাকে ছড়িয়ে পড়তে হয় অনেক দূরে। এই দেখ না, এতগুলো জানালা কেন এই অডিটোরিয়ামে। মনে হচ্ছে জানালাই যেন আছে, দেয়ালই বরং

নেই। এ আছে এজন্যে, যাতে বাইরের পৃথিবীর সাথে তোমার ভেদাভেদ ঘুচে যায়। তুমি বাইরের সমান হয়ে ওঠো। বিশ্বচরাচরের সমান হয়ে যাও। প্রতিটা বই এমনই একটা জানালা। এইজন্য, উচ্চতর মানুষ হওয়ার জন্য পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি তোমাকে সারা পৃথিবীর সুন্দর সুন্দর বইও পড়তে হবে।

আমি কথা এখানেই শেষ করি। তোমরা যারা বই-পড়ার জন্য এসেছ তাদের আমি অভিনন্দন জানাই। যারা আসোনি তাদেরও বলি : চলে এসো। জীবন বারবার আসে না। টি.এস. এলিয়টের একটা অসাধারণ কথা আছে : There is nothing again. আবার বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। তোমরা হয়তো লক্ষ করেছ যে সাপলুডুর মধ্যে নানান ঘরে নানান আকারের সাপ হাঁ করে বসে থাকে। এদের মুখ থাকে ওপরের দিকে, বড় সংখ্যার ঘরে। লেজ নিচের দিকে, ছোট সংখ্যার ঘরে। সবচেয়ে বড় সাপটা থাকে ৯৮-এর ঘরে। ওর মুখে পড়লে আর রক্ষা নেই, সোজা চলে আসবে ৯-এ। এখন ধরো, তুমি যেতে যেতে ৯৬-তে চলে গেছ। এবার তুমি শেষ চালটা দিচ্ছ। আশা তুমি জিতে যাবে। কিন্তু চালে পড়ল দুই। তুমি পড়লে গিয়ে সোজা ৯৮-এর সাপের মুখের ভেতর আর সে-সাপ গপ করে তোমাকে গিলে পাঠিয়ে দিল ৯-এর ঘরে। তুমি বলে উঠলে : থুরি, না, না, হয়নি, চালটা আবার দিতে চাই। এটা কি হবে কোনোদিন? কেউ কি মেনে নেবে? নিলেও কি তা বৈধ হবে? পৃথিবীতে 'আবার' বলে কিছু নেই। কোনো চাল দুবার দেওয়া যায় না।

তোমাদের এই তরুণ বয়সও আর আসবে না। এখন তোমরা কিশোর, তরুণ। তোমরা অনুভূতিময়, স্পর্শকাতর, সংবেদনশীল, গ্রহণক্ষম, অসীম সম্ভাবনাসম্পন্ন। এখন তোমাদের ভেতর সমস্ত পৃথিবী ভিড় করে পাতা মেলার জন্য অধীর হয়ে আছে। তোমরা এখন উৎকর্ণ, উন্মুখ। এইসময় মনটাকে খোলা রাখো। বিশ্বচরাচরে যতকিছু আছে, সব দিয়ে তাকে ভরে দাও। মানুষ ছোট্ট জীব, কিন্তু সারা পৃথিবীর সবকিছু তার দরকার। আমাদের জন্য হয়েছে এই বিশ্বের সবকিছুর জন্য। জীবনের যতটুকু বাদ দেবে, জীবন ততটুকু ছোট হয়ে যাবে। জীবনের যা-কিছু সুন্দর এবং ভালো, তাকে তোমরা দুহাতে লুটে নাও। তোমরা যারা এ-কর্মসূচিতে এসেছ, তোমাদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমরা আরো বেশি করে এসো। যারা এখনো আসনি তারাও এসো। এ হচ্ছে তোমাদের জীবনের তাজমহল, রমনা পার্ক, চন্দ্রিমা উদ্যান। একে একবার হারিয়ে ফেললে আর কোনোদিন পাবে না।

[ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল কুল ও কলেজে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতা : ২০০০]

লাইসেন্স দিয়ে বাঘ মারা

ছোট ছোট ছাত্রী বোনেরা,

বোন বলায় তোমরা আবার চটে গেলে না তো? হয়তো ভেতরে ভেতরে বলছ : বোন বললেন কেন, বলুন নাতনিরা! আমরা তো আপনার নাতনির বয়সী! কিন্তু জানো আমার কিন্তু তোমাদের বোন বলতেই ভালো লাগছে। ভাইবোনের সম্পর্কটা ভারী একটা প্রীতি আর মাধুর্যের সম্পর্ক; দাদা-নাতনির সম্পর্কটা অত কাছের নয়। তাই বোন বলেই তোমাদের সম্বোধন করছি। আমি একটু আগে সভানেত্রীর কাছে জিগ্যেস করেছিলাম তোমরা যেভাবে এতক্ষণ খটমট করে ড্রিল করলে তাতে তোমাদের হাসতে আবার মানা-টানা নেই তো? উনি অভয় দিয়েছেন—না, হাসতে ওদের মানা নেই, ড্রিল শেষ হলেই হাসতে পারবে। কী, হাসির কথাটথা বললে তোমরা হাসবে তো, নাকি এমনি ড্রিলই করতে থাকবে?

(মেয়েরা : হাসব, হাসব)

তাহলে একটা ছোট্ট হাসির গল্প দিয়ে শুরু করি। অবিশ্যি তোমরা চাইলে কান্নার গল্প দিয়েও শুরু করতে পারি। বলো কোন্‌টা করব? হাসির না কান্নার?

(মেয়েরা : হাসির, হাসির।)

ঠিক আছে। মুশকিলটা হচ্ছে কী জানো? সামনের বিরাট অন্ধকার মাঠে তোমরা বসে আছ। তোমরাও আমাকে দেখছ না, আমিও তোমাদের দেখছি না। কী করে তোমাদের সঙ্গে কথা হবে? তবে সবসময় কথা বলার জন্য যে মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হতেই হবে এমনও কথা নেই, অনেক সময় কথায় কথায়ও আমাদের দেখা হতে পারে। আমাদের সেইভাবে এখন দেখাদেখি হোক, কেমন?

এবার গল্পটা বলি। আমরা যখন ছোট সে-সময় আমার আব্বার বেশ বড়সড় একটা ভুঁড়ি ছিল। (পরে অবিশ্যি সেটা কমে গিয়েছিল।) আব্বার ওই ভুঁড়ি

ছেলেবেলায় ছিল আমাদের অপরিসীম মর্মবেদনার কারণ। যখনই আমাদের কোনো বন্ধু আমাদের অপমান করতে চাইত তখন সে শুধু বলে উঠত, 'তোর বাবার ভুঁড়ি'। ব্যস, আমাদের খেল্ খতম। এতবড় জলজ্যান্ত একটা ভুঁড়ি চোখে দেখে কী করে বলা যায় : কোথায় আব্বার ভুঁড়ি? অথবা আব্বার ওটা যদি ভুঁড়ি হয় তো তোর বাবার যেটা ওটা কী? আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতো অত বুদ্ধি তো আমাদের ছিল না। তাই চুপ করে সেই অপমান সহ্য করতাম। আব্বার ভুঁড়ি নিয়ে যখন আমাদের এমনি বেহাল অবস্থা, তখন একদিন আমাদের এক বন্ধু তার মামার বাড়ি থেকে শুনে এসে ভুঁড়ি সম্বন্ধে একটা গল্প আমাদের বলল। গল্পটা মজার :

দুই বন্ধুর মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে : কার মামার ভুঁড়ি কত বড়। একজন বলল, 'বুঝলি, ভুঁড়ি হচ্ছে আমার মামার।'

'কত বড়?' অন্যজন প্রশ্ন করল।

'সুবিশাল।'

'কত সুবিশাল?'

'না বেশি সুবিশাল নয়, তবে আকাশে যখন ঝড়-বৃষ্টি ওঠে টোঠে, তখন জনা বিশ-পঁচিশেক লোক এর নিচে আশ্রয়-টাশ্রয় নিতে পারে আর কি।' (মেয়েদের হাসি)

শুনে অন্যজন বলল : মাত্র বিশ-পঁচিশ জন? তাই নিয়ে এত গর্ব! শোন্ তবে আমার মামার গল্প। ভুঁড়ি কী দেখতে হলে দেখতে হবে তাঁকে।

'কত বড়?'

'ভুঁড়ি সে তো নয়, যেন একটা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করে শরীর থেকে বেরিয়েই যেতে চায়। (হাসি) আর তা যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে সেইজন্য আমার মামি বুদ্ধি করে একটা কাজ করেছেন! ভুঁড়িটার নিচে একটা বড়সড় রিকশার চাকা লাগিয়ে দিয়েছেন। ভুঁড়িটাকে রিকশার সিটে চাপিয়ে মামা আজকাল সারা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আরেকটা ব্যাপার : উনি যাতে ওটা নিয়ে শহরের ভিড়ভাট্টার মধ্যেও বিনাবাধায় ঘুরে বেড়াতে পারেন সেজন্য আমার মামাতো ভাইও করেছে আর-এক কাণ্ড। ভুঁড়িটার একপাশে সাইকেলের একটা বড়সড় বেল লাগিয়ে দিয়েছে। উনি যেদিক দিয়েই যান সেদিকে ক্রিং-ক্রিং, ক্রিং-ক্রিং করে বেল দিতে দিতে যান : মানে সরো, সরো, ভুঁড়ি আসছে, ভুঁড়ি আসছে, হুঁশিয়ার সাবধান...।' (মেয়েদের হাসি)।

কয়েক বছর পর প্রায় একই ধরনের একটা গল্প শুনেছিলাম আমার আর এক বন্ধুর কাছ থেকে। সে গল্পটাও মজার :

তিন বন্ধুর মধ্যে গল্প হচ্ছে : কার মামা কত বড় শিকারি। একজন বলল, 'সেরা শিকারি হচ্ছে আমার মামা।'

'কী রকম?'

'গিয়েছেন তিনি একবার সুন্দরবনে। সুন্দরবনে কী মারতে যায় লোকে জানিস তো?'

'জানব না কেন, রয়েল বেঙ্গল টাইগার।'

'ঠিক। তো মামার সঙ্গে আছে তার চাকর। চাকরের কাছে বন্দুক গুলি এসব। হঠাৎ একটা বাঘ এসে লাফ দিয়ে পড়ল সামনে। মামা দেরি করলেন না। হুঙ্কার দিয়ে চাকরকে বললেন 'বন্দুক দে।' চাকর চট করে বন্দুক এগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মামা হাঁক দিলেন, 'গুলি দে।' চাকর খুঁজে দেখে ভুলে গুলি আনা হয়নি। ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'গুলি তো আনিনি স্যার! ভুলে গেছি।' মামা চোখ রাঙিয়ে গর্জে উঠলেন। কিন্তু করবেন কী, বাঘ তো না-মারলেই নয়। তাই খালি বন্দুক দিয়েই বাঘের দিকে করলেন এক প্রাণঘাতী ফায়ার। এমন ফায়ার যে দাঁড়ানো অবস্থাতেই বাঘ শেষ।' (হাসি)

তখন দ্বিতীয় বন্ধু বলল, 'আরে তোর মামা আবার শিকারি নাকি! বন্দুক দিয়েই তো সবাই বাঘ মারে। শিকারি হচ্ছে আমার মামা। শোন্ কী দিয়ে তিনি বাঘ মেরেছিলেন? গেছেন সুন্দরবনে। এক বিশাল বাঘ লাফ দিয়ে পড়েছে সামনে। মামা গর্জে উঠলেন 'বন্দুক দে'। এমন গর্জন যে শুনেই বাঘের প্রায় দফা রফা। এ চাকর আবার তোর মামার চাকরের চাইতে সরেস। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, 'স্যার বন্দুক তো আনি নাই, ভুলে গেছি।' মামা হুঙ্কার দিলেন, 'তবে গুলিই দে।' বলেই চাকরের হাত থেকে গুলিটা নিয়ে তাই দিয়েই করে দিলেন বেমক্কা এক ফায়ার। এমন ফায়ার যে, বাঘ এক পাও নড়তে পারল না।'

তৃতীয়জন হেসে বলল, 'আরে, তোদের মামারা আবার শিকারি হলো! বন্দুক গুলি এসব দিয়েই তো লোকে বাঘ মারে। শোন্ কীভাবে মেরেছিলেন আমার মামা। গেছেন সুন্দরবনে। সামনে লাফিয়ে পড়েছে এক বেয়াদব বাঘ। বুঝতে পারেনি কার সামনে পড়েছে। মামা গর্জন করে চাকরকে বললেন 'বন্দুক দে।' চাকর আরো সরেস। বলল, 'বন্দুক যে আনি নাই স্যার।' মামা ক্ষিপ্ত। বললেন তবে 'গুলিই দে।' চাকর বলল : 'গুলিও যে আনতে ভুলে গেছি স্যার।' মামা এখন করেনটা কী! বাঘ না মারলে তো চলে না! হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'তবে লাইসেন্সটাই দে।' (হাসি) বলে সেই লাইসেন্স দিয়ে এমন ফায়ার করলেন যে, বাঘ এক পাও নড়তে পারল না। (বিস্তর হাসি)।

তো আমাকে এখন তোমরা একটা কথার উত্তর দাও এখন, লাইসেন্স দিয়ে কি বাঘ মারা যায়?

(মেয়েরা একসঙ্গে) : না!

যায় যে না তার প্রমাণ কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা হেসে উঠেছ। সত্যি,

লাইসেন্স দিয়ে বাঘ মারা যায় না। কিন্তু একজন শিকারির কি লাইসেন্স থাকতে হয়, না হয় না? (মেয়েরা : থাকতে হয়, থাকতে হয়।) যদি লাইসেন্স না থাকে তবে তার বন্দুক, অস্ত্র, গুলি সব কী হয়ে যায়? (সবাই নিশ্চুপ)। অবৈধ হয়ে যায়। যে-মানুষটার বন্দুক সে-ও অবৈধ হয়ে যায়। তাকে জেলখানায় পুরে দেওয়া হয়। কাজেই একজন শিকারির লাইসেন্স না-থাকলে চলবে না। আমি আর কথা বাড়াব না। একটা কথা বলেই শেষ করব। দেখ, ১৯৭১ সালে আমাদের জাতি একটা লাইসেন্স পেয়েছিল। বলো তো লাইসেন্সটার নাম কী?

(ছাত্রীরা : স্বাধীনতা)

ঠিক বলেছ। এবার বলো তো, লাইসেন্সটা দেখতে কেমন?

একজন ছাত্রী : কালচে সবুজ আর মাঝখানে লাল সূর্য।

ঠিক বলেছ। সেই লাইসেন্স পতপত করে এখন সারা পৃথিবীর বুকে ওড়ে, তাই না? শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর যে-দেশেই যাও, সেখানে কোথাও-না-কোথাও আমাদের এই লাইসেন্সটিকে দেখবে পাবে। বলো তো এ লাইসেন্স কিসের লাইসেন্স?

(সবাই : স্বাধীনতার।)

হ্যাঁ, আমরা যে একটি বৈধ স্বাধীন সার্বভৌম জাতি, এটা তার প্রমাণ। ওটা না হলে কিছুতেই আমরা বিশ্বের মর্যাদাবান নাগরিক হতে পারতাম না। সারা পৃথিবীতে মুক্ত স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারতাম না।

এবার আর-একটা কথার উত্তর দাও। লাইসেন্স থাকলে একজন মানুষের অস্ত্র বৈধ হয় ঠিকই, কিন্তু লাইসেন্স থাকলেই কি একজন মানুষ শিকারি হয়ে যায়? নাকি শিকারি হতে আরো কিছু লাগে?

(ছাত্রীরা) : লাগে।

কী কী লাগে বলো দেখি?

(ছাত্রীরা) অস্ত্র।

হ্যাঁ, ঠিক : অস্ত্র। অস্ত্র বন্দুক গুলি সবকিছুই লাগে। না হলে বাঘ মরবে কী দিয়ে? কিন্তু কেবল অস্ত্র থাকলেই কি একজন মানুষ শিকারি হয়ে যায়? নাকি আরো কিছু লাগে।

'লাগে।'

'কী লাগে?'

(একজন ছাত্রী : স্বাস্থ্য।)

চমৎকার! স্বাস্থ্য। হ্যাঁ, স্বাস্থ্য লাগে—শক্তি লাগে। আর কিছু লাগে কি?

(একজন ছাত্রী : সাহস।)

চমৎকার। হ্যাঁ, সাহস লাগে। না হলে অমন শক্তিশালী বাঘের সামনে দাঁড়াবে

কী করে?

(অন্য এক ছাত্রী : বুদ্ধি।)

হ্যাঁ, ক্ষিপ্রবুদ্ধিও দরকার। কিন্তু এটুকু হলেই কি হয়? নাকি আরো কিছু লাগে?

হ্যাঁ, লাগে। চেষ্টা লাগে, সংকল্প লাগে। আর কী লাগে একজন ছাত্রী : 'প্রশিক্ষণ।' ঠিক বলেছ, প্রশিক্ষণ। এই যে তোমরা এত সুন্দর নাচ দেখালে, ড্রিল করলে এটা কি এমনি হয়েছে? নাকি অনেকদিনের চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম আর প্রশিক্ষণ লেগেছে। হ্যাঁ, সেই প্রশিক্ষণ লাগে। শিকারি হতে গেলে অনেক কিছুই লাগে। স্বাস্থ্য, শক্তি, যোগ্যতা, সাহস, ক্ষিপ্রতা, প্রশিক্ষণ, মনোবল, একাগ্রতা, নিষ্ঠা, জয়ের ইচ্ছা, দুর্বার আকাঙ্ক্ষা কত কিছু না লাগে এর জন্য। তবেই না মানুষ বড় শিকারি হয়। একইভাবে আজকে আমরা যদি আমাদের জাতিকে বড় করতে চাই তাহলে কি শুধু ওই লাইসেন্স দিয়ে, ওই পতাকাটুকু দিয়ে চলবে? নাকি আরো কিছু লাগবে? কী কী লাগবে বলো দেখি? (ছাত্রীদের জবাব : শিক্ষা।)

হ্যাঁ, যেটা রণদাপ্রসাদ সাহা বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন যে শিক্ষা মানে আলো। এই আলো যার জীবনের মধ্যে প্রজ্বলিত হয় চারপাশটাকে সে উজ্জ্বল করে রাখে। যদি দেশের সবার মধ্যে প্রজ্বলিত হয় তবে সারাদেশ তারা উজ্জ্বল করে রাখবে। তিনি জানতেন, শিক্ষা মানুষের সবচাইতে বড় শক্তি যা দিয়ে জাতি বা দেশ শক্তিমান হয়, বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। তাই, শিক্ষার জন্য তিনি এই অসাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে রেখে গেছেন।

হ্যাঁ, শিক্ষা লাগবে। আর কী লাগবে? (একটি মেয়ে : সাহস)। ঠিক বলেছ। সাহস সাধনা এসব ছাড়া কি জাতি বড় হতে পারে? কাজেই চেষ্টা, পরিশ্রম, আবেগ, বুদ্ধি, যোগ্যতা, সাধনা, শ্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, জ্ঞান, বিবেক, আত্মোপলব্ধি, কত কিছু লাগবে—তবে না আমাদের দেশ বড় দেশ হবে। আমরা মাথা উঁচু করে পৃথিবীর সামনে দাঁড়াব।

এবার তোমাদের আর একটা ছোট্ট গল্প বলে শেষ করি। তোমরা সম্ভবত আরব্য-উপন্যাসের ধীবর আর কলসির গল্পটা জানো। সেই যে এক জেলে সমুদ্রে জাল ফেলে মাছ ধরছিল। তো, সেই জালে বাধল একটা খুব ভারী জিনিস। বিপুল তার ওজন। ধীবর তো খুশি। আজকে না-জানি কতবড় মাছ পড়েছে। কিন্তু জাল তুলতেই তার চোখ চড়কগাছ। এ কী? এ যে একটা বড়সড় কলসি। মুখটা বন্ধ। জেলে তাড়াতাড়ি কলসির মুখ খুলে ফেলল। আর অমনি ঘটল এক অবাক ঘটনা। একটা বিশাল দৈত্য বের হল সেই কলসির ভেতর থেকে। তার পা মাটিতে, মাথা আকাশে। আকাশ বাতাস দাঁপিয়ে সে বলল, 'স্বর্গ, মর্ত, পাতালে আমার চাইতে বড় কেউ নাই আই ... আই.. আই..।' টেলিভিশনে যেভাবে বলে। 'সারা পৃথিবী আমার হাতের মুঠোয়..ওয় ..ওয়..ওয়..।' তার এত শক্তি যে পৃথিবীতে সে যা চায়

তাই করতে পারে। তার অসাধ্য কিছু নেই। এখন আমার বক্তব্য : হে দৈত্য, তোমার তো এত অন্তহীন শক্তি আর ক্ষমতা। তোমার অসাধ্য তো কিছুই নেই। তাহলে এমন বিশাল শক্তি নিয়ে হাজার বছর ধরে তুমি এই তুচ্ছ কলসির মধ্যে বন্দি হয়ে ছিলে কেন? কী নেই তোমার? তোমরাই বলো না : কলসির মধ্যে এমন শক্তিমান দৈত্যটার কী ছিল না যার জন্য ওই ছোট্ট কলসিটার ভেতর হাজার বছর ধরে তাকে বন্দি হয়ে থাকতে হয়েছিল। (একটা মেয়ে : জ্ঞান) হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। জ্ঞান। তার জ্ঞান ছিল না। তাই সে নিজের শক্তিকে চিনতে পারেনি। সে ছিল জড়, নির্বোধ, মূঢ়। তার বুদ্ধি ছিল না। কিন্তু জ্ঞান ছিল না কেন? স্বর্গমর্ত পাতালে যার অসাধ্য কিছু নেই, কলসির মধ্যে তার বুদ্ধি হারিয়ে গেল কেন? কী ছিল না কলসির মধ্যে যা না থাকলে সবরকম বুদ্ধি হারিয়ে যায় বলো তো? (একটা মেয়ে : আলো)। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আলো ছিল না ঐ মুখবন্ধ কলসির মধ্যে। আলো ছিল না বলে দৃষ্টি ছিল না। নিজেকে বা পৃথিবীকে বোঝার দেখার উপায় ছিল না। তাই বুদ্ধি ছিল না, জ্ঞান ছিল না। একটু আগে তোমাদের সবার হাতের প্রদীপগুলো এক এক করে জ্বলে উঠে যেভাবে পুরো স্কুলের অঙ্গনকে এক হাজার আলোর এক উজ্জ্বল জগৎ করে তুলেছিল, কলসির সংকীর্ণ বদ্ধ পৃথিবীতে সেই আলোর উজ্জ্বলতা নেই। নিজেকে, অন্যকে, বিশ্বচরাচরকে চেনার জানার বোঝার পথ নেই।

যে আলো দিয়ে আমরা অন্ধকারকে দূর করি, জগৎকে প্রজ্বলিত করি, নিজেকে ও জগৎকে চিনি, এসো আমরা তাতে সবাই আলোকিত হই। তোমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জানতেন, আলো এমন একটা দীপ্তি; যা কেবল প্রদীপ থেকে প্রদীপে নয় হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছুটে চলে। তোমরা সেই আলোকে জ্বালিয়ে রেখো।

[ভারতেশ্বরী হোমস-এর ছাত্রীদের উদ্দেশে বক্তৃতা : ১৯৯৯]

ব্রাহ্মণের বাড়ির কাকাতুয়া

ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা,

প্রথমে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছাটা-যে খুব সজাগভাবে জানাতে পারছি, তা নয়। কারণ এই মুহূর্তে আমি আসলে ঘুমোচ্ছি। গত পনেরো বছর ধরে আমি দুপুরবেলা ঘুমাই। এটা আমার সিদ্ধান্তে নয়, ডাক্তারের আদেশে। যেদিন দুপুরে এরকম অনুষ্ঠান বা জরুরি কিছু থাকে, ঘুমোতে পারি না, সেদিন আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়, মস্তিষ্ক বোকা হয়ে যায়। জেগে-জেগে আমি ঘুমোতে থাকি। আমি এতক্ষণ উত্তরা থেকে গাড়ি চালিয়ে এখানে এসেছি এবং আমার ধারণা, ঘুমোতে ঘুমোতেই এসেছি। আমি-যে অন্য কোনো মানুষ বা গাড়ির ওপরে আমার গাড়ি তুলে দিইনি তার কৃতিত্ব আমার নয়, তাদের। তারা প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে বলেই হয়তো বেঁচে গেছে। এরকম করুণ অবস্থা নিয়ে আমি তোমাদের এই কর্মসূচিতে কেন ডেকে এনেছি তা ব্যাখ্যা করার জন্য দাঁড়িয়েছি। যদি হঠাৎ বাবার নাম বলতে নানার নাম বলে ফেলি তোমরা নিজগুণে ক্ষমা কোরো। (হাসি)।

এখন মূল কথায় আসি। আমরা যখন দশম শ্রেণীতে পড়তাম, তখন আমাদের একটা প্রবন্ধ পড়তে হয়েছিল; নাম : 'আকাঙ্ক্ষা'—লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধটার প্রথম লাইনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "বৃদ্ধ সেজে আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাইনে।" কিন্তু 'চাইনে' বলে দীর্ঘ দশপৃষ্ঠা ধরে দুঃসহতম বাংলায়, দুর্বোধ্যতম বক্তব্যে উনি যে-উপদেশ আমাদের দিয়েছিলেন, সেটা এখনো আমাদের হাড়ে হাড়ে গেঁথে আছে। না, আমার বক্তৃতায় তেমন হবার আশঙ্কা নেই। তবু কিছু কথা তোমাদের কাছে এখন আমাকে বলতে হবে। সেই বিরক্তিকর পর্বের জন্য আটঘাট বেঁধে বসো। প্রথমে শুরু করি তোমাদের একটা দৈনন্দিন ব্যাপার দিয়েই।

তোমরা যখন রসগোল্লার দোকানের পাশ দিয়ে যাও, তখন সেদিকে নিশ্চয়ই

আড়ে আড়ে চাও। কী, চাও কিনা?

(ছাত্র-ছাত্রীরা : চাই। চাই।)

কেন চাও সেটা বলে আমি তোমাদের লজ্জার মধ্যে ফেলতে চাই না। (হাসি)। পকেটে পয়সা থাকলে হয়তো দোকানে ঢুকে পড়ো। না-থাকলে "আমি রসগোল্লা খাই না" বলে ভাঁট মেরে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে এভাবে পায়ের পাতা নাড়াতে থাকো। (ভঙ্গি ও ছাত্রছাত্রীদের হাসি)

এখন, সবাই এমন একটা অবস্থার কথা কল্পনা করো : তুমি একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছ। চোখের ওপর থরে-থরে সাজানো আছে পান্তুয়া, রসগোল্লা, প্রাণহরা, চমচম, মিহিদানা, রসমালাই। [কী নাম সব! নাম শুনেই যে জিভের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।] কিন্তু পয়সার অভাবে সুবিধা করা যাচ্ছে না। সুবিধা না-করতে পারার আরো কারণ রয়েছে। দোকানের দরজার পাশেই বসে আছে একটা অসভ্যরকমে স্বাস্থ্যবান লোক। তার ভীতিকর চাউনি আর বিরাট গোঁফজোড়ার আকার-আকৃতি কোনোটাই খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কাজেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে দোকান পেরিয়ে চলে না গিয়ে উপায় কি? কিন্তু ধরো, হঠাৎ কখনো যদি ঘটে এমনি একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা : তাকিয়ে দেখ দোকানের মুখে সেই দৈত্যের মতো লোকটা নেই! কাচের দরজা-জানালাগুলোও পুরো খোলা; লোহার গ্রিলট্রিল অদৃশ্য। আশপাশে কোথাও কেউ নেই। সামনে শুধু সেই মিষ্টিজগৎ, তার উদার আমন্ত্রণ, আর এদিকে দাঁড়ানো তুমি। তুমি তখন কী করবে?

টেলিভিশনে নিশ্চয়ই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা বিজ্ঞাপন দেখছে। একটা হাতি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ উড়তে শুরু করে। (সবাই হাসতে থাকে) আমার ধারণা, তোমারও হবে ওরকমই অবস্থা। ওভাবেই উড়ে গিয়ে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়বে রসগোল্লাদের ওপর। মিষ্টির রস সিরা চোখে-মুখে মেখে, মিষ্টির সাগরে সাঁতার কেটে প্রাণভরে স্বাদ মেটাতে থাকবে।

আমার এখন প্রশ্ন : মিষ্টির যে স্বাদ আছে, রসগোল্লার যে এত মজা—এটা তোমরা জানলে কী করে?

(ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে : খেয়েছি বলে।)

ঠিক। খেয়েছ, তাই। আব্বা বাসায় নিয়ে এসেছেন, খেয়েছ। মামার বিয়েতে খেয়েছ। আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে খেয়েছ। খেতে-খেতে এমন হয়েছে যে, এখন আর রসগোল্লা তোমার মুখের সামনে এনে নাড়তে হয় না। নাম শুনলেই জিভে পানি এসে যায়। মিষ্টি-যে মজা, শিককাবাব-যে মজা, কাচ্চি বিরিয়ানি-যে মজা এটা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। কাজেই কোনোকিছুর আসল মজা জানতে হলে তাকে ভালো করে জানতে হয়, বারে বারে তার স্বাদ নিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে একটা বিরাট দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, বহু জিনিশের ভেতরেই যে

এমন অবিশ্বাস্য মজা লুকিয়ে আছে সেটা জানার সুযোগ আমাদের সমাজ বা মানুষ কেউ আমাদের দেয় না। যেমন ধরো, বই। বই সত্যিই একটা মজার জিনিশ? সত্যিই ভারি সুন্দর।

[গ্যালারি থেকে একজন ছাত্রের অস্পষ্ট গলা শোনা গেল : 'টুম। এতক্ষণে লাইনে এসেছে।']

দেখেছ, ও টের পেয়ে গেছে। এদের নিয়ে মহামুশকিল। এত বুদ্ধি নিয়ে রাত্রে এরা ঘুমায় কী করে বলো তো? (ছাত্রছাত্রীদের হাসি, হইচই)

ওর বুদ্ধির জন্য ওকে প্রশংসা করছি। কিন্তু মনে রেখো : যার অভাবে দেশ আজ ডুকরে ডুকরে কাঁদছে, তা বুদ্ধি নয়, শুভত্ব। আমাদের দেশে আজ বুদ্ধিমান মানুষের অভাব নেই। অভাব ভালোমানুষের। স্বার্থের প্রশ্নে কারো বুদ্ধির কোনো ঘাটতি দেখা যায় না। কিন্তু যে-মানুষ যা পেতে পারত, নিতে পারত—তা নিচ্ছে না, ছেড়ে দিচ্ছে, বিলিয়ে দিচ্ছে, এমন মানুষ আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে না। এসো, তাই আমরা চালাকি ফেলে আজ সেই সহৃদয় বোকা আর বেদনাবান মানুষদের খোঁজ করি।

এখন এসো দেখতে চেষ্টা করি বই কী জিনিশ? বলো তো, বই দেখতে কেমন?

(একজন ছাত্র : চারকোনা।)

হ্যাঁ, চারকোনা। চারকোনা আর লম্বাটে। ভেতরে শাদা শাদা পৃষ্ঠা আর প্রতি পৃষ্ঠার ওপর ছোট ছোট কালো অক্ষরের টানা-টানা সারি। এবার বলো তো, একটা 'সুন্দর' বই আসলে কী? এটা কি কেবল বাঁধাই-করা কিছু পৃষ্ঠা, কেবল কতগুলো কালো কালো অক্ষরের সারি?

না, একটা সুন্দর বই তা নয়। এসো, শেখ সাদির একটা ছোট্ট কবিতা শুনে বোঝার চেষ্টা করি একটা ভালো বা সুন্দর বই জিনিশটা আসলে কী। কবিতাটা এরকম :

এক কবি একদিন একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে পেয়েছেন। ঢেলাটাকে নাকের কাছে আনতেই দেখলেন তার গায়ে মিষ্টি অপরূপ গন্ধ। আচ্ছা, মাটির গন্ধ কি খুব মিষ্টি আর অপরূপ?

(কয়েকজন ছাত্রছাত্রী : না।)

তবে কেমন?

(সবাই নিশ্চুপ)

না, মাটির গন্ধ মিষ্টি বা অপরূপ নয়। মাটির গন্ধ 'সোঁদা সোঁদা'। কবিতায় আছে : 'ভেজা মাটি থেকে আসে সোঁদা-সোঁদা গন্ধ'—তেমনি। ভোঁতা বিষাদ আর বিবমিষা-জাগানো গন্ধ এর। দেশপ্রেমিক কবি হলে হয়তো হৃদয়ের আবেগ দিয়ে লিখবেন : 'আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন।' কিন্তু তুমি কবিকে সবিনয়ে

অনুরোধ করতে পারো, 'কবি সাহেব, মাটির গন্ধটা যখন আপনার এতই পছন্দ তখন নাকটা ওর ভেতর ঠেসে ধরুন না কিছুক্ষণের জন্য, মধুর ঘ্রাণটা কেমন দেখেই নিন না।' আমি জানি কবি যতবড় দেশপ্রেমিকই হোন এমন কোনো প্রীতিকর বা সুখকর ঘ্রাণ তাতে পাবেন না।

না, মাটির গন্ধ মিষ্টি-অপরূপ কিছুই নয়। মাটির গন্ধ বিস্বাদ, ভ্যাপসা, নাড়ি-ওগড়ানো। কিন্তু কবি দেখলেন, মাটির ঢেলায় স্নিগ্ধ অপরূপ গন্ধ। অবাক হয়ে মাটির ঢেলাকে জিগ্যেস করলেন, 'মাটির ঢেলা, তোর গায়ে তো এমন সুগন্ধ থাকার কথা নয় রে। এমন সুঘ্রাণ কী করে এল?'

মাটির ঢেলা তখন কবিকে কী বলল, সেটা এবার শোনো। বলল, 'কবি তুমি ঠিকই বলেছ। আমার গন্ধ সুন্দর নয়। কিন্তু কি জানো? একটা ব্যাপারে আমি ছিলাম ভাগ্যবান। আমি যে-জায়গাটায় ছিলাম তার ওপরে ছিল একটা বড়সড় বসরাই গোলাপের গাছ। অপূর্ব গন্ধে ভরা অজস্র গোলাপ ফুটত সে-গাছে। বহুকাল ধরে তাদের সৌগন্ধময় পাপড়িরা ঝরে পড়েছে আমার ওপর। পড়তে পড়তে তাদের গন্ধ একসময় আমার শরীরের সাথে জড়িয়ে গেছে। তাই আমার গন্ধ গোলাপের মতো এত সুন্দর হয়েছে।'

এখন বলো তো, সুন্দর মহৎ বা ভালো বই লেখেন কারা? যাঁরা সুন্দর, মহৎ বা জ্যোতির্ময় মনের অধিকারী তাঁরা? না ক্ষুদ্র, হীনচেতা বা অকর্ষিত মনের অধিকারীরা?

(ছাত্রছাত্রীরা : সুন্দর মনের অধিকারীরা।)

এবার বল, তাদের মন বা অনুভূতি-জগৎ কেমন হবার কথা? নিশ্চয়ই সৌন্দর্যে, মহত্ত্বে, ঐশ্বর্যে আর দীপ্তিতে ভরা। তাই যদি হয় তবে তাঁদের লেখা একটা বইয়ের কেমন হবার কথা? নিশ্চয়ই তাঁদের হৃদয়ের ওইসব কমনীয় মাধুরীতে আর জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। তাদের মনের অপরূপতা আর সুঘ্রাণে আমোদিত।

বলো তো রবীন্দ্রনাথের একটা বই মানে কী? রবীন্দ্রনাথের মনের ভেতর যত আনন্দ ছিল, যত সৌন্দর্য ঐশ্বর্য দীপ্তি আর মাধুরী ছিল, তার সবকিছুই তো আছে ঐ বইয়ে। তাঁর ভেতরকার সব আলো আর সৌন্দর্যই তো তিনি রেখে গেছেন এই বইয়ের পাতায় পাতায়। তাহলে ঐ বই কি একটা সৌন্দর্যগন্ধময় বসরাই গোলাপের মতো নয়? কাজেই তুমি যখন তাঁর কোনো বই পড়ো তাহলে কী হয়? রবীন্দ্রনাথের ভেতরের ওইসব সৌন্দর্য, আনন্দ, মেধা, দীপ্তি, আলো তোমার মধ্যে এসে যায়, তাই না? এমনিভাবে তুমি যদি তাঁর অনেকগুলো বই পড়ে ফেল তবে কি অমনি অনেক সৌগন্ধময় ফুল তোমার ওপর ঝরে পড়ল না? ঝরে ঝরে তোমাকে আরো সুন্দর আর অনুপম করে তুলল না? তুমি কি আর তখন তুমি থাকলে? নাকি আরো সুন্দর মানুষে পরিণত হলে? রবীন্দ্রনাথের মতন অমন অনবদ্য দেহকান্তি হয়তো

তোমার হবে না, কিন্তু তোমার ভেতরে একটু রঙিন-রঙিন ভাব এসে যাবে—এটুকু তো ঠিক। একইভাবে তুমি যদি পৃথিবীর সেরা লেখকদের সেরা আর সুন্দর বইগুলো পড়ে ফেল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের সুন্দর সুন্দর বইগুলো পড়ো, তখন কি তুমি আজকের এই সাধারণ মানুষটি থাকবে? ওই অনন্য বইগুলো সারাক্ষণ গোলাপের পাপড়ির মতো তোমার মনের ওপর ঝরে ঝরে তোমাকে কি সাধারণের চাইতে অনেক সুন্দর আর বড় করে তুলবে না?

(ছাত্রছাত্রীরা : তুলবে।)

এর মানে তুমি তখন নিজের চেয়ে অনেক আলোময়, স্বপ্নময়, ঐশ্বর্যময় মানুষ হয়ে উঠবে। এখন বলো তো, বই এত সুন্দর একটা জিনিশ, এ আমাদের এত উপকার করে; তবু আমাদের দেশের মানুষ বই পড়তে চায় না কেন?

এর একটা কারণ হল আমিই তোমাদের বলে দিই : বই-যে আমাদের কত বড় করে তোলে, ছেলেবেলায় তা জানার সুযোগ আমাদের হয় না। আমরা যখন খুব ছোট, আমাদের মন যখন সবচেয়ে অনুভূতিময়, অনুসন্ধিৎসু আর নতুনকে গ্রহণের জন্য আর্ত, সে-বয়সে এমনি কিছু সুন্দর স্বপ্নময় বই কেউ আমাদের হাতে তুলে দেয় না। দিয়ে বলে না : এই বইগুলো পড়ো। এখানে তোমার সম্পূর্ণতা, বিকাশ, আলোক-জ্বলিত মুক্তি।

সৌন্দর্যের স্পর্শ না-পেয়ে-পেয়ে আমাদের মন একসময় এই জীবনের আনন্দলোকের আহ্বানে সাড়া দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের হৃদয়ের মৃত্যু ঘটে। তখন এই-যে বই—যা দোকানের রসগোল্লার চেয়েও বড় রসগোল্লা, পৃথিবীর সবচেয়ে সজীব রসে আনন্দে-ভরা রাজভোগের চাইতেও রসালো রাজভোগ, তা আমাদের জিভকে আর উদ্দীপ্ত করে না।

হৃদয়ের আনন্দ নিয়ে তাই বইয়ের দিকে আমরা আমাদের উন্মুখ হাত বাড়িয়ে দিই না। তবে এর আরেকটা কারণও আছে। আমরা এদেশের মানুষেরা বইকে চিনি একটিমাত্র চেহারায়। বলতে পারো, কী হিশেবে বইকে আমরা চিনি?

(একজন ছাত্র : পাঠ্যবই হিসেবে।)

ঠিক বলেছ। তোমরা তো দেখেছ স্কুল-কলেজ জীবনে কী ভয়াবহ কষ্ট দিয়ে আমাদের এগুলো গেলানো হয়। আমরা যখন খুব ছোট, আমাদের মন যখন আকাশের নিচে একটু একটু করে পাখা মেলছে—সেই সময় পাঠ্যবই নামের এই ভয়াল দৈত্যের ভার চাপিয়ে দেওয়া হয় আমাদের ওপর। অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্যদিয়ে এগুলো আমাদের মুখস্থ করতে বাধ্য করানো হয়। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আনন্দের ভেতর দিয়ে সেগুলোকে জীবনের সম্পদ করে তোলা হয় না। পরীক্ষায় ভালো ফল করানোর জন্য বইগুলো আমাদের ওপর এত অত্যাচার করে যে বই জিনিশটাকেই আমরা ভয় পেতে শুরু করি। বই-যে একটা স্বপ্ন আর সৌন্দর্যে-ভরা জিনিশ তা

আমরা ভুলে যাই। বই আমাদের কাছে হয়ে পড়ে আতঙ্ক আর ভীতির বিষয়। কারো বিয়েতে বই উপহার দিতে গেলে তার মুখটা বিমর্ষ হয়ে যায় :

'বই আনলেন!'

চেহারাটা এমন করে ফেলে যেন বইগুলোকে মুখস্থ করে কাল সকালে তাকে পরীক্ষা দিতে হবে। বইয়ের মুখস্থের সঙ্গে নিম্নমানের পরীক্ষাপদ্ধতি এমন কুৎসিতভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছে যে বইয়ের মতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আর সুন্দর জিনিশও আজ আমাদের কাছে বিভীষিকা হয়ে পড়েছে। বইয়ের ঐশ্বর্যময় জগৎ আমার দরজায় এসে ডাক দিলেও আমরা আর সাড়া দিচ্ছি না।

২

বলো তো, রবীন্দ্রনাথ কি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন?

(একজন ছাত্র : মারা গেছেন।)

কোন্ সালে?

(অন্যজন : ১৯৪১ সালে।)

ঠিক বলেছ। সত্যিই তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু ধরো, হঠাৎ যদি এমন অদ্ভুত একটা কথা শোনা যেত যে—তিনি মারা যাননি। বেঁচে আছেন। কেবল বেঁচে আছেন না, তিনি ঠিক করেছেন আজ এই ২২ জানুয়ারি বিকেল চারটা পঁয়ত্রিশেই তিনি ঢাকা শহরে আসবেন। না, শুধু ঢাকা শহরে নয়, তিনি আসবেন সোজা আমাদের এই 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে'। হ্যাঁ, এখানে, যেখানে তোমাদের সঙ্গে আমি কথা বলছি। তোমাদের না-দেখতে পেয়ে তাঁর নাকি অনেকদিন থেকে ঘুমই হচ্ছে না। তোমাদের দেখার জন্য তিনি একেবারে অস্থির হয়ে রয়েছেন।

এখন ধরো শোনা গেল যে তিনি এসে গেছেন, হ্যাঁ ওইখানে—ওই গেটটার সামনে। ধরো, শুনতে পেলে তিনি গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন।—এই অবস্থায় কী করতে তোমরা? এখানে বসে থাকতে? বসে বসে আমার এই ছেঁদো কথা শুনতে? না কি, হইচই, দৌড়াদৌড়ি, হুড়োহুড়ি করে ছুটে যেতে গেটের দিকে?

(একজন ছাত্র : ছুটে যেতাম।)

ঠিকই বলেছ। ছুটে যেতে। আর যদি হঠাৎ শোনা যেত কেবল রবীন্দ্রনাথ নন, নজরুল ইসলামও আছেন তাঁর সঙ্গে। তা হলে কী হত? হুলুস্থুলটা আরো বেশি হত, না কম? (ছাত্রছাত্রীদের হাসি)। বেশি হত, তাই না? ধরো যদি শুনতে, শুধু রবীন্দ্রনাথ-নজরুল নন, শেক্সপিয়রকেও মাইল-দেড়েক দূরে দেখা গেছে। তিনিও আসছেন। তা হলে? (সবার হাসি)

না, কেবল এঁরা নন, আসছেন পৃথিবীর সব বড় বড় মানুষেরা, শ্রেষ্ঠ মনীষীরা—

এরিস্টটল আসছেন, প্লেটো আসছেন, আসছেন সক্রেটিস, আইনস্টাইন, রুশো, কালিদাস, দান্তে, খৈয়াম—সবাই। ওইখানে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ওই গেটের সামনে, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে। কী করতে তখন? পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে না তোমরা? তাঁদের দেখার জন্য, অটোগ্রাফ নেবার জন্য দাপাদাপি খুনোখুনি শুরু করতে না? একটা হাজার-টনি বোমা পড়ার মতো অবস্থা হত না?

এবার বলি আসল কথা। আমি যদি বলি যে-যে মনীষীদের জন্য তোমরা এভাবে ছুটে যেতে, সত্যি তাঁরা আজ এসেছেন আমাদের এই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে; কেবল এসেছেন নয়, তাঁরা অনেকদিন থেকেই এখানে রয়েছেন। হ্যাঁ, ওপরের তলার ওই ঘরটার ভেতর, ওই লাইব্রেরি-ঘরটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকদিন থেকে তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করে আছেন—কথাটা কি বিশ্বাস হবে?

যদি বলি, ওই-যে আমাদের বড়সড় লাইব্রেরি—একতলা-দোতলার বিরাট বিরাট ঘরগুলো—ওই-যে বইভর্তি তাকগুলো—সেখানে তাঁদের সকলেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, বিশ্বাস হবে? ওইখানে দাঁড়িয়ে বইয়ের ভেতর থেকে উদ্‌গ্রীব-হৃদয়ে তোমাদের ডাকছেন। তাঁরা আজ শারীরিকভাবে বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁদের অন্তরের যত দীপ্তি, যত লাবণ্য, যত সৌন্দর্য—সমস্তকিছু নিয়ে জীবন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ওই বইগুলোর মধ্যে। বিশ্বাস হবে?

(একজন ছাত্র : হবে।)

কই, তোমরা তো তাঁদের ডাকে সাড়া দিচ্ছ না? চিৎকার হুড়োহুড়ি করে পাগলের মতো সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছ না। তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ, এই বইগুলো আসলে সব সজীব মানুষ! পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানুষেরা! লাইব্রেরির মধ্যে দাঁড়িয়ে তোমাদের কি কখনো মনে হয়েছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষেরা তোমার চারপাশে জীবন্তভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, আবেগদীপ্ত গলায় কথা কথা বলতে চাচ্ছেন তোমাদের সঙ্গে! কই তুমি তো তাঁদের সাথে কথা বলছ না! হয়তো তোমাদের সেটা মনে হয়নি। কারণ, বইকে তোমরা চিনেছ অদ্ভুতভাবে—পাঠ্যপুস্তক হিশেবে, যার ভেতর দিয়ে এই জ্যোতির্ময় মানুষদের চেনার কোনো উপায় নেই।

৩

এবার এসো আর-একটা ব্যাপার বলি তোমাদের। বলো তো, এটা কী? (হাত উঁচু করে দেখিয়ে)

(একজন ছাত্র : হাত।)

বলো তো, মানুষ তার কয় হাতের সমান?

(একজন ছাত্রী : সাড়ে তিন হাতের।)

ঠিক বলেছ। এখন বলো তো, শুধু সাড়ে তিন হাত লম্বা একটা ঘর হলে কি একজন মানুষের চলে?

(একজন : চলে।) (সবার হাসি)

বেশ। তাহলে দিই তোমাকে একটা সাড়ে তিনহাত উঁচু বাক্স তৈরি করে। তার মধ্যে ঢুকিয়ে তালা মেরে সারারাত দাঁড় করিয়ে রাখি। দেখি কেমন লাগে তোমার?

(ছাত্রছাত্রীদের হাসি)

না, সাড়ে তিন হাত ঘর হলে আমাদের চলে না। বলো তো কতবড় ঘর আমাদের দরকার?

(একজন ছাত্রী : অনেক বড় ঘর।)

ঠিক বলেছ। যে যতবড় তার ততবড় ঘর দরকার। যে রাজা, তার বাঁচার জন্য গোটা রাজ্য লাগে। না হলে তার বাতাসের অভাব হয়ে যায়। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

যে বড় তার ঘরও বড় দরকার। কেবল বড়র কেন, আমাদের সবারই বড় ঘর দরকার। নিশ্বাস নেবার মতো, নিজেকে ছড়িয়ে দেবার মতো বড়সড় একটা ঘর। এবার আমার একটা কথার উত্তর দাও। কেবল বড় ঘর হলেই কি আমাদের চলে? নাকি সে-ঘরের মধ্যে আরো কিছু থাকতে হয়?

(সবাই নিঃশব্দ)

বলো তো, যে-ঘরের জানালা নেই, তার নাম কী?

(একজন ছাত্র : কবর!)

ঠিক বলেছ। কবরের জানালা নেই। কিন্তু আমরা অত আধ্যাত্মিক ঘরদোর নিয়ে বেশি টানাহেঁচড়া করব না। এসো আমরা এমন ঘর খুঁজি যে-ঘর সবসময় আমরা আমাদের চারপাশে দেখি, অথচ যার জানালা রাখা হয় না—বলো তো কী নাম সেই ঘরের?

(একজন ছাত্র : এটা কি গুদাম!)

হ্যাঁ, গুদাম। গুদাম সেই ঘর যার জানালা নেই।

এখন বলো তো, গুদামে কি মানুষ থাকতে পারে?

(ছাত্রেরা : না।)

ঠিক বলেছ, ওখানে মানুষ থাকা সম্ভব নয়। যার অনুভূতি আছে, বিকাশ আছে, জীবন আছে, স্বপ্ন আছে, তার ওখানে থাকা সম্ভব নয়। ওখানে যা থাকতে পারে তা মানুষ নয়, মাল। চালের বস্তা, সিমেন্টের বস্তা, আলুর বস্তা, গমের বস্তা। বলো তো কেন মানুষ সেখানে থাকতে পারে না?

(একজন ছাত্রী : আলো নেই বলে।)

হ্যাঁ, আলো নেই। ঠিক। আর?

(একজন ছাত্র : বাতাস নেই বলে।)

হ্যাঁ, বাতাস নেই। আর?—

(একজন ছাত্রী : বাতাসের চলাচল নেই বলে।)

বলে যাও। আসলে চারপাশের আলো-ঝলমল বিপুল পৃথিবীটাই যে নেই ওর মধ্যে! চারপাশের দৃশ্যের জগৎ, রূপের জগৎ, আলোর জগৎ, মুক্তির জগৎ—কিছুই নেই। এ ঘর বদ্ধ। এ ঘরে জানালা নেই। অথচ এই-যে বিরাট ঘরটায় এই মুহূর্তে তোমরা বসে আছ, কত জানালা দেখেছ এই ঘরে? মনে হয় যেন দেয়ালই নেই ঘরটায়, সবই জানালা। কেন এত জানালা এ-ঘরে? বলো তো, একটা জানালা থেকে আমরা কী পাই? তাকাও না আমার ডানপাশের এই জানালা দিয়েই। কী দেখছ?

(একজন ছাত্র : একটা দৃশ্য।)

হ্যাঁ। গাছপালা, একটা পুকুরের খানিকটা আর একটা মাঠ। এবারে তাকাও পরের জানালা দিয়ে। একই দৃশ্য দেখছ কি? নাকি সম্পূর্ণ নতুন কিছু?

(ছাত্রেরা : সম্পূর্ণ নতুন।)

এবার তাকাও পরের জানালায়। আগের দৃশ্যগুলোই দেখছ, নাকি আরো নতুন কিছু?

(কয়েকজন ছাত্রছাত্রী : আরো নতুন কিছু।)

এবার তাকাও না সবগুলো জানালা দিয়ে। কী দেখা যাচ্ছে? সারা বিশ্ব, তাই না?

হ্যাঁ সারা পৃথিবী। তোমরা এতগুলো মানুষ যাতে প্রাণখুলে এখানে বাঁচতে পারো, তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সবকিছু জীবনের ভেতরে আহরণ করতে পারো, তাই এই ঘরে এত জানালা। এই বিপুল বিশ্বজগৎ গুদামের ভেতরে নেই। তাই সেখানে মানুষ বাঁচে না।

তোমরাই বলেছ বাঁচার জন্যে বড় ঘর দরকার। বড় ঘর মানে কী? বড় ঘর মানে আলো-বাতাস-জানালা-দরোজা-বিশ্বচরাচরওয়ালা একটা ঘর। এই ঘরকে বহু অনিন্দ্য জিনিশ দিয়ে আমরা বানাতে পারি।

যেসব অনবদ্য জানালা দিয়ে আমরা জীবনের ঘর সুন্দর আর খোলামেলা করতে পারি, বই তার মধ্যে একটা। ওই-যে জানালার কথা বললাম, আমরা কি একেকটা বইকে অমনি একেকটা জানালার সাথে তুলনা করতে পারি?

(একজন ছাত্র : পারি!)

কীভাবে?

একেকটা জানালার মতো একেকটা বইও আমাদের আলাদা আলাদা দৃশ্য দেখায়।

ঠিক বলেছ। ধরো, প্রাচীন মিশরের ওপর একটা বই পড়লাম। কী হল তখন? আমাদের চোখের সামনে প্রাচীন মিশর, ফেরাউ, পিরামিড আর মমির জগৎটা

জ্বলজ্বল করে উঠল। যদি ক্যাপ্টেন কুকের ভ্রমণকাহিনী পড়ি, তবে তাঁর ভ্রমণপথ, অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার, প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপ, সেখানকার অধিবাসীদের হাতে তাঁর মৃত্যু—এসব ছবি চোখের ওপর জ্বলজ্বল করে উঠল। যদি চাঁদের অভিযানের গল্প পড়ি, তবে মহাশূন্যচারী, নভোযান, চাঁদের পৃষ্ঠে মানুষের অবতরণ—এমনি সব ছবিগুলো আমাদের চোখের সামনে জেগে উঠল। এমনিভাবে আমরা যদি এক এক করে এক-হাজার বা পাঁচ-হাজার বই পড়ে ফেলতে পারি তবে কী হবে? আমাদের জীবনটা এক-হাজার পাঁচ-হাজার বড় উজ্জ্বল জানালাওয়ালা এক বিশাল খোলামেলা বিশ্ব হয়ে যাবে। আমরা একটা বিশাল বিচিত্র পৃথিবীর মধ্যে বাস করতে থাকব। বইয়ের এই অসম্ভব ক্ষমতার কথা তোমরা কখনো ভুলো না।

8

এবার একটা গল্প দিয়ে শেষ করি। গল্পটা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের। গল্পটা এরকম :

একদিন খুব ভোরবেলায় এক ভদ্রলোক এক ব্যাধের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। ব্যাধ কাকে বলে জান?

(একজন ছাত্র : শিকারি।)

হ্যাঁ, ঠিক। ব্যাধরা একধরনের শিকারি। কোন্ ধরনের শিকারি তা তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। কসাই কাদের বলে জানো?

(একজন ছাত্র : যারা মাংস বিক্রি করে।)

ঠিক বলেছ। কসাই হচ্ছে তারা, যারা হাট থেকে পশু কিনে প্রথমে তাদের জবাই করে, তারপর সেই মাংসকে কেটে টুকরো টুকরো করে, তারপর ওজন দরে মানুষের কাছে বিক্রি করে। খুবই নির্দয় নৃশংস কাজ করতে হয় তাদের! কিন্তু ব্যাধদের করতে হত আরো ভয়ংকর কাজ। কসাইদের মতো পশুদের তারা হাট থেকে কিনে আনত না, অস্ত্র হাতে সোজা জঙ্গলে ঢুকে পশুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রথমে তাদের হত্যা করত, তারপর তাদের টুকরো টুকরো করে কেটে ওজন দরে মানুষের কাছে বিক্রি করত। কাজেই যেমন শক্তিশালী তেমনি দুর্দর্য আর ভয়ংকর লোক ছিল এই ব্যাধেরা।

এবার সেই গল্প। একদিন খুব ভোরবেলায় এক ভদ্রলোক ওরকম এক ব্যাধের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। বাড়ির ভেতরে ঢুকবেন, এমন সময় দেখেন দরজার পাশে বসে আছে সুন্দর একটা কাকাতুয়া। যেমন চমৎকার তার রং, তেমনি অনিন্দ্য শোভা। রঙে সৌন্দর্যে থৈ থৈ করছে।

দেখে তিনি তো খুব খুশি। 'বাহ্, তারি সুন্দর তো! সত্যি অনিন্দ্যসুন্দর।' বলে তিনি কাকাতুয়াটাকে একটু ভালোভাবে দেখার জন্য তার দিকে এগিয়ে গেলেন।

তোমরা জানো, কাকাতুয়ার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। বলো তো কী বৈশিষ্ট্য?

(ছাত্রছাত্রীরা : কাকাতুয়া কথা বলতে পারে।)

ঠিক বলেছ। ঠিক বলেছ। এখন ভদ্রলোক তো খুশি হয়ে এগিয়ে গেলেন কাকাতুয়াটার দিকে। ভাবলেন এত আশ্চর্য সুন্দর কাকাতুয়া—কত সুন্দর করেই না সে তার সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু এগোতেই ঘটল বিপরীত ঘটনা। এগিয়ে যেতেই কাকাতুয়াটা হঠাৎ বিশ্রী অশ্লীল অশ্রাব্য ভাষায় তাকে গালিগালাজ শুরু করল। উনি তো অবাক। 'এ কী! এত সুন্দর পাখি আর এত কদর্য কথা? না, না, জায়গাটা তো ভালো নয়। যাই অন্য কোথাও যাই।' বলে সেখান থেকে বেরিয়ে ভদ্রলোক গেলেন এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে। বাড়ির ভেতরে ঢুকবেন এমন সময় দেখেন, দরজার পাশে ঠিক তেমনি এক কাকাতুয়া। হুবহু একই রকম দেখতে। তেমনি আশ্চর্য সুন্দর তেমনি অনিন্দ্য! সেই রং, সেই রূপ, সেই চেহারা। এবার তিনি কী করবেন? এগিয়ে যাবেন, না পালাতে চেষ্টা করবেন?

(একজন ছাত্রী : পালাতে চেষ্টা করবেন।)

তাই। পালাতেই চেষ্টা করলেন তিনি। তাড়াতাড়ি পেছন ফিরেই উল্টোদিকে জোরে হাঁটতে শুরু করলেন। ভাবলেন : ওরে বাবা, সেই কাকাতুয়া! এইবার না-জানি আবার কী সব বীভৎস কথা শুনতে হয়।

কিন্তু আশ্চর্য, তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে সেই কাকাতুয়া হঠাৎ সুমিষ্ট কণ্ঠে মধুর ভাষায় তাঁকে ফিরে ফিরে অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানাতে শুরু করল। মধুর কণ্ঠে বলল : 'আসুন, বসুন, অপেক্ষা করুন। আমার গৃহস্বামী একটু বাইরে গেছেন। এক্ষুনি তিনি ফিরে আসবেন। অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন।'

তার সেই সুমিষ্ট কণ্ঠের সম্ভাষণ শুনে ভদ্রলোক তো অবাক।

একই কাকাতুয়া, একই রকম চেহারা। অথচ একজনের মুখে অশ্রাব্য অশ্লীল কথা, অন্যজনের মুখে মধুর সম্ভাষণ!

এ কী করে হল!

রহস্য জানার জন্য তিনি সেই কাকাতুয়াকে জিগ্যেস করলেন : কাকাতুয়া, কিছুক্ষণ আগে আমি অমুক ব্যাধের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম হুবহু তোমার মতোই এক কাকাতুয়া। একই রং, একই রূপ, একই সৌন্দর্য। কিন্তু আমাকে সে জঘন্য আর কদর্য ভাষায় গালাগাল করেছে। অথচ দেখতে একই রকম হয়েও তুমি মধুর মিষ্টি ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলছ। এমনটা কেন হল বলো তো।

শুনে সেই কাকাতুয়া তাঁকে যে-উত্তর দিয়েছিল এবার সেটা আমি তোমাদের বলছি। উত্তরটা অসাধারণ। তোমরা মনে রাখার চেষ্টা কোরো।

সে বলল, 'দেখ, তুমি ওই বাড়িতে যে-কাকাতুয়াকে দেখেছ, সে আর আমি

একই মায়ের সন্তান। আমরা যমজ ভাই। চেহারাতে তাই আমাদের এত মিল। কিন্তু ভাগ্যদোষে সে পড়েছে ব্যাধদের হাতে। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে সে শুনতে পায় ব্যাধদের অশ্রাব্য, কদর্য ভাষার কথাবার্তা। শুনতে শুনতে ওটাই তার ভাষা হয়ে গেছে। আর সৌভাগ্যবশত আমি পড়েছি ব্রাহ্মণের হাতে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আমি তাই শুনি ব্রাহ্মণদের কণ্ঠের সুমধুর সামবেদের গান আর তাদের সুমিষ্ট কণ্ঠের সুললিত কথাবার্তা। সেসব শুনতে শুনতে আমার ভাষা হয়ে গেছে সুমিষ্ট আর মধুর। সুতরাং তার কথা-যে কদর্য সেটা যেমন তার দোষ নয়, আমার কথা-যে সুন্দর আর সুমধুর এটাও আমার গুণ নয়।'

এখন, বলো তো, কেন হল এমন পার্থক্য?

(ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে : পরিবেশের জন্যে।)

ঠিক বলেছ, পরিবেশের কারণে। পরিবেশ যদি সুন্দর হয়, উন্নত হয়; মানুষ সে-পরিবেশে বেড়ে উঠলে হয়ে ওঠে উন্নত আর সুন্দর। কিন্তু পরিবেশ যদি হয় অকর্ষিত বা কদর্য, তাহলে সেখানে মানুষও হয়ে পড়ে অমনি কদর্য।

এবার আমাকে বলো আমাদের দেশে আজ কাদের রাজত্ব? অমার্জিত স্থূল দুর্বৃত্তদের, না সুন্দর সভ্য আলোকিত মানুষদের?

(ছাত্র-ছাত্রীরা সমস্বরে : অমার্জিত, স্থূল, দুর্বৃত্তদের।)

আজকের বাংলাদেশ কি ব্রাহ্মণের বাড়ি, না ব্যাধের বাড়ি?

(ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে : ব্যাধের বাড়ি।)

তোমরা কি সেই ব্যাধের বাড়ির কাকাতুয়া হতে চাও?

(ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে : না।)

কোন্ বাড়ির কাকাতুয়া হতে চাও?

(ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে : ব্রাহ্মণের বাড়ির।)

আবার বলো। কোন্ বাড়ির?

(ব্রাহ্মণের বাড়ির।)

তাই যদি চাও, তবে এই সুন্দর সপ্রাণ রুচিসম্মত পৃথিবীতে এসো। এখানে আমরা তোমাদের জন্য সেই ব্রাহ্মণের বাড়ি বানিয়ে রেখেছি। এখানকার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আর সুন্দর বইগুলো পড়ে মনকে সমৃদ্ধ কর, এর সাংস্কৃতিক পরিবেশে হৃদয়কে মহৎ করে তোল। আলোকিত হও। চারপাশের শ্বাসরুদ্ধকর অন্ধকারের ভেতর আজ আলোর বড় অভাব। আমরা তোমাদের দিকে আহ্বানের হাত বাড়িয়ে রেখেছি।

[একাদশ শ্রেণীর বইপড়া কর্মসূচির উদ্বোধনী বক্তৃতা, ১৯৯২]

একটুখানি পাশ দিয়ে

প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা,

ভালো আছ তো তোমরা?

(জি, স্যার!)

তোমাদের জন্যে কেন আমরা বইপড়ার আয়োজন করে থাকি সে-কথাটাই প্রথমে বলে নিই। তোমরা স্কুল-কলেজে পাঠ্যবই তো পড়ো, তাই না? শুধু পড়ো না, এতই পড়ো যে তোমরা আসলে তোমরা না পাঠ্যপুস্তক সেটাই খুঁজে বের করা কঠিন। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় হোজ্জার সেই কথাটার কাছাকাছি : তোমরা যদি তোমরা হও তো পাঠ্যপুস্তক কোথায় আর তোমরা যদি পাঠ্যপুস্তক হও তো তোমরা কোথায়? এখন বলো, পাঠ্যবই পড়া ভালো না খারাপ।

(ছাত্রছাত্রীরা : ভালো।)

ঠিক বলেছ। জীবনে দাঁড়াতে হলে, আর্থিক সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে পাঠ্যবই পড়তেই হবে আমাদের। লেখাপড়া করে যেই/ গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। গাড়ি-ঘোড়া চড়তে হলে পাঠ্যবই লাগবেই। কিন্তু অসুবিধাটা বাধিয়ে দেয় আমাদের পরীক্ষাব্যবস্থা। একে বইগুলো আদৌ আনন্দদায়ক নয়, তার ওপর তোমাদের ওগুলো পড়ানো হয় অমানুষিক কষ্ট দিয়ে। কল্পনা বা স্বপ্ন-আনন্দহীনভাবে দিনরাত ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দে নোট মুখস্থ করে তোমাদের তরুণবয়সটাই আলোহীন আর একঘেয়ে হয়ে যায়।

পরীক্ষা যতই এগিয়ে আসতে থাকে, ততই ধরা পড়তে শুরু করে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে তোমাদের প্রণয় কত গভীর। সারাদিন টেবিলে বসে শুধু না-ন্যা—ন্যা-ন্যা-ন্যা ... ন্যা-ন্যা—ন্যা-ন্যা-ন্যা শুরু হয়ে যায়। খাওয়া কমে যায়, স্বাস্থ্য এ্যায়সা খারাপ হয় যে মুখ শুকিয়ে থুতনি লম্বা হয়ে যেতে থাকে। আর

যাদের থুতনির আগায় আবার এক-আধটু দাড়ি থাকে তাদের লম্বাটা আরো একটু বেশি চোখে পড়ে। পড়তে পড়তে চোখ গর্তে বসে যায়। বসতে বসতে এমন হয় যে, সামনের দিক থেকে অদৃশ্য হয়ে মাথার পেছনদিক দিয়ে বের হতে শুরু করে। পরীক্ষা যত কাছে আসতে থাকে ততই ঈশ্বরপ্রেম বৃদ্ধি পায়, দিনরাত নামাজ আর সেজদায় পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। (আল্লাহ, এত কষ্ট করছি, তুই দেখিস কিন্তু...)। সর্বশক্তিমান 'আল্লা' তখন 'তুই' হয়ে ওঠেন। এমনই ন্যা-ন্যা—ন্যা-ন্যা-ন্যা করতে থাকো যে থুতনি থেকে-থেকেই টেবিলের সঙ্গে চটাস করে বাড়ি খায় ও নিজের আর্তনাদ আর কাতরানিতে নিজেই যন্ত্রণামুখর হও। স্বাস্থ্যের লাবণ্য ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, দরকারের ওই জাঁতাকল তোমার সমস্ত আনন্দ নিংড়ে নেয়।

এসবই কিন্তু হয় পাঠ্যবই-এর জন্য। এই পাঠ্যবই আমাদের জীবনকে এত কষ্ট দেয়, এত নির্যাতন করে যে এক-একসময় কেবল পাঠ্য নয়, পাঠ্য-অপাঠ্য সকল বইয়ের ওপরেই আমরা বিরক্ত হয়ে উঠি; বইয়ের ব্যাপারে আমাদের ভালোবাসা চলে যায়। বই দেখলে ভয়ে আঁতকে উঠি। বই থেকে যতদূরে থাকা যায় তার চেষ্টা করি। আগেই বলেছি এটা বইয়ের দোষ নয়, দোষ ওই শিক্ষাব্যবস্থার। যা হোক, ব্যাপারটা এত নির্মম আর কুৎসিত যে বই জিনিশটা ছেলেবেলা থেকেই আমাদের কাছে একটা বিভীষিকার মতো হয়ে ওঠে। এই দুর্বিষহ কষ্টের স্মৃতিটাকে সারাজীবন আমরা তাড়াতে পারি না।

অনেকদিন আগের কথা। একটা জরুরি কাজ থাকায় আমার এক বন্ধুর বিয়েতে সময়মতো যেতে পারিনি। বিয়ের দিনকয় পর একপ্যাকেট বই উপহার নিয়ে গেছি ওর বাসায়। প্যাকেট দেখে তো ওর চোখমুখ উদ্ভাসিত। কী যেন এনেছে আমার জন্যে! বলল : দেখি দেখি কী এনেছিস। কিন্তু যতই প্যাকেট খুলছে, ততই ওর মুখ বাংলার পাঁচের মতো হয়ে উঠছে। ভাবলাম উপহার দেখে তো ওর খুশি হবার কথা, কিন্তু এরকম হচ্ছে কেন? তখন বুঝলাম, বইগুলোই এর কারণ। ওগুলো দেখে হয়তো ওর ছাত্রজীবনের দুঃসহ কষ্টের কথা মনে পড়েছে। হয়তো ভেবেছে ওগুলো পড়ে কাল আবার পরীক্ষা দিতে বসতে হবে না তো।

তোমাদের ইসকুলগুলোর মতো এই কেন্দ্রও কিন্তু একটা ইসকুল। ওই ইসকুলগুলোর মতো আমরাও ছাত্রদের অনেক বই পড়তে দিই। কিন্তু এই বই খুশি আর স্বপ্নের বই। তাই এই ইসকুল আনন্দের ইশকুল, আলোর ইসকুল।

কেন পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি আমরা এসব সুন্দর বই তোমাদের পড়তে দিই এবার তা বলছি।

২

ধরো, তোমাকে কেউ তার বাড়িতে নুনভাত খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছে। বলেছে বটে নুনভাত খাওয়ার দাওয়াত কিন্তু আসলে সেটা কী খাওয়ার দাওয়াত বলো তো? (একজন ছাত্রী : পোলাও কোরমা খাওয়ার দাওয়াত।)

এই তো শুনেই বুঝে ফেলেছ দেখছি। এরকম দাওয়াত পাও বুঝি মাঝেমধ্যে। তো, আমাদের দেশে দাওয়াত দেবার সময় লোকে পোলাওকে বলে নুনভাত বলে। তো, তুমি তো আশায়-আশায় গিয়ে হাজির। মনে আশা, এক এক করে পোলাও কোরমা কালিয়া কোফতা সব আসতে থাকবে আর তুমি সাধ মিটিয়ে খেয়ে যাবে। আসতেও শুরু হল খাবার। প্রথমে এল পোলাও, খিদেতে তখন পেট চৌ চৌ করছে। দেরি না করে লোভীর মতো খাওয়া শুরু করে দিলে। মনে মনে ভাবনা : এরপর আসবে রোস্ট, আসবে টিকিয়া, আসবে কোরমা, রেজালা, আচার, চাটনি, ফিরনি, দই এমনি কত কি।

কিছুক্ষণ পর আবার এল। কিন্তু এ কী! এবারেও যে সেই পোলাওই দেখা যাচ্ছে। তুমি বিরক্ত হয়ে উঠলে : শুধু-শুধু পোলাও খাওয়া যায় নাকি। অন্যসব কই? সত্যি, এরপর আবারও খাবার এল। কিন্তু না, এবারেও অন্য কিছু নয়। সেই পোলাও! তুমি খেপে উঠলে : কী পেয়েছেন সাহেব আপনারা। শুধু ফিরে-ফিরে পোলাও আনছেন? শুধু পোলাও দিয়ে খাওয়া যায় নাকি?

তোমার কথা ঠিক। পোলাও না হলে ভোজ হয় না, কিন্তু শুধু পোলাও দিয়েও ভোজ পরিপূর্ণ হয় না। পোলাওয়ের সঙ্গে লাগে টিকিয়া, লাগে রোস্ট, লাগে রেজালা, লাগে চাটনি, আচার, দই, ফিরনি। কতকিছু। সবকিছু পুরোপুরি থাকলে তবে না সত্যিকারের পোলাও খাওয়া!

হ্যাঁ, পাঠ্যবই আমাদের দরকার। খুবই দরকার। অন্তিত্ব দাঁড় করানোর জন্য, জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য। কিন্তু শুধু পাঠ্যবই দিয়ে কি পরিপূর্ণ সুন্দর জীবন পাওয়া সম্ভব? তার সঙ্গে যদি এসব সুন্দর স্বপ্নেভরা বই না থাকে; গান, নাটক, চিত্রকলা, নৃত্যকলা, দেশভ্রমণ, অনবদ্য জ্ঞানের জগৎ না থাকে; হাজারো রকমের মজার জিনিশ না থাকে—তবে পাঠ্যবইয়ের ভোজ বেশি হয়ে হৃদয়ের মৃত্যু হয়ে যাবে যে!

৩

এবার এসো বলি, কেন আমরা তোমাদের এইসব বই পড়ার জন্য ডেকে এনেছি, এইসব অর্থহীন 'আউট বই'।

একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। গল্পটা একটু জটিল কিন্তু বুঝলে মজা পাবে। গল্পটা এরকম :

এক ছেলে বলছে, " আমার আব্বা এত জোরে নাক ডাকেন যে নিজের নাক ডাকার শব্দে নিজেই সারারাত ঘুমোতে পারেন না।" (সবার হাসি)

এবার বলো তো, ঘুমের মধ্যে নিজের নাক-ডাকার শব্দে নিজে ঘুমোতে পারে না, এমন কেউ কি আছে?

(কয়েকজন ছাত্র : না।)

ঠিক বলেছ। থাকা সম্ভব নয়। কারণ নাক-ডাকা ব্যাপারটাই এমন যে, কেউ যখন নাক ডাকে তখন দুনিয়ার আর সবাই তা শোনে কেবল সে নিজে ছাড়া। কোনো নাক-ডাকা লোককে তুমি বলে দেখো : 'ঘুমের মধ্যে আপনি এত নাক ডাকেন কেন ভাই।' দেখো কীভাবে সে খেঁকিয়ে ওঠে : 'কে বলে আমি নাক ডাকি? ইয়ার্কির জায়গা পান না! নাক ডাকেন নিজে আর দোষ দেন আমাকে!'

থাক, গল্পটায় ফিরে যাই। ছেলেটা বলে চলেছে : তো, না-ঘুমোতে-ঘুমোতে আব্বার অবস্থা এমন হল যে, তিনি একসময় মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত হয়ে গেলেন। বহু ডাক্তার বহুরকম চেষ্টা করল। কিছুতেই ভালো হল না। ঠিক সেই সময় হঠাৎ এক অদ্ভুত ডাক্তারের সাথে আব্বার দেখা। সব শুনে তিনি বললেন, 'এটা আবার একটা রোগ হল? কোনো চিন্তা করবেন না। শুধু একটা কাজ করবেন। রাতে ঘুমের মধ্যে নাক-ডাকার শব্দ যখন প্রচণ্ড হয়ে উঠবে, তখন চুপ করে, লুকিয়ে, পাশের ঘরে গিয়ে আস্তে করে শুয়ে পড়বেন। দেখবেন ঘুম এসে গেছে।' তাঁর কথামতো আব্বা সেদিন থেকে ওরকমই আরম্ভ করলেন। অবাক ব্যাপার যে ওরকমই করতে করতে তিনি পুরো সুস্থ হয়ে উঠলেন। রাত্রে ঘুমোবার সময় আব্বার নাক-ডাকার শব্দ যখন প্রচণ্ড হয়ে উঠত ঠিক তখনই আব্বা লুকিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়তেন। আর আগের ঘরে, তার ফেলে-যাওয়া নাক-ডাকার শব্দটা প্রচণ্ড বিক্রমে গর্জন করে চলত।

জোকটা একটু সূক্ষ্ম। বুঝতে পারছি তোমাদের কারো কারো বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। তবে বোঝো আর না-বোঝো, এই জোকটার মধ্যে ওই-যে পাশের ঘরে যাবার কথা বলা হল, জীবনের জন্যে ওই 'পাশের ঘরটা' কিন্তু খুবই জরুরি। কেন, বুঝিয়ে বলছি।

জীবনে বড়কিছু করতে চাইলে সেই পাশের ঘরে আমাদের যেতেই হয়। বলো তো হযরত (দ.) জন্মেছিলেন কোন্ শহরে?

(কয়েকজন ছাত্র : মক্কায়।)

সেখানে কি তিনি ভালোভাবে ধর্মপ্রচার করতে পেরেছিলেন?

না।

কোথায় করেছিলেন?

(একজন ছাত্র : মদিনায়।)

ঠিক বলেছ : একটু পাশের শহরে, তাই না?

গৌতমবুদ্ধ জন্মেছিলেন কোথায়? রাজপ্রাসাদে। কিন্তু রাজপ্রাসাদে কি তিনি তাঁর ধর্মপ্রচার করেছিলেন?

(একজন ছাত্র : না।)

কোথায় করেছিলেন? 'একটু পাশে', অরণ্যে। তাই না?

তুমি যদি ফুটবল খেলায় গোল দিতে চাও—ধরো, বল নিয়ে সবাইকে কাটিয়ে গোলকিপারের একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছ, এখন বলটাকে গোলের মধ্যে ঠেলে দিতে পারলেই গোল—তো কোন্‌দিকে মারবে তুমি? গোলকিপারের দিকে? না।

তা হলে কোন্ দিকে? 'একটু পাশ' দিয়ে তাই না?

মাঠে ব্যাট করতে নেমেছ, রান করতে চাও। কী করতে হবে? জানো তো, ক্রিকেট-মাঠে এগারোজন প্লেয়ার ব্যাটসম্যানকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। একজন মানুষ ব্যাট করলে যে-এগারো দিক দিয়ে বল স্বাভাবিকভাবে সে মারতে পারে সেই দিকগুলো আটকে তারা দাঁড়ায়। তো, তুমি যদি রান করতে চাও তবে বলটাকে কি সেই এগারোজনের দিকে মারবে, নাকি অন্য কোনোদিকে?

(একজন ছাত্র : একটু পাশ দিয়ে।)

এই তো বুঝে ফেলেছ। হ্যাঁ, জীবনের সবখানে সফল হতে হলে এই 'একটু পাশে' আমাদের আসতে হবেই। এবার আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও : পরীক্ষায় পাস করতে হলে, ভালো ফল করতে হলে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে কী বই পড়তে হবে আমাদের?

(ছাত্রেরা : পাঠ্যবই।)

কিন্তু জীবনকে সমৃদ্ধ করতে হলে, মনের জানালাগুলোকে খুলতে হলে, জীবনকে আনন্দময় আর সার্থক করতে হলে কোথায় যেতে হবে?

(ছাত্রেরা নীরব)

একটু পাশে। হ্যাঁ, এই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইগুলোর কাছে। তাই না? কী বই এগুলো? তোমাদের মন আর বয়সের উপযোগী সেরা বই এরা। কাদের লেখা? আমাদের সাহিত্যের, বিশ্বসাহিত্যের বড় বড় লেখকদের। সৌন্দর্যময়, ঐশ্বর্যময় আলোময় বই এগুলো। এগুলো পড়লে কী হয়? আমরা আমাদের চেয়ে সুন্দর হই, বড় হই, ঐশ্বর্যময় হই।

আগেই বলেছি, পাঠ্যবই তো পড়তেই হবে। সেই পড়া আমাদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু এই বইগুলোর কাছে এসে, 'একটু পাশে' এসে, যদি

আমরা এইসব সুন্দর ঐশ্বর্যময় বইগুলো পড়ি তবে আমরা পরিপূর্ণ হব। আমাদের মানবজন্ম ফুলে-ফলে ভরে উঠবে।

জীবনের প্রতিষ্ঠা যেমন দরকার তেমনি দরকার জীবনের সমৃদ্ধি। না হলে এই জীবনের সম্পূর্ণ সার্থকতা আসে না? কেন কথাটা বলছি, সেটা বলি।

ধরো তুমি বিরাট বড়লোক হলে। তোমার কোটি কোটি টাকা হল। বিত্ত-বৈভব, ধনসম্পদের শেষ নেই। তোমার ইচ্ছা এই বৈভবকে সাধ্যমতো উপভোগ করবে। এখন বলতো কী দিয়ে এসবকে উপভোগ করবে? টাকা দিয়ে তো আর টাকাকে উপভোগ করা যায় না। এসবকে উপভোগ করতে হয় মন দিয়ে। এই মন যত সুন্দর, অনুভূতিময় আর সুবিকশিত হবে তোমার ধনসম্পদকেও তুমি ততটা পরিপূর্ণ আনন্দে উপভোগ করতে পারবে। কিন্তু তোমার মন যদি সুন্দর না হয়ে ওঠে, তোমার উপভোগক্ষমতা যদি না বাড়ে, তবে ধনসম্পদ আর বিত্তের পাহাড় তৈরি করে কী লাভ হবে? ও তো উলুবনে মুক্তো ছড়ানো হবে! তাই তোমাদের মন যাতে সুন্দর হয়ে গড়ে ওঠে, জীবন যাতে স্বপ্নে আর ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে, সেজন্য এই সমৃদ্ধ বইগুলোর জগতে তোমাদের ডাক দিচ্ছি : তোমরা এসো। এই স্নিগ্ধ কৈশোরে জীবনের দুর্লভ মণিমাণিক্যের সমারোহে জীবনকে ঐশ্বর্যে ভরিয়ে তোলো। দেখ, সাফল্য আর সার্থকতা এক নয়। সাফল্য অনেক মানুষেরই জীবনে আসে। সাফল্য একটা দক্ষতা। অনেক চোর-বাটপাড়ও জীবনে সফল হয়ে যায়। কিন্তু জীবনের যত সুন্দর সুন্দর জিনিশ আছে সেগুলোকে আকণ্ঠ উপভোগ করে একটা পরিপূর্ণ জীবনকে স্পর্শ করার নাম হচ্ছে সার্থকতা। সেটা যদি তুমি না-করতে পারো তাহলে তো জীবন সম্পূর্ণ হল না। দেখ, এই-যে আমরা এই জীবনটা পেয়েছি, আমরা কি এর জন্য কোনো এ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম? কোনো ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম? কোনোভাবে এ জীবনের যোগ্য ছিলাম? না, কিছুই না। তবু কীভাবে কেমন করে, কী অসম্ভব ভাগ্যের জোরে, বলা নেই কওয়া নেই, এই অভাবনীয় জীবনটাকে আমরা পেয়ে গেছি। এই দুর্লভ জীবনটাকে সার্থক করে তুলতে না-পারলে আমাদের বোকামি হয়ে যাবে না কি?

তোমরা সবাই হয়তো সেই কথাটা শুনে থাকবে যে : গরিব লোকেরা খায়, মধ্যবিত্তেরা আহার করে, আর বড়লোকেরা ভোজন করে। এই জীবনটা হচ্ছে এমনি একটা ভোজনের জায়গা। এই ভোজন হল জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। যত সুন্দর উপভোগ্য আর অনবদ্য জিনিশ দেখবে এই পৃথিবীতে, তাদের দেখ, উপভোগ করো। এ-জীবনকে এর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শসহ আস্বাদন করো। না হলে এই পৃথিবী ছাড়ার সময় কাঁদতে ইচ্ছে করবে। ওমর খৈয়ামের একটা কথা দিয়ে আজকের মতো শেষ করি। তিনি বলেছেন :

Ah, make the most of what we yet may spend,
Before we too into the dust descend,

Dust unto dust and under dust to lie,
Sans wine, sans song, sans singer and sans end.

'হে প্রিয়তমা, এসো মৃত্যুর নিচে ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমরা এই জীবনকে যতটা পারি, দুই হাতে উজাড় করে উপভোগ করি।' [যতভাবে এই জীবনকে আমরা উপভোগ করতে পারি ততভাবে।] হাসন রাজার গানে কি আছে না : 'একদিন তোর হইবেরে মরণ, রে হাসন রাজা।' আছে : 'ভালা কইরা ঘর বানাইয়া বইমু কত আর/ আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাকনা চুল আমার।' বুঝলে, আমারও চুল পেকেছে, যখনই আয়নার সামনে যাই, পাকা চুলগুলো আমার দিকে ট্যার ট্যার করে তাকায়। বলে, 'ডাক তো এসে গেল, পাখি-যে খাঁচা থেকে পালাতে চায়।' হ্যাঁ, যেতে হবে। আমাদের সবাইকেই। তাই খৈয়াম বলছেন : এসো প্রিয়তমা, সেই ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবার আগে আমরা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করি। কারণ এই জীবন একবার চলে গেলে আর তো ফিরে আসে না। সেখানে কী থাকে? থাকে শুধু ধুলো।

Dust unto dust and under dust to lie,
Sans wine, sans song, sans singer and sans end.

'ধুলোর নিচে ধুলো, তার নিচে ধুলো, তার নিচে আমাদের শুয়ে থাকতে হবে। সেখানে মদ নেই, গান নেই, গায়ক নেই, আর সে-অন্ধকারেরও শেষ নেই।' তাই জীবনকে যতটা পারো উপভোগ কোর। বসন্তের মনোরম সন্ধ্যাগুলোকে বন্ধ-ঘরের ভেতর শুধু ক্যালকুলাস কষে-কষে নষ্ট কোরো না। জীবন চলে যাবে, কিন্তু এই জীবনে যে-আনন্দটুকু আমরা পেয়েছিলাম সেটুকুই থাকবে আমাদের।

বেশ কিছুদিন আগে আমাদের রেডিও-টেলিভিশনে একজন ভালো সংবাদ-পাঠক ছিলেন। তো, একবার তিনি গেছেন নাটক করতে। কিন্তু খবর পড়ে-পড়ে তাঁর কথা এমনই খবর-পাঠকের মতো হয়ে গেছে যে দেখা গেল নায়িকার সাথে প্রেমের কথা বলার সময়ও তিনি খবরই পড়ছেন।

জীবনের দরকারের জায়গাতে আমাদের এভাবে আটকে গেলে চলবে না। বসন্তের মর্মরিত বিকেলকেও বুঝতে হবে। অনুভূতিগুলোকে সজীব করতে হবে। নাহলে হঠাৎ-পাওয়া এই দুর্লভ জীবনটার মূল্য দেওয়াই যে হবে না।

আর দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের সব কথা শেষ হবে। ধরো, একটা লাইব্রেরিতে আছে দশলক্ষ বই। এখন ওই লাইব্রেরিটার মধ্যে তুমি যাও। কোনোকিছুর শব্দ শুনছ কি? না। পুরো লাইব্রেরিটাকেই মনে হচ্ছে নিথর মৃত এক প্রেতপুরী। যেন কেউ কোথাও নেই। যেন ঘরে-ঘরে সাজানো বইগুলো সব সার-সার মৃতের সারি। এবার তুমি সেখান থেকে একটা বই নিয়ে জোরে জোরে পড়তে

শুরু কর। কী শুনছ? শব্দ—প্রাণবন্ত, শক্তিমন্ত প্রচণ্ড শব্দ। তাই না? জীবনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় প্রাণের স্পন্দন।

এখন ধরো, দশ লক্ষ বইয়ের সেই লাইব্রেরিতে প্রবেশ করল তোমার মতো দশ লক্ষ লোক, গিয়ে প্রত্যেকে একটা করে বই হাতে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে শুরু করল। কতটা আওয়াজ উঠবে তখন? প্রচণ্ড। তাই না? এমন শব্দ যে সুদূর আমেরিকায় বসে স্বয়ং ক্লিনটনও শুনতে পাবেন। চমকে গিয়ে ভাববেন : কী রে বাপু, বাংলাদেশ আবার আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাল নাকি? ওটা তো হওয়ার কথা আমাদের দেশে।

আর কেবল কি শব্দ? বইগুলোর মধ্যে জীবনের যে-দুর্বার প্রাণশক্তি রয়েছে, রয়েছে যে-উন্মাদ আবেগ, যে-চেতনার বিস্ফোরণ—তার শব্দ হবে না? সব মিলে যে কী এলাহি কাণ্ড ভেবে দেখেছ? সেইজন্য 'বই কী' বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন এসো এবার তা শুনি।

বলো তো, সমুদ্রের কল্লোলের শব্দ কেমন? সে তো এক প্রমত্ত গর্জন, তাই না? চারপাশের সব শব্দকে ডুবিয়ে বুকের ভেতর তা কাঁপন ধরায়। এখন সে-সমুদ্র যদি ছোট সমুদ্র না হয়ে মহাসমুদ্র হয় তা হলে কি তার গর্জন কম হবে না বেশি হবে?

(ছাত্ররা : বেশি হবে।)

হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর বেশি হবে। মহাসমুদ্রের সব গর্জনকে একখানে করতে পারলে সে তো ভয়ঙ্কর হবেই। এবার এসো আর-একধাপ এগোনো যাক। সেই মহাসমুদ্রের গর্জন যদি একমুহূর্তের না হয়ে হয় শতবর্ষের, তবে তা কেমন হবে? ওরে বাপ্‌রে, ৫০ কোটি জেটবিমানের চাইতে হয়তো হবে প্রচণ্ড। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বাইরে থেকে শান্ত মনে হলেও বইয়ের লাইব্রেরির মধ্যে আছে এমনি পরাক্রান্ত শব্দের পৃথিবী। সে শব্দ মানবচৈতন্যের শব্দ। কিন্তু শব্দ সেখানে শব্দ হয়ে নেই। সে সেখানে পড়ে আছে নীরব অবস্থায়। দেখ, রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাকে কী সুন্দরভাবেই না প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোলকে কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দকে লাইব্রেরির সঙ্গে তুলনা করা যাইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো-অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।' কী অপূর্ব! বইয়ের এর চেয়ে সুন্দর বর্ণনা কী হতে পারে?

হিন্দুরা ব্রাহ্মণদের বলে 'দ্বিজ'। দ্বিজ মানে কী? যার দ্বিতীয় জন্ম হয়। আমাদের সবার জন্ম কয়টা?

(একজন ছাত্র : একটা।)

মানুষের সাধারণত একটাই জন্ম হয়। আমরা গড়পড়তা মানুষেরা সাধারণত

জীবজন্তুর-প্রকৃতি নিয়েই জন্মাই। তাই হয়েই মরি। কিন্তু কিছুকিছু মানুষ আছেন যাঁরা নিজের ভেতরকার এই পশুত্বকে অতিক্রম করতে পারেন, বড়জীবনে উন্নীত হতে পারেন। যাঁরা এটা পারেন হিন্দুধর্মে তাঁদেরই দ্বিজ বলা হয়। দ্বিজ শুধু হিন্দুদের মধ্যে নেই, দ্বিজ আছে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষের মধ্যে। নিজের প্রাথমিক সত্তাকে ডিঙিয়ে যাঁরা উচ্চায়ত মানবজন্মে উন্নীত হন তাঁরাই দ্বিজ। আমরা সারাদেশে এই দ্বিজ সৃষ্টি করতে চাই, আলোকিত মানুষদের এক বিশালকায় সমৃদ্ধ সমাজ। এইজন্য আমরা তোমাদের এইসব সুন্দর বই পড়তে ডাক দিয়েছি। আমরা আশা করি এসবের মধ্যে দিয়ে তোমরা দ্বিজ হয়ে উঠবে। তোমাদের স্বপ্ন, তোমাদের জীবন, তোমাদের মনুষ্যত্ব বড় হবে। তোমরা নিজেদের অতিক্রম করবে। তোমরা বড় হও। তোমরা বড় হলে বাংলাদেশ বড় হবে।

পরিশিষ্ট

বিনয়

এবার একটা কথার উত্তর আমাকে দাও।

বইপড়া ভালো না খারাপ?

(ছাত্রছাত্রীরা : ভালো।)

জোরে!

(সবাই মিলে : ভালো!)

আমাদের বইপড়া কর্মসূচি ভালো না খারাপ?

(সবাই : ভালো।)

যারা এই বইপড়া কর্মসূচিতে অংশ নেয় তারা কী?

(সবাই : ভালো!)

তা হলে তোমরা কী?

(সবাই নিঃশব্দ, সংকুচিত। দুয়েকজন আস্তে করে : ভালো!)

এত আস্তে কেন? নিজের প্রশংসা করতে নেই ঠিক, কিন্তু সত্যকেও তো বলতে হবে। খালি তোমরাই কি ভালো? আমিও কি একটু ভালো নই! এই-যে তোমাদের এসব পড়ার সুযোগ করে দিচ্ছি, এটা কি একটা ভালো কাজ না? রেডিওতে পূবালী ব্যাংকের একটা বিজ্ঞাপন দিত একসময়। বিজ্ঞাপনটায় প্রথমে বাবা বলে উঠত : "পূবালী ব্যাংক আমার ব্যাংক।" তারপর মা বলত : "আমার ব্যাংক।" ওদিক থেকে আবার বাচ্চাটাও বলে উঠত, "আমালো তো!" খালি তোমাদেরই ভালো হলে হবে কেন, ভালো আমালো তো কিছুটা আছে! হ্যাঁ, সত্যকেও তো বলতে হবে, কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে। 'আমালো'র মতো করে।

মানুষের যতগুলো গুণ আছে, বিনয় হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম সুন্দর গুণ। এ দিয়ে মানুষ মানুষের কাছে প্রিয় হয়, সবার ভালোবাসা পায়। তাই বিনয়ের খুবই দরকার। নিজের বিনীত অবস্থা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের কাছে কী বলেছেন? বলেছেন, "আমার মাথা নত

করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে।" চরণের তলে নয় শুধু, চরণের নিচে যে-ধুলো, তারও নিচে আমার মাথা নুইয়ে দাও। আমার মাথাকে আমি সমস্ত কিছুর নিচে নামিয়ে আনতে চাই। তাঁর একটা গানেও আছে—'তোমার চরণ ধুলায়ধুলায় ধূসর হব', তেমনি।

(একজন ছাত্র : এটা একটু বেশি বিনয়।)

না, বেশি নয়। কেন নয়, বোঝাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটা কখন লিখেছিলেন? যখন তিনি অখ্যাত অপরিচিত কবি ছিলেন, তখন কিন্তু তিনি এই কবিতাটি লেখেননি। লিখেছেন তখন, যখন তিনি টের পাচ্ছেন তিনি সত্যিসত্যি প্রতিভাবান। তিনি বড় হয়ে উঠছেন। সবকিছু ছাড়িয়ে উঠে যাচ্ছে তাঁর মাথা। আগে কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অনেকেই সমালোচনা করতেন। বলতেন : উনি আবার কবি? খাওয়াদাওয়ার চিন্তা নেই। বাড়িতে বসে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে লাইনে লাইনে মিল দেওয়া ... ইত্যাদি। অনেকেই তাঁকে নির্মম সমালোচনা করেছেন। এমনকি আমাদের 'মহাশ্মশান' কাব্যের কবি কায়কোবাদ পর্যন্ত লিখেছেন : 'বাংলা কবিতায় আজকাল একরকম হেঁয়ালির প্রবর্তন হইয়াছে, এই হেঁয়ালির জনক হইলেন রবীন্দ্রনাথ। যিনি সারাজীবন একটিও মহাকাব্য লিখিতে পারেন নাই, তিনি আবার মহাকবি! হায়রে না-ওয়ারিশ বঙ্গভাষা।' এমনিভাবে কত লোক তাঁকে কতভাবে অসম্মান করেছে। কিন্তু চলতে চলতে একসময় উনি সত্যি টের পেয়ে গেলেন, তিনি আসলেই প্রতিভাবান। সবাই বলতেও শুরু করেছে সেটা তখন। নিজের লেখা দেখে, মানুষের অভিনন্দন থেকে যতই তিনি টের পেতে থাকলেন উনি ওপরে উঠে যাচ্ছেন, তাঁর মাথা উঠতে উঠতে আকাশ ছুঁয়ে ফেলছে, তখন তিনি কী করছেন! তিনি বুঝে ফেলছেন, মাথা যদি এভাবে কেবলি ওপরের দিকে ওঠে তাহলে তিনি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবেন। দম্ভে, অহংকারে ধ্বংস হয়ে যাবেন। ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটিতে পড়ে থাকবেন। সুতরাং কী করা?

নত হও।

নত কে হতে চায় পৃথিবীতে—যে ছোট, না যে বড়?

(একজন ছাত্র : যে বড়।)

কথাটা মনে রেখো। ছোট কিন্তু নত হতে পারে না। এমনিতেই তো সে ছোট। এরপর ছোট হয়ে গেলে তো সে হারিয়ে যাবে।

জালালউদ্দীন রুমি একটা অসাধারণ কথা বলেছিলেন। কথাটা হল : "একটা গাছের পাতার মধ্যে যত অনন্ত রহস্য লুকানো আছে, যদি সমস্ত পৃথিবীটা একটা বিশাল শাদা কাগজ হত, আর সমুদ্রের সমস্ত পানি কালো কালি হত, তাহলেও একটা গাছের একটা পাতার মধ্যে যে-অনন্ত রহস্য লুকানো আছে তা (সেই কালি দিয়ে) লিখে শেষ করা যেত না।" এই যদি অবস্থা, তাহলে পৃথিবীতে যত পাতা আছে, যত মানুষ আছে, যত দৃশ্য বা এই বিশ্বচরাচরে যত অন্তহীন জিনিশ আছে—কোনোদিন কি আমরা তাদের মহিমা জেনে শেষ করতে পারব? আমাদের জানার ক্ষমতার চাইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কী বড় নয়? সুতরাং এই বিশ্বের সামনে দাঁড়িয়ে কী বলতে হবে আমাকে? বলতে হবে : নত হও। পূর্ণ জ্ঞান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু জ্ঞানের চেষ্টা করতে পারি মাত্র। আমি মূঢ়, অজ্ঞ! আমার দরকার বিনয়। বিনীত হওয়া।

হিউএনসাঙ-এর ভারত-ভ্রমণের সময় একদিন একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। রাস্তায় হঠাৎ এক অদ্ভুত লোককে হেঁটে যেতে দেখেছিলেন তিনি। লোকটার বিশাল উদর তামার পাত দিয়ে মোড়া, আর তার মাথার ওপরে একটা মশাল জ্বলছে। লোকে তাকে জিগ্যেস করত, 'ভাই আপনার এই দুরবস্থা কেন? উদর তামার পাতে মোড়া, মাথায়

মশাল।' লোকটা গুরুগম্ভীর স্বরে বলত : 'বুঝলে হে, আমার পেটের মধ্যে এত জ্ঞান যে সেসব যাতে ফেটে বেরিয়ে যেতে না পারে এইজন্য তামার পাত দিয়ে আমি তাকে মুড়ে রেখেছি। আর এই-যে মাথার উপরে জ্বলন্ত মশাল দেখছ এটা হচ্ছে জ্ঞানের মশাল, আমি যেদিকে যাই, এই মশাল দিয়ে সেদিক আলো করতে করতে যাই।' এই মানুষটি কি সুখী? নিজের জ্ঞানের অহংকারে যে-নিজেকে এমন বিরাট আর বিশাল মনে করছে, তার পক্ষে কি সুখ সম্ভব? তার তো রক্তচাপ বেড়ে, [illegible] বিপর্যস্ত হবার কথা, কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি সামনে দেখলেই তার বুক কেঁপে ওঠার কথা : ওরে বাবারে, আমার চেয়ে বড় জ্ঞানী কেউ এসে গেল নাকি আবার! এইজন্যে আমাদের বিনয় দরকার। তাতে আমাদের আশঙ্কা উৎকণ্ঠা কমে আসে, আমরা স্বস্তি নিয়ে বাঁচতে পারি। ওমর খৈয়াম লিখেছেন :

> দর রাহ চুনান রাওকে সালামত না কুনান
> বা খালাক চুনান যী কে কেয়ামত না কুনান
> দর মসজিদ আগর রাও চুনান রও কে তুরা
> দর পেশ না খানান্দ ও ইমামত না কুনান্দ

'যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটবে, তখন এমন বিনীতভাবে সবার পেছনে লুকিয়ে আড়ালে হাঁটবে যেন তোমাকে দেখে কেউ যেন সালাম দেবার সুযোগ না পায়। যখন কোনো মজলিসে বা কোনো সামাজিক আসরে যাবে তখনো সবার পেছনে লুকিয়ে এমন নিঃশব্দে গিয়ে সেখানে ঢুকবে যেন তোমাকে দেখে কাউকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে না হয়। যখন মসজিদে যাবে তখন এমনভাবে লুকিয়ে সবার অগোচরে সেখানে যাবে যে, তোমাকে দেখে কেউ এই বলে ডাকাডাকি না-উঠতে পারে : আসুন আসুন, আমাদের ইমাম হন।' এখন আমাকে তোমরা বলো : এইসব কথা কোন মানুষের উদ্দেশে বলা? কাকে এই উপদেশ? যে-মানুষকে কেউ চেনে না, যে সামান্য বা তুচ্ছ মানুষ তার জন্য? নাকি যে-মানুষকে সবাই চেনে, যে বড় আর সম্মানিত তার জন্য?

(ছাত্রছাত্রীরা : যে-মানুষকে সবাই চেনে তার জন্য।)

হ্যাঁ, যে-মানুষ বড়, যে অন্যদের ওপরে, তার জন্য। যে সুখ্যাত ও সম্মানী বলে যাকে দেখলেই রাস্তায় মানুষেরা সালাম দেয়, সামাজিক অনুষ্ঠানে গেলে সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, মসজিদে গেলে ইমাম হবার জন্যে ডাকাডাকি করে, তার জন্য। এসব কথা তোমার-আমার জন্য নয়। যে-মানুষ বড়, তার কিন্তু দরকার একেবারেই। তুমি যত বড় হবে, তোমার মধ্যে বিনয়ের দরকারও তত বাড়বে। যে ছোট, সে তো এমনিতেই নগণ্য। তার আবার বিনয়ের দরকার হবে কেন?

(সেই ছেলেটিকে দেখিয়ে) বেশি-বেশি বিনয় বলে আমাকে [illegible] এত কথা শুনতে হল।

[একাদশ শ্রেণির বইপড়া কর্মসূচির [illegible]

ছোট একটু সোনালি স্পর্শ

'ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স'-এ অংশগ্রহণকারীবৃন্দ, (দুঃখিত, এর আগেই বোধহয় তানভীর মোকাম্মেলের নামটা বলা উচিত ছিল, যেহেতু সে এই সভার সভাপতি), সেইসঙ্গে কচি (কেন্দ্রের চলচ্চিত্র চক্রের সমন্বয়কারী) ও অন্যান্যরা, যাদের নাম বলা উচিত ছিল অথচ বলিনি ও ব্যক্তি সবাই,

এই মুহূর্তে বক্তৃতা দেওয়ার মতো অবস্থা আমার নেই। ভয়ংকর গরম। কিছুক্ষণ আগে আমি এক ভয়াবহ যানজটে আটকা পড়েছিলাম। গাড়ি চালাচ্ছিলাম আমিই। কাজেই গাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। ফলে প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক সেই প্রচণ্ড গরমে সেদ্ধ হয়ে এখন পুরোপুরি ক্লান্ত। উদ্যোক্তাদের চোখ-রাঙানির ভয় ছাড়া এই মুহূর্তে এই বক্তৃতার আপাতত কোনো উদ্দেশ্য নেই।

আজ আমাদের চলচ্চিত্র চক্রের দ্বিতীয় 'ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স' শুরু হচ্ছে। আমি বহুদিন ধরে অ্যাপ্রিসিয়েশন কথাটার একটা জুতসই বাংলাশব্দ বের করার চেষ্টা করেছি। ভেবেটেবে 'রসাস্বাদন' শব্দটাকে আমার মোটামুটি মনে ধরেছে। কিন্তু শব্দটা নিয়েও কিছু অসুবিধা আছে। 'রস' শব্দটা শুনলে বাঙালিদের চোখের সামনে প্রথমেই যে-রসের ছবিটা এসে দাঁড়ায় তা হল খেজুরের রস। কাজেই রসাস্বাদন মানে যে শিল্পাস্বাদন তা বোঝানো অনেক সময়েই কঠিন হয়ে পড়ে।

আমাদের জন্য সুখের খবর যে এই কোর্স আমরা দ্বিতীয়বার করতে পারছি। একটু আগে তানভীর ১৯৭৪ সালের একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সের উল্লেখ করেছে। সতীশ বাহাদুর সেটা পরিচালনা করেছিলেন। মসিহউদ্দিন শাকের বা শেখ নিয়ামত আলীর মতো চিত্র-পরিচালকরা উঠে এসেছিলেন সেই কোর্স থেকে। আমিও ওই কোর্সে ছিলাম। তানভীর ছাড়াও চলচ্চিত্র-নির্মাতা মানজারে হাসিন মুরাদ ওই কোর্সে ছিল। সে-ও এখন একজন ভালো চিত্রনির্মাতা। এক সভায় সে কথায়-কথায় বলেছিল ওই কোর্সে সে আমাকে দেখে অবাক হয়েছিল। ওর মনে

হয়েছিল, এই বুড়ো এখানে কী করছে। এই কোর্স করে তাঁর কী হবে? আমি কিন্তু তখন অত বুড়ো ছিলাম না। আমার বয়স তখন ছিল মাত্র চৌত্রিশ বছর। ওরা তখন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তাই হয়তো আমাকে অত বুড়ো মনে হয়েছে। তবু বলব : জানার ব্যাপার সে যে-বয়সেই আমাদের ভেতরে আসুক, আদৌ উপেক্ষার জিনিশ নয়। ভালো জিনিসের ছোঁয়া জীবনে যখন আসে তখনই লাভ। বিশেষ করে সৌন্দর্যের স্পর্শ। জীবনের জন্য এ খুবই জরুরি। রবীন্দ্রনাথের একটা গানের কথা মনে পড়ছে : 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর,/পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর।' সুন্দরের স্পর্শ আমাদের শরীরকে পুণ্য করে, অন্তরকে ধন্য করে। সত্যিই এটা হয়। তবে সবচেয়ে ভালো হয় এ-স্পর্শটা যদি ঘটে তরুণ-বয়সে। সুন্দরের এই ছোঁয়াটুকু ওই সময় মনটাকে একবার খুশি করে না তুললে জীবনের ঝুলের প্রদীপটা আর কোনোদিনই জ্বলে না। আলাদীনের সেই আশ্চর্য প্রদীপ আছে না—যাতে ঘষা দিলেই একটা দৈত্য এসে হাজির হয়। তোমরা জান এ দৈত্য চোখের পলকে পৃথিবীর যে-কোনো জিনিশ এনে হাজির করতে পারে, আর পৃথিবী হয়ে যায় সব-পেয়েছির দেশ! তো, কী করতে হয় সেই দৈত্যটাকে আনতে হলে? প্রদীপটাকে হাতে নিয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকলে কি দৈত্য আসে? না, আসে না। ওতে একটু সামান্য ঘষা দিতে হয়, ওটা করলেই দৈত্যের ভেতর প্রাণটা জ্বলে ওঠে, সে এসে হাজির হয়। আর দৈত্য আসা মানে হল অনন্ত সম্ভাবনা এসে হাজির হওয়া।

আমাদের জীবনের সূচনাতেও সৌন্দর্যের এই সোনালি স্পর্শ দরকার। সবচেয়ে বড় অসুবিধা এখানে যে, বড় বা সুন্দর কোনোকিছুরই মঙ্গলস্পর্শের সুযোগ আমাদের অল্পবয়সে প্রায়ই হয় না। প্রায় কোথাও কোনো জায়গাতেই হয় না। এই-যে আমরা সারাদেশে ছেলেমেয়েদের বই-পড়ানোর চেষ্টা করছি, সে-চেষ্টাটুকুও আমরা ঠিকমতো সফল করতে পারছি না। অর্থের অভাব, সাধ্যের অভাব তো আছেই, তার ওপর আছে মানুষের সহযোগিতার অভাব। মনে হয় সারা দেশ জাতি যেন এককাট্টা হয়ে এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থের বা মানুষের অভাব উপরে যদিবা কোনো স্কুলে বইপড়া কর্মসূচি খুলতে গেলাম তো হেডমাস্টার সাহেব এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর কথা 'এইসব বই পইড়া কী অইব। অযথা সময় নষ্ট।' অথচ তাঁরই স্কুলের ছেলেমেয়েদের মন আর বয়সের উপযোগী সবচেয়ে সুন্দর বইগুলো নিয়ে আমরা গেছি তাদের মনের বিকাশের জন্যে। একেক সময় দুঃখ করে বলি আমাদের প্রধানশিক্ষকেরাই অনেক সময় আমাদের এই চেষ্টার প্রধান বাধা।

এখন এই-যে হেডমাস্টার সাহেব—এই মানুষটি কি খারাপ? না, খারাপ নন। তাহলে গোলমালটা কোথায়? গোলমালটা এখানে যে তিনি যখন ওই বয়সের একজন তরুণ বা কিশোর ছিলেন, ক্লাস এইটে নাইনে বা টেনে পড়তেন, যখন তাঁর মন ছিল কচি, অনুভূতিময়, স্পর্শকাতর—সমস্ত সৌন্দর্যের জন্য, বড়কিছুর জন্য

ওখান থেকে যেটুকু যা পেয়েছিলাম তার কিছুই আমার কাজে লাগেনি। কিন্তু ওই-যে চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে আমার পরিচয় হল, আর আমি তার অনির্বচনীয় পৃথিবীর স্পর্শ পেলাম, তা একটা জায়গায় আমাকে অনেকখানি পাল্টে দিল। চলচ্চিত্রের সৌন্দর্যলোকের ব্যাপারে আমার মনের জানালা খুলে গেল। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সুন্দর একটা কথা মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন : প্রতিভা বিকাশ করতে যে ব্যর্থ হয়, সে হয় সমঝদার। চলচ্চিত্রের কোর্স করে আমি প্রতিভাবান হইনি, কিন্তু খানিকটা সমঝদার হয়েছি। ওই-যে একবার কিছুদিনের জন্য আমি চলচ্চিত্রের স্পর্শে এসেছিলাম তার জন্য আজ আমি চলচ্চিত্রকে কিছুটা হলেও টের পাই। এর ভেতরকার ঐশ্বর্যকে অনুভব করি। ভালোকিছুর সঙ্গে পরিচয় বা জানাজানিতে জীবনের এটুকুই লাভ। আমি নিজে হয়তো কোনোদিন এই চক্র তৈরি করতে পারতাম না, কিন্তু এই চক্রের উদ্যোক্তারা যে-বেদনা আর উদ্যম নিয়ে এই চক্র গড়ে তুলছে, আমি-যে তার মূল্যটুকু বুঝতে পারছি, তা সম্ভব হচ্ছে একদিন ওই জগতের সঙ্গে আমার চেনাচেনি ঘটেছিল বলেই। যাদের প্রতিভা ছিল, ওই স্পর্শ পেয়ে তারা চিত্র নির্মাণ করেছেন। আর আমার সেদিনের ওই স্পর্শটুকুর কারণে আজ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে চলচ্চিত্র-চক্র গড়ে উঠছে। মানুষের সভ্যতার জন্য যে যেখান থেকে যেটুকু দেবে সেটুকুই লাভ। সতীশ বাহাদুরের পর কোর্স চালিয়েছিলেন আলমগীর কবির। সে-কোর্সগুলোতে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের মধ্যে থেকেও ৫/৬ জন চিত্রনির্মাতা হয়েছেন। তাহলে আমাদের এসব কোর্স থেকে হবে না কেন? আমি নিশ্চিত জানি, আমাদের এই কোর্সগুলো থেকেও ওরকমটাই হবে। অংশগ্রহণকারীদের ভেতরকার সুপ্ত প্রাণটুকু জাগানোর জন্যে আমাদের এই আয়োজন।

ছোট্ট একটুখানি স্পর্শ দিয়ে এ পরিচয় শুরু হোক। পরে এ প্রসারিত হবে। যাঁরা আমার মতো, যাদের অন্তর প্রতিভার উৎসাহ কোনোদিন স্পন্দিত হবে না, তারাও অন্তত অন্যের বেড়ে-ওঠার ব্যাপারে সহায়তা করতে পারবেন। সেটাই বা কম কী?

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র চলচ্চিত্র চক্রের দ্বিতীয় অধিবেশনের কোর্স উদ্বোধনী বক্তৃতা : ১৯৯৯।

নানা প্রসঙ্গ

আজকের সভার সম্মানিত প্রধান অতিথি, তানভীর মোকাম্মেল (যদিও সে এখন একজন জাঁদরেল চিত্রনির্মাতা, তবু ছাত্র বলে এই মুহূর্তে তাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছি না), ওখানে ওই-যে মাননীয় চেহারার পক্বকেশ বাচ্চাটি বসে রয়েছে—মানবার হাসিন মুরাদ (সে যদিও চেহারার দিক থেকে আমার ওস্তাদের মতো কিন্তু তানভীরের মতো সে-ও আমার ছাত্র বলে একইরকম অধীন), ও বন্ধুরা,

সুধীজনের মধ্যে এত ছাত্র দেখে কালকে ঘটে-যাওয়া একটা ঘটনা মনে পড়ছে। কালকেই সীতাকুণ্ডের এক অনুষ্ঠানে সভাপতিকে আমি যেই বলেছি 'শূন্যের সভাপতি' অমনি সভাপতি করজোড়ে দাঁড়িয়ে কাতরকণ্ঠে বলে উঠল : "শূন্যের নয়, আমাকে স্নেহভাজন সভাপতি বলুন। আমি আপনার ছাত্র।" শিক্ষক হবার এই সুবিধা। শিক্ষকতা করতে-করতে একবার বুলো হয়ে গেলে অনেক মহামহিম লোকদেরও অনায়াসেই তুই-তোকারি করা যায়।

শামসুর রাহমান সাহেব একটু আগে বলেছেন চলচ্চিত্রের ব্যাপারে তাঁর কথা বলার অধিকার নেই। এ যদি সত্যি হয় তাহলে আমার অবস্থাটা কী। তিনি দেশের প্রধান কবি এবং একজন শিল্পসফল মানুষ। আমি ঠিক উল্টো। কিন্তু কিন্তু শিল্প আমি চেষ্টা করে দেখেছি এবং প্রত্যেকটাতেই ব্যর্থ হয়েছি। কাজেই শামসুর রাহমান সাহেব যদি অনধিকারী হন তবে আমি অবান্তর। না, শৈল্পিক অধিকারের সূত্রে আমি এখানে আসিনি। যে-কারণে আমি আজ এখানে তা প্রতিষ্ঠানিক। কেন্দ্রের নির্বাহী হিশেবেই এখানে কথা বলার সুযোগ জন্য ডাকা হয়েছে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আমরা যখন প্রথম করার কথা ভাবি তখন মূলত সাহিত্যক্ষেত্রের দুরবস্থার কথা ভেবে এটা করার কথা ভেবেছিলাম। পরবর্তীতে আমরা দেখেছিলাম যে, শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে যোগ্য ও সম্পন্ন মানুষ তৈরি করে

আমাদের দায়িত্ব শেষ হবে না। একটা জাতির জীবন অনেক বড়। তার অঙ্গন বহুমুখী, শাখা বিচিত্র। সব জায়গায় শক্তিমান মানুষ দরকার। সব অঙ্গনে যোগ্য, উৎকর্ষমণ্ডিত বা সমৃদ্ধ মানুষ তৈরি না হলে এই জাতির সামগ্রিক রূপ তৈরি হবে না। তখন আমরা এটাকে বহুমুখী করে তোলার চেষ্টা করেছি। সংগীতের ক্ষেত্রে কিছু পঠন-পাঠনের কর্মসূচি হাতে নেবার কথা আমরা ভেবেছি। চলচ্চিত্রের ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলনের কথা ভেবেছি। চিত্রকলার বেলাতেও তাই। মানবজ্ঞানের সম্ভাব্য সব শাখার ব্যাপক চর্চার বিষয়টি জরুরিভাবে হাতে নেওয়া হয়েছে। এজন্য আমরা বহু আগেই এখানে একটা সংগীত-লাইব্রেরি করার চেষ্টা করেছিলাম। চলচ্চিত্র-বিভাগ গড়ে-তোলার চেষ্টা করেছি। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের মতো জ্ঞানের প্রতিটা শাখার চর্চা ও পঠন-পাঠনের আয়োজন করতে চেষ্টা করেছি যাতে বহু বিষয়ে অল্পজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের পাশাপাশি অল্পবিষয়ে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ আমাদের সমাজে জন্ম নিতে পারে—এমন সব জলাশয়ের মতো মানুষ, যাঁদের কাছ থেকে দেশ ও জাতি প্রয়োজনের মুহূর্তে তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করতে পারবে, যাঁরা সুদিনে ও সংকটে নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে জাতিকে সাহায্য করতে পারবে। একটা জাতির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এরকম মানুষ খুবই জরুরি।

বি.বি.সি. বা সি.এন.এন. টেলিভিশনে দেখি কোনো তুচ্ছাতিতুচ্ছ সংকট দেখা দিলেও সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় একজন বিশেষজ্ঞ বা বিশ্লেষক এসে যান যিনি ওই বিষয়ে দর্শককে বিশদভাবে আলোকিত করেন। আমাদের দেশে ওই মানুষ কম! আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় তো আজ পুরোপুরি বন্ধ্যা, জ্ঞানের প্রধান উৎসে নিরুদ্ধ। ওই মানুষ না-থাকায় জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনের সমস্যা ও সংকটের ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত বেদনাবান ও সংগ্রামী মানুষ আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। কেন্দ্রে সেই চেষ্টা আমরা করছি। সংশপ্তক, শক্তিমান, মূল্যবোধসম্পন্ন, আলোকিত ও সংগ্রামী মানুষ গড়ে-তোলার চেষ্টা।

একসময় দীর্ঘকাল আমি টেলিভিশনের পর্দার জন্য মাতালের মতো কাজ করেছি। কয়েকশো অনুষ্ঠান করেছি এর পর্দায়। সে-সময় টেলিভিশন আজকের তুলনায় অনেক প্রাণবন্ত আর বর্ণাঢ্য ছিল। আমরা অনেকে মিলে একে জীবন্ত করে রেখেছিলাম। আজকালও রাস্তাঘাটে লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে প্রায়ই তারা উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করে : টেলিভিশনের হল কী? এভাবে মরে গেল কেন মাধ্যমটা? কেন যান না আপনারা? কেন জনসাধারণের কথা ভাবেন না? আমি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করি : টেলিভিশনের অধঃপতন টেলিভিশনের দোষ নয়। এর জন্য দায়ী দেশের শিক্ষা আর সংস্কৃতি অঙ্গনের শূন্যতা। টেলিভিশন তো একটা মাধ্যম মাত্র। ওটা একটা যন্ত্র। হৃদয়হীন শীতল নিরেট একটা যন্ত্র। ও নিজে তো কিছু করে না। একটা জাতির প্রতিভা আর শক্তিমত্তার উজ্জ্বল জিনিসগুলোকে

জনসাধারণের সামনে হাজির করে মাত্র। একটা জাতির প্রতিভাদীপ্ত মানুষেরা গড়ে ওঠে তার শিক্ষা-সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে, তাদের দীপ্তিতেই টেলিভিশনের পর্দা আলোকিত হয়। যদি জাতির সেইসব এলাকা শূন্য হয়ে যায়, তার শিক্ষা-সংস্কৃতির আলো আর উদ্ভাবনীর আলো নিভে আসে, যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ যদি গড়ে না ওঠে—তাহলে তার পর্দার জগৎ তো নীরক্ত হবেই।

আজ আমাদের টিভি-পর্দার নিঃস্বতার জন্যে যদি কাউকে অভিযুক্ত করতে হয় তবে প্রধানভাবে যাকে করতে হবে তা হল আমাদের মূল্যবোধবর্জিত শিক্ষা-সংস্কৃতি-জগৎকে। এই জগৎ সম্পন্ন-মানুষদের জন্ম দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হচ্ছে। এই অঙ্গনে আজ যোগ্য আর মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের জন্ম না হলে কী করে টিভি-পর্দাকে আমরা প্রাণবন্ত করব? এই অসহায় অবস্থার কথা ভেবে একবার আমি চেষ্টাও করেছিলাম একটা অনানুষ্ঠানিক টিভি-ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে যেখান থেকে কিছু উজ্জ্বল মেধাবী ও যোগ্য টিভি-ব্যক্তিত্ব গড়ে-তোলা সম্ভব হবে। আমার সে-চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।

কেন আজ আমাদের দেশে সম্পন্ন-মানুষ জন্মগ্রহণ করছে না, এর কারণ বের করা কঠিন নয়। উৎকর্ষসম্পন্ন মানুষকে জন্ম দিতে যে-উৎকর্ষপূর্ণ পরিবেশ দরকার, সেই পরিবেশ আমাদের দেশে বিরাজ করছে না। পরিকীর্ণ অরাজকতা দেশের সর্বশেষ শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। যে-মানুষেরা ফিল্ম তৈরি করবে সেই বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রেরণাসম্পন্ন মানুষের জগৎ যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে ভালো ফিল্ম পাব কী করে? একটা জাতির শিক্ষাঙ্গন যদি অবক্ষয়ী হয়ে থাকে, তাহলে টেলিভিশন একা দাঁড়িয়ে কী করবে? সেজন্য আজ আমাদের সাংস্কৃতিক জগৎকে শক্তিশালী করে গড়ে-তোলা দরকার। দরকার জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে যোগ্য আর শক্তিমন্ত মানুষ তৈরি করা। আর এটা করতে হবে আমাদেরই রক্ত, ঘাম আর অশ্রু দিয়ে, নিজেদেরই প্রচেষ্টায়।

রাহমান ভাই বলছিলেন সরকারের কাছে আবেদন করতে যাতে সরকার ফিল্ম ইনস্টিটিউট তৈরির উদ্যোগ নেয়। কিন্তু আমার ধারণা, আমাদের দেশের সরকারকে এসব কাজে ডেকে না-আনাই ভালো। আনলে তা হবে কেউটে খুঁচিয়ে বিষ আনারই মতো হবে। বর্তমানে আমাদের সরকার এমন একটা মারাত্মক বিষের মতো যা যাকে স্পর্শ করে তাকেই শেষ করে ফেলে। সরকার আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে গ্রাস করে তাকে আগাপাশতলা ফোকলা করে ফেলেছে। আমাদের শিল্পাঙ্গনকে স্পর্শ করে তাকে পুরোপুরি ধ্বংস করেছে। আজ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলোর জন্যে প্রত্যেক বছর সরকারকে আড়াই হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়। গরিব জনগণের [illegible] থেকে দিতে হয় এটা। [illegible] করা না হলে এই টাকা দিয়ে প্রতি দেড়বছরে আমরা দেশে একটা করে যমুনা ব্রিজ তৈরি করতে পারতাম।

ব্রিটিশ আমল থেকে এদেশের মানুষ চিরকাল ভেবে এসেছে সরকার আমাদের

ভাগ্যের উন্নতি করবে। কিন্তু কোনোদিন কি সরকার তা করেছে? সরকারকে আমাদের দেশে চিরকাল ভাবা হয়েছে এমন এক সর্বশক্তিমান বিধাতা হিশেবে, যিনি মাথার শ-খানেক ফুট ওপরে কোনো কারুকার্যখচিত কার্পেটের ওপর বসে আছেন, আর তাঁকে ঘিরে দাঁড়ানো গিজগিজ-করা দুঃখী মলিন অগণিত রুগ্ণ দেশবাসীর উদ্দেশে ইচ্ছা-আনন্দে একেক মুঠো চকোলেট একেকদিকে ছুড়ে দিচ্ছেন আর নিরন্ন দেশবাসী সেই চকোলেটের ওপর হাভাতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে এক-আধটা চকোলেট পাওয়াকে অভাবিত সৌভাগ্য ভেবে আত্মপ্রসাদ পাচ্ছে।

অতীতের রাষ্ট্রশাসকেরা এদেশের জন্যে কিছু করেনি। কারণ তারা ছিল বিদেশি। এদেশ লুটপাট ভোগদখল করা ছিল তাদের কাজ। এদেশের মঙ্গলের কথা তাদের ভাবার কথা নয়। আমাদের আজকের সরকার যদিও আমাদেরই সরকার, তবু রাতারাতি তার কাছে অভাবিত কিছু প্রত্যাশা করে লাভ নেই। আমাদের সরকার ঐসব বিদেশি সরকারগুলোরই যুগযুগান্তের ক্লেদ আর পাপের উত্তরাধিকার বহন করছে। এই সরকারের সেই শক্তি নেই। সরকার নিজেই বিভ্রান্ত, হতাশ, জনবিচ্ছিন্ন আর নিজের অবৈধতার পাপে ও অভিশাপে নিজেই নিমজ্জিত। জাতির ভেতরকার শক্তিকে জাগিয়ে তুলেই আমরা কেবল এর সমাধান করতে পারব। আমার যা চাওয়া তা পাওয়ার দায়দায়িত্ব আজ আমাকেই নিতে হবে। সারাদেশকে আজ সারাদেশের দায়িত্ব নিতে হবে।

কেন আমরা তা পারব না? আমরা তো আজ স্বাধীন। আজ কে এসে আমাদের ভাগ্যের দায়িত্ব নেবে? কেন আমরা আমাদের বাঁচানোর দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হবার কথা ভাবছি? এই ভাবনাকে যদি আমরা কাজে লাগাই তবে এই পথ ধরে যে-সরকার আসবে সেই সরকারই হবে জনগণের সরকার। আমাদের তৈরি আমাদের সরকার।

আজ সরকারের ক্ষমতা কতটা নিঃস্ব, তার একটা উদাহরণ দিই। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নজরুল-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এ-বছর একটা বিরাট অঙ্কের টাকা খরচ করবে। এমন গরিব দেশে কেবল উৎসবের আতশবাজি পুড়িয়েই কি টাকা শেষ করা উচিত? শুধু রণসংগীতের আর ঢাকের আওয়াজের জন্যে সমস্ত সম্পদ শেষ করে দেওয়া? এর চেয়ে যদি সরকার একটা প্রোগ্রাম নিয়ে বলত : আমরা দেশের দুশো মানুষকে নজরুল বিশেষজ্ঞ হিশেবে গড়ে তুলতে চাই। বড় ধরনের আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করে নজরুলের কবিতা, সাহিত্য, সংগীতের ওপর ব্যাপক পড়াশোনা করিয়ে এমন দুশো জন সুযোগ্য লোককে অনায়াসেই গড়ে তোলা যেত যারা হত এদেশে তাঁর সাহিত্য-সংগীতের ধারক-বাহক। এতে খরচ এর অর্ধেকের বেশি হত না, অথচ নজরুলের অস্তিত্বকে এদেশে আগামী পঞ্চাশ বছর বাঁচিয়ে রাখার মতো রক্ষক-সম্প্রদায় তৈরি হয়ে যেত। একবার তৈরি হলে

পুরুষানুক্রমে সে-ধারা অব্যাহত থাকে।

কিন্তু সরকার এটা কখনোই করবে না। এই সংস্কৃতি বা সৃষ্টিশীলতার ভিত্তিতেই আমাদের দেশের রাজনৈতিক মানুষদের ভেতর নেই। সমৃদ্ধ মানুষই-যে দেশের মুক্তি তা তাঁদের বুঝিয়ে ওঠানো যায় না। কেবল বাতি-পোড়ানো আর উৎসব-অনুষ্ঠানের ওপারে তারা কিছুই দেখতে পায় না। এমন মানুষরাই এখন সরকারকে কুক্ষিগত করে রেখেছে। যে-সরকার কেবল বিদেশি ভিক্ষা নিয়ে জাতিকে গড়ে তুলতে চায় সে আসলেই কী দিতে পারে? আমি একটু আগে তানভীরকে কথায় কথায় বলছিলাম : তানভীর তুমি নিজেই কেন দেশে একটা ফিল্ম-ইনস্টিটিউট তৈরি করো না? তুমি তো ইচ্ছা করলেই পারো। আমি জানি ও উদ্যোগ নিলে দশ-বছরের মধ্যে এদেশে ফিল্ম-ইনস্টিটিউট হয়ে যাবে। সারা দেশজাতি আজ দেশের শক্তিমান মানুষদের কাছে এইসব উদ্যোগের জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। বহু মানুষের মধ্যে এই শক্তিও রয়েছে। তবু আমরা এসবের জন্য কেবলই সরকারের দিকে প্রত্যাশার করুণ হাত বাড়িয়ে রেখেছি।

দেখুন, আমাদের দেশে একটা নাট্যমঞ্চ হল না আজ পর্যন্ত, অথচ এ এমন একটা প্রসঙ্গ যাতে রাস্তার লোক থেকে রাষ্ট্রনায়ক-রাষ্ট্রপ্রধান কারোর কোনো দ্বিমত নেই। প্রত্যেকে আগ্রহী। প্রত্যেকে উন্মুখ। তবুও হয়নি এ। কেন হল না? কারণ আমাদের নাট্যকর্মীদের মধ্যে থেকে এমন একটা মানুষও আজপর্যন্ত পাওয়া গেল না যিনি এর জন্যে জীবন থেকে কিছু সময় বা শ্রম উৎসর্গ করতে রাজি। কিছুদিন আগে হঠাৎ করেই আমাদের 'নটসূর্যদের' সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁদের বলেছিলাম : দেখুন, আপনারা প্রত্যেকেই জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ। প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয়। সবাই ক্ষমতাশালী। সবাই সফল। দেশশাসকদের দরজা আপনাদের জন্যে খোলা। আপনাদের কেউ যদি সিদ্ধান্ত নিতেন (না, তেমন কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নয়), কেবল নিজেকে বলতেন আমি আজ থেকে হাঁটা শুরু করলাম, একটা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা না করে আমি ফিরব না—বেশি নয়, দিনে মাত্র দু-ঘণ্টা কাজ করলেই কিন্তু এটা হয়ে যেত। ব্যক্তিগতভাবে আপনারা এতটাই ক্ষমতাধর যে যদি আপনাদের একজনও বেরোতেন তাহলেও এদেশে গ্রুপ-থিয়েটারের উপযোগী একটা ভালো নাট্যমঞ্চ তৈরি না-হয়ে পারত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা আপনারা কেউ করেননি। এর দায়িত্ব কেবল সরকারের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে সরকারকেই শুধু গাল দিয়ে বেড়িয়েছেন।

সরকারের ওপর নির্ভর করলে কী হয় আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন। সরকারের উদ্যোগে শিল্পকলা একাডেমিতে যে-নাট্যমঞ্চ তৈরি হচ্ছে তা নির্মিত হবার আগেই দু-দুবার ইটকাঠসহ ধসে পড়েছে। এসব তাড়াতাড়ি উৎরে নির্মাণ যদি কোনোদিন শেষও হয়, আমার ধারণা সেদিনটাতেই ঘটবে সবচেয়ে নাটকীয়

ঘটনা। সমস্ত উদ্যম আর স্বপ্নের শেষ দিন। যেদিন ওই নাট্যমঞ্চ উদ্বোধন করতে প্রধানমন্ত্রী আসবেন, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা আসবেন, দেশের সব জ্ঞানী-গুণী শ্রদ্ধেয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এই নাট্যমঞ্চে সমবেত হবেন (রাহমান ভাইও বসবেন), সেদিন শেষ বিকট শব্দে হঠাৎ ওটা দেশের ওই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মাথার ওপর ভেঙে পড়ে সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটাবে।

কিন্তু এসব তো জাতীয় প্রতিষ্ঠান নিয়ে কথা। জাতীয় প্রতিষ্ঠান অনেক বড় জিনিশ। অতবড় কিছু আমরা ভাবি না। আমাদের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্যোগটা নেহাতই সামান্য ব্যাপার। সামান্য, কিন্তু আমাদের রক্ত আর অশ্রুর দামে কেনা শিল্পপ্রেমিকদের এটা একটা শুঁড়িখানা। আমাদের সবার সাংস্কৃতিক মক্কা। ব্যাপকভাবে বড় জিনিশ করা আমাদের শক্তির মধ্যে নেই। কিন্তু আপাতদৃষ্টে ছোট হলেও অনেক বড় জিনিশ সম্ভব এখানে। এই ধরনের ছোট্ট জায়গাগুলো থেকেই চিরকাল জন্ম নিয়েছে জগতের শ্রেষ্ঠ চেতনাগুলো। প্লেটোর একাডেমি, এরিস্টটলের লাইসিয়াম ছিল এমনি সব ছোট্ট জায়গা। এদের শক্তি যেন আমরা না ভুলি।

আপনারা এসেছেন আমাদের ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সে যোগ দিতে। একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে, আনন্দের ভেতর, শিল্পের রসাস্বাদনের ভেতর আপনারা বেড়ে উঠুন, আমরা আপনাদের সেই অবিশ্বাস্য বিকাশ দেখার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছি। আজ এখানে যাঁরা এসেছেন তাদের মধ্যে হঠাৎ কেউ কোনো সময়ে অভাবিতভাবে জ্বলে উঠে অসম্ভব কিছু করেও বসতে পারেন, কেউ বলতে পারে না।

আগেই বলেছি, পৃথিবীর বড় বড় জিনিশগুলো কিন্তু এমনি সব ছোট জায়গা থেকেই—এমনি আলসেমি আর অবকাশে ভরা অবসরের আঙিনা থেকেই জন্মেছে—এমনি বন্ধুত্ব উষ্ণতা আর আন্তরিকতার ভেতর থেকেই। বড় জায়গা থেকে বড় বা ক্রিয়েটিভ জিনিশ হয়েছে এরকম ঘটনা খুব-একটা দেখা যায় না। কটি বলেছে ছাত্র একটু বেশি হয়ে গেছে। ষাট থেকে সত্তর জন। আমি বললাম: দেখ, এর মধ্যে হয়তো তিরিশজন এমনিতেই ঝরে যাবে। ঝরুক। হয়তো চল্লিশ জনও ঝরে যেতে পারে। কিন্তু হঠাৎ যদি এদের একজনও জ্বলে ওঠে তাহলে আর কী দরকার তোমার? আর কে জানে ওই সত্তরজনের সত্তরজনই জ্বলে উঠবে না! যদি কেউ শেষপর্যন্ত সত্যিসত্যি সৃষ্টিশীল না হয়ে ওঠে, যেমন হয়েছে আমার ক্ষেত্রে, তারাও তো অন্তত একটা জিনিশ হতে পারে: সমঝদার।

সমঝদার কথাটাকে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। সমঝদার শিল্পীর চেয়ে কমকিছু নয়। সমাজে সমঝদার না-থাকলে শিল্পী তৈরি হয় না। আস্বাদনকারীকে মুগ্ধ বিস্মিত হতবাক আর পরাজিত করে দেবার দুর্বার আকূতি থেকেই জেগে ওঠেন শিল্পী। এভাবেই আকবর বা শাহজাহানের কারণে জেগে উঠেছিলেন তানসেন, জন্ম হয়েছিল তাজমহলের। শিল্পে স্রষ্টা আর রসিকের মধ্যে একটা হৃদয়ের

যোগাযোগের ব্যাপার আছে। ওটা না হলে শিল্প হয় না। রবীন্দ্রনাথের 'গানভঙ্গ' কবিতায় একটা কথা আছে:

একাকী গায়কের নহে তো গান মিলিতে হবে দুইজনে
একজন গাহিবে খুলিয়া গলা আরেকজন গাবে মনে।

গান শুধু গায়কের নয়, গায়কের সমঝদারের দুজনের। দুজনে মিললে তবে শিল্প। একজনকে গাইতে হবে কণ্ঠ খুলে, আরেকজনকে মনে-মনে। এই দুইয়ের মধ্যে সঙ্গত ঠিকমতো না হলে শিল্প হবে না। আমাদের এখান থেকে যদি কেউ শিল্পী না-ও হয়, সে যেন সমঝদার হয়। একটা সমাজে ভালো সমঝদার থাকা ভালো-শিল্পী গড়ে-ওঠার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের এই আয়োজন ছোট্ট। এখানে ছোট্ট পরিসরে শিল্পপ্রেমিকদের উৎসুক শিল্পযাপন। আমরা চাই শিল্পপ্রেমিকদের উৎসাহে, উদ্দীপনায়, ভালোবাসার আলোতে এই জায়গাটা ঝলমল করুক। এটুকু হলেই আমরা খুশি। সরকারের একটা কর্মসূচি আছে দেশজোড়া, অনেক হইচই আছে তার মধ্যে। কিন্তু সে-কর্মসূচিও যেখানে যে-জায়গাটাতে আয়োজিত হচ্ছে সেখানে ছোটভাবেই আয়োজিত হচ্ছে। একটা ছোট্ট মোমবাতির মতো চারপাশের অন্ধকারের মধ্যে সে নীরবে জ্বলছে। এ-কর্মসূচিও তেমনি হোক। ছোট্ট কিন্তু মনস্বিতা, লেনদেন, ভালোবাসা আর আলোর দেওয়া-নেওয়ায় সম্পন্ন। প্রাণ খুলে যেন জীবনকে এখানে বিছিয়ে দিতে পারে সবাই; এর উষ্ণ সুস্মিত পরিবেশ থেকে যেন নিজেরা অর্থপূর্ণ জন্ম নিতে পারে। ডিম হলেই তা থেকে কিন্তু বাচ্চা হয় না। প্রতিটা ডিমকে বুকের পুরো উষ্ণতা দিয়ে 'তা' দিতে হয়, তবেই তা ফোটে। দেখা যায়, যে-ডিমগুলো মোরগ-মায়ের বুকের খুব কাছে থাকে, ঠিকমতো ওম পায়, সেগুলো ফোটে বেশি। দূরেরগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এজন্যেই সৃষ্টিশীলতার জন্যে ছোট্ট জায়গা লাগে, ছোট্ট কিন্তু উষ্ণ আর জীবনের তাপে প্রাণবন্ত। আমরা কেন্দ্রে সবার জন্য তেমনি ছোট্ট একটু মায়ের হৃদয় তৈরি করে রেখেছি—সারা দেশে, সবখানে। সেই উত্তাপ আর উষ্ণতা এখানেও উত্তাপ ছড়াক, জীবনের আঁচে অন্তরঙ্গ করে তুলুক। শুভেচ্ছা।

ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সের উদ্বোধনী বক্তৃতা : [illegible]

আমগাছের তলার অবসর

আজকের সভার প্রধান অতিথি সাঈদ ভাই,

সাঈদ ভাই এবং তারুণ্য চিরদিনই সমার্থক। সাঈদ ভাইয়ের কোনোদিন বয়স হবে এটা আমাদের কাছে ছিল অবিশ্বাস্য। তাঁর সাম্প্রতিক অসুস্থতা জীবন-সম্বন্ধে আমার চিন্তাটাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে। হঠাৎ যখন শুনলাম সাঈদ ভাইয়ের অসুখ, সাঈদ ভাই কথা বলতে পারছেন না, তখন একবারে মুষড়ে পড়েছিলাম। কথাবার্তায় যিনি ছিলেন সবচেয়ে স্বতস্ফূর্ত, যাঁর প্রাণের ঝরনা আমাদের প্রাণে-মনে হীরের কুঁচির মতো দীপ্তি ছড়িয়েছে, তিনি আজ কথা বলতে পারছেন না—কী করে এ-কথা বিশ্বাস করি! তবু এটাই হয়তো মানুষের নিয়তি। অফুরন্ত কথা-ভরা সাঈদ ভাই একসময় তরুণ ছিলেন, প্রাণের আনন্দে সবাইকে উপচে দিয়েছেন এটাও যেমন সত্য, তেমনি একদিন সেই কণ্ঠ স্তব্ধ হবে সেটাও একইরকম সত্য। রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'য় লিখেছেন :

এমন একান্ত করে চাওয়া
এ-ও সত্য যত
এমন একান্তে ছেড়ে যাওয়া
সে-ও সেই মতো।
এ-দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল
নাহিলে নিখিল
এতবড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

এ সত্যকে মেনে নিতেই হবে।

আর ওই-যে তারেক মাসুদ, এখন বেশ নামটাম করে ফেলায় আমাদের আর চিনতে চায় না, তাকেও বছরের-পর-বছর দেখেছি ওই আমগাছটার নিচে বন্ধুদের সঙ্গে বসে গালগল্পে সময় পার করতে। জীবনের শুরুতে ওরকম একটা আমগাছ আমাদের সবার জন্যেই দরকার। ওই বয়সটা আমাদের আলস্যের সময়, গল্পের সময়, স্বপ্নের সময়, আহরণের আর পাতা-ছড়ানোর সময়। ওই সময় ওরকম একটা আমগাছের নিচে কিছুদিন উদার অবকাশের স্নেহর না-কাটাতে পারলে আমাদের হৃদয় ঠিকমতো পাতা মেলে না। ওইজন্য আমরা আমগাছটাকে কেন্দ্রের মাঝখানে রেখে দিয়েছি।

আমাদের এই দালানটা যখন তৈরি হয় তখন ওই আমগাছটা ছিল ছোট্ট। সবে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের আর্কিটেক্ট ছিল উত্তম। আমাদের পাঠচক্রেরই ও সভ্য ছিল। দালানের প্ল্যান করা শুরু হলে আমি উত্তমকে বলেছিলাম, 'গাছটাকে কেটো না উত্তম! দরকারে দালানটাকে সরিয়ে দাও।' উত্তম সেভাবেই প্ল্যান করেছিল। গাছটা তখন ছিল এতটুকু, এখন আমাদের গোটা আঙিনাকে ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। এ বৎসর তেমন মুকুল আসেনি। কিন্তু প্রত্যেক বছর সোনালি মুকুলের অপার্থিব সৌন্দর্যে আর মদির গন্ধে সমস্ত জায়গাটাকে মাতাল করে রাখে। সাত, দশ বা পনেরো দিন এমনটা থাকে। আমার মাথা তখন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু ছাত্রদের অনেকের মধ্যেই তেমন কোনো বিকার দেখি না। আমি একটা বইয়ে এই গাছটাকে নিয়ে লিখছি। লিখেছি সৌন্দর্যের এমন একটা আশ্চর্য বৈভবের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের তো পাগল হয়ে যাওয়ার কথা। তার তো চিৎকার করার কথা। পাগল তো চিৎকার করে, কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েদের সেই চিৎকার কোথায়।

ঋতুর পরিবর্তনের হাত ধরে প্রকৃতিতে ফুল ফোটে। ফুল একসময় পরিণত হয় ফলে, সেই ফল থেকে হয় গাছ, অরণ্য। এই সময়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ফুলের সময়টুকু। তাই পৃথিবীতে ফুল এত সুন্দর। মানুষের জীবনে শৈশব-কৈশোরের যে-গুরুত্ব, গাছের জগতে ফুলের ঠিক তাই। এই গুরুত্বের কথা টের পেয়েছিলেন বলেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'চাইল্ড'কে 'ফাদার অফ দ্য ম্যান' বলেছিলেন। এই পর্বটিকে নিটোল এবং পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই জীবন ফুলে-ফলে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে।

জীবনের এই-যে ফুলের মরশুম, সেই মরশুমটিকে যদি একবারের জন্য হলে, আলোয়, আর আকাশের সৌন্দর্যে ভরিয়ে দেওয়া যায়; একবার যদি তখন একপশলা গাঢ় বৃষ্টি হয়ে যায়; তাহলে সারাজীবনের জন্য সেই মানুষটি সজীব আর বলীয়ান হয়ে গেল। মধ্যযুগের কবি গোবিন্দদাসের একটি কবিতা আছে। কবিতাটি

হিন্দি-বাংলা মেশানো ব্রজবুলি ভাষায় লেখা। কবি লিখেছেন—"অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব/কি করব বারিদ মেহে"। অঙ্কুর হয় কখন? বসন্তে। ফুল আসে বসন্তে। তো, সেই ফুল বা অঙ্কুর চৈত্রের খররোদ্রেই যদি জ্বলে ছাই হয়ে যায়, তবে পরে বর্ষা এসে করবেটা কী? পরে যতই বর্ষার ধারা তার ওপরে ঝরুক, ওই ফুলকে তো আর ফোটাতে পারবে না।

মানুষের জীবনটাও তেমনি। যখন আমাদের তরুণ-বয়স, সেই সময়টাতেই একটা ভালোমতো বৃষ্টি হওয়া দরকার জীবনের ওপর। একটা সুন্দর স্নিগ্ধ আর স্বাস্থ্যপ্রদ ধারাবর্ষণ—যার স্পর্শে জীবনটা সোনালি ফসলে ভরে উঠবে। তা হলে ওই গাছ-যে কেবল সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে তা নয়, অবারিত উপহারে সে পরিপার্শ্বকে সমৃদ্ধ করবে। সেজন্যেই তরুণ-বয়সটা এত গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্য আমি সবসময় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সমস্ত কর্মসূচিতে তারুণ্যকে গুরুত্ব দিয়েছি। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের আমি আমাদের কর্মসূচির মধ্যে সবচেয়ে বেশি টেনে এনেছি। জীবন গড়ে-তোলার জন্যে তাই তরুণ-বয়স একটা বড় সময়। শিশু-কিশোর বয়সে মন কাঁচা আর সজীব থাকে বলে যে-কোনো ভালো ও নতুন কথাই তারা সহজে ভেতরে নিতে পারে ও তাতে বিশ্বাসী আর উদ্বুদ্ধ হয়। তাই মানুষের জীবনে যদি উন্নত বীজ বপন করার কথা ভাবতেই হয় তবে তা শৈশব-কৈশোর পর্যায়েই ভাবা উচিত।

একদিন অধ্যাপক রেহমান সোবহান হাসতে হাসতে আমাকে বলেছিলেন : আপনি তো দেশের শিশুদের পড়াচ্ছেন, যদি বয়স্কদের পড়াতে পারেন তবে আমি আপনার নাম অমুক পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করব। পুরস্কারটা এতবড় যে শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম : বড়দের পড়াতে যাব কোন দুঃখে? তারা তো কদিনের মধ্যেই বিদায় নেবে। যদি তাদের বিকাশ ঘটেও তবু কদিন তারা এই সমাজ-সংসারকে প্রভাবিত করবে? খুব জোর পাঁচ কি দশ বছর! কিন্তু একটা কিশোর বা কিশোরীকে যদি আমি বড় করে তুলতে পারি তবে সে আগামী পঞ্চাশ-ষাট বছর এই সমাজকে প্রভাবিত করবে। আমি সেজন্যেই তারুণ্যের ভক্ত। তরুণদের বড় হওয়া মানে আগামী পৃথিবীর বড় হওয়া। তাই তাকে আলো হাওয়া পানি দিয়ে, স্বপ্ন শক্তি সম্ভাবনা দিয়ে বড় করে তোলা দরকার।

চলচ্চিত্র-চক্রের এরই মধ্যে একবছর পার হয়েছে। এর মধ্যেই এর সংগঠকদের সাফল্য এসেছে। তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এরা একে আরো বড় করে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। সে-স্বপ্ন এতবড় যে তার সঙ্গে আমি তাল মেলাতে পারছি না। নিজের স্বপ্নের সঙ্গে পুরো একাত্ম না হলে কোনোকিছুই ভালোভাবে গড়ে ওঠে না। ওদের মধ্যে সেই একাত্মতা আছে। যোগ্যতা দিয়ে তারা তাদের বিকাশ দাবি করছে। কাজেই যেভাবে যেমন করে হোক তাদের

সহযোগিতা দিতে হবে।

আমাদের দেশে মানুষের আত্মিক মৃত্যুর শেষ নেই। প্রতিপলে এদেশের কোটি কোটি মানুষের ইচ্ছা, স্বপ্ন, সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটছে। আমরা যা হতে চাচ্ছি, যা হবার জন্যে আমাদের হৃদয় কাঁদছে, পরিপার্শ্বের চাপে তা নিষ্পিষ্ট হচ্ছে। প্রমথ চৌধুরী এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'দেহের মৃত্যুর রেজিস্ট্রি রাখা হয়, কিন্তু আত্মার মৃত্যুর রেজিস্ট্রি রাখা হয় না।' যদি সে রেজিস্ট্রি রাখা হত তাহলে হয়তো দেখা যেত আমাদের বারো কোটি লোকের মধ্যে এগারো কোটি নব্বই লক্ষ লোকই মৃত। নানা কারণে আমরা মরে যাই। সামান্য একটু সুযোগের অভাবে, সামান্য একটু মমতার অভাবে এই মৃত্যু ঘটে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে কিন্তু আমরা মৃত্যুতে বিশ্বাস করি না। এখানে আমরা সবসময় নতুন জন্মের জন্য উৎকর্ণ। আমরা এখানে জড়ো হয়েছি নতুন সম্ভাবনা, নতুন উদ্যমকে আবাহন করতে। নতুন নতুন দিগন্তের দিকে এগিয়ে যেতে। উদ্যম নিয়ে, যোগ্যতা নিয়ে এখানে যারাই আসবে তারাই আমাদের সহযাত্রী। চলচ্চিত্র-চক্র সে-উদ্যম নিয়েছে, এর প্রতি আমাদের সমর্থন অবিচল থাকবে।

একটু আগে এই বিভাগের সংগঠক জহিরুল ইসলাম কচি বলেছে, নানান ধরনের অগ্রসর-কোর্স চালু করার কথা ওরা ভাবছে। এমনকিছু কোর্স চালাবে যা থেকে সত্যজিৎ রায় তৈরি হোক না হোক, ভালো পরিচালক তৈরি করা হবে, ভালো কর্মীর জন্ম হবে। চলচ্চিত্র-নির্মাণের সৃষ্টিশীল ক্ষমতা যাদের আছে, সুযোগ্য লালনের মাধ্যমে তাদেরই প্রতিভা বিকাশে সহায়তা দেওয়া হবে। আমরা এই মুহূর্তে Film Institute-এর কথা ভাবছি না। প্রথমত জিনিশটা খুবই বড় জিনিশ। তার ওপর বাংলাদেশের এই মুহূর্তের দরকারের সঙ্গেও তা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ধরা যাক, আমরা একটা ফিল্ম-ইনস্টিটিউট বানিয়ে সেখান থেকে বছরে পঞ্চাশজন চিত্রনির্মাতা তৈরি করলাম। কিন্তু লাভটা কী? ফিল্ম বানানোর টাকা তারা পাবে কোথায়? পেলেও কোথায় পাবে সেই উদ্বুদ্ধ প্রযোজক যারা তাদের ইচ্ছামতো চিত্রনির্মাণের স্বাধীনতা দেবে। ফলে পঞ্চাশজন প্রতিভাবান মানুষ এই সমাজে অর্থহীন হয়ে পড়বে, হতাশায় মজে নষ্ট হবে, অন্যদের হতাশ হওয়ার পথ সুগম করবে। এজন্যে এ-ব্যাপারে আমরা মাঝামাঝি পথের কথা ভেবেছি।

আমরা ফিল্ম ইনস্টিটিউট করব না, যা করব তা হল চলচ্চিত্র-চর্চা কেন্দ্র। সেখানে চলবে চলচ্চিত্রের উঁচুমাপের আস্বাদন, উপলব্ধি আর দক্ষতাবৃদ্ধির আয়োজন। সেখানে থাকবে চলচ্চিত্র-চক্র, থাকবে চলচ্চিত্রের রসাস্বাদন কোর্স, থাকবে অতিথি-বক্তৃতা, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র আস্বাদন ও পঠন-পাঠনের সুবিধা, এমনি সবকিছু। এ ছাড়াও থাকবে পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, ফিল্ম এডিটর, স্ক্রিপ্ট রাইটার—সবকিছু গড়ে-ওঠার বিভিন্নমুখী সুযোগ। ফিল্মকে ভালোবেসে যারা এই শিল্পের বিভিন্ন দিকে সম্পন্ন হতে চাইবে তাদের জন্য যাবতীয় সুযোগ সৃষ্টি করার

উদ্যোগ নেওয়া হবে। এদের কারো মধ্যে যদি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থাকে তবে নিশ্চয়ই সে একসময় বেরিয়ে আসবে। কচুগাছ কাটতে কাটতে মানুষ ডাকাত হয়। এই-যে আজ ভালো ফিল্ম দেখানোর, উন্নত ফিল্ম আস্বাদন করার চেষ্টা চলছে, কেউ জানে না এসবের ভেতর দিয়ে কেউ শিল্পের ভুবনে জ্বলে উঠবে কি না। আমার সামনে—এইখানে এই মুহূর্তে যারা আছে—কে জানে তাদের মধ্যে কোনো বার্গম্যান, কুরোসোয়া, আইজেনস্টাইন বা চ্যাপলিন বসে আছে কী না। হয়তো তাদের চেয়ে বড় বা মহান কেউই বসে আছে। কে কখন কোন্ দিকে বেরিয়ে যাবে—অসাধারণকে স্পর্শের পিপাসায়, ভেতরকার শক্তি এবং সম্ভাবনার নেশায় আকাশ আক্রমণ করবে বলা মুশকিল।

তবে একটা জিনিশ না হলে কিছুই হয় না। একাগ্রভাবে মানুষকে নিজের স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। নিষ্ঠার জমিতে একঠায় দাঁড়িয়ে চাষ করতে হয়। নড়লে, বেললে, ভাঙলে চলে না। একাগ্রভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে একসময় জীবনের মধ্যে গতি আসে। তখন সে হয়ে ওঠে আগ্রাসী ও অপ্রতিরোধ্য। আপনারা জানেন, তৈমুর লং-এর রাজধানী ছিল সমরখন্দে। একবার তৈমুর লং-কে জিগ্যেস করা হয়েছিল : আপনি পৃথিবীকে সারাজীবন এভাবে আক্রমণ করে বেড়ালেন কেন? উনি বলেছিলেন—"সমরখন্দের নিরাপত্তার জন্য। সবাইকে সারাক্ষণ আক্রমণ করে এমনই সন্ত্রস্ত রেখেছি যে, কেউ আর সমরখন্দ আক্রমণের কথা ভাবনাতে আনতে পারেনি।" তৈমুর লং-এর মতো অমন নিদ্রাহীন আক্রমণে একাগ্র হয়ে থাকতে পারলেই সাফল্য। জীবনকে পদানত না-করা পর্যন্ত যেন স্বস্তি না আসে।

একটা কথা বলে শেষ করব। চলচ্চিত্র-চক্র শুরু হচ্ছে মানে কী? ফিল্ম দেখা, ফিল্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনা, ফিল্ম নিয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক, উষ্ণ আনন্দময় তর্ক—এসবেরই আনন্দঘন উৎসব শুরু হচ্ছে। সেখানে আইডিয়ার সঙ্গে আইডিয়ার বিরোধ হবে, বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসের। এইসব বিরোধ আর সংঘাতের মধ্যেথেকে নতুন আইডিয়ার স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠবে। কিন্তু আমাদের দেশে হয় উল্টো। এখানে তর্ক আরম্ভ হয় মতবাদ দিয়ে; কিন্তু দেখতে-দেখতে তা প্রথমে নামে ব্যক্তিগত পর্যায়ে, ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে হস্তগত পর্যায়ে। ওই উষ্ণ, উত্তপ্ত অন্তরঙ্গ বিরোধ আর বিতর্কের সুযোগ তো পেতে হবে। না হলে তরুণদের জীবনের রঙিন ফুল-পাতারা পেখম ধরবে কী করে? আজকের বাংলাদেশে তরুণ-তরুণীদের জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ওই আমগাছটার মতো। এখানে আমরা সবাইকে আহ্বান করি। এর নিচে বসে আলাপে, কথায়, সান্নিধ্যে, উষ্ণতায়, স্বপ্নের লেনদেনে, হৃদয়ের বিনিময়ে জীবনকে, তার রঙিন সূচনাপর্বে, একটিবার মেলে ধরার সুযোগ করে দিই মাত্র। বুকভরে জীবনের সৌন্দর্য, আলো, বৈভব নিজের ভেতর শোষণ করে নিতে দিই। আমরা জানি এটুকু পেলেই সারাদেশে শিল্পের প্রজ্বলন শুরু হবে।

আজ সংস্কৃতি-জগতের আমরা যে যেখানে আছি, আমাদের সবাইকে এই জাতির চিৎপ্রকর্ষের জন্যে নিজ নিজ জীবন থেকে কিছু দিতে হবে। না হলে শৈল্পিক বিকাশের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পাবে না। আজ দেশে ১০০০টা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র দরকার। এই ছোট্ট এতটুকু একটি প্রতিষ্ঠান দিয়ে জাতির সর্বগ্রাসী অভাব মোচন হবে না। সব অঙ্গনের উদ্যমশীল ব্যক্তিরা যদি এসবের জন্য নিজের জীবন দিয়ে এগিয়ে না আসেন, দেশের মধ্যে সেই স্পন্দিত উজ্জীবন ঘটবে কী করে? পৃথিবীর যা-কিছু শ্রেষ্ঠ আর বড় তা কেবল বড়মানুষের রক্ত দিয়েই তৈরি হওয়া সম্ভব। মানবজাতির মুক্তির জন্য যিশুদের রক্ত দরকার। শুধু তুচ্ছের, ক্ষুদ্রের, রক্ত দিয়ে বিজয়ের সৌধ তৈরি হয় না। আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা ওই রক্ত না দিলে কী করে সাংস্কৃতিক মুক্তি ঘটবে? শ্রেয়ের জন্য এই রক্তদান শ্রেয়কে কখনো নীরক্ত করতে পারে না। ওই-যে ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান—সন্ধানী—সারাদেশের সব মানুষ সেখানে নিজ শরীরের রক্ত দিচ্ছে; সেই রক্ত মুমূর্ষু অসুস্থ রোগীর জীবন বাঁচাচ্ছে—এতে কি রক্তদাতারা মরে যাচ্ছে? না। বরং হচ্ছে উল্টোটা। ওভাবে রক্ত দিচ্ছে বলে শরীর সুস্থ থাকছে। জীবন অর্থময় হচ্ছে। আমরা সাংস্কৃতিক অঙ্গনের মানুষেরা কিন্তু নিজের রক্ত দিতে চাচ্ছি না। বিশেষত বয়স্করা। এই রক্তটা আমাদের দিতে হবে নিঃস্বার্থভাবে, মমতাবিদ্ধ হৃদয় থেকে। তা হলে অন্যের কাজে তা তো আসবেই, নিজেও দীর্ঘায়ু হওয়া যাবে। দানের তৃপ্তি জীবনকে সমৃদ্ধ করে। একটা সুন্দর কথা পড়তাম আমরা ছোটবেলার পাঠ্যবইয়ে। কথাগুলো এরকম :

As one lamp lights another nor grows less
So nobleness enkindleth nobleness.

একটা প্রদীপ যেমন হাজার প্রদীপকে প্রজ্বলিত করে (কিন্তু নিজে শেষ হয় না), তেমনি মানুষের মহত্ত্বও অন্যকে মহৎ করে চলে (নিজে না কমেও)।

অনেককিছু করার ইচ্ছা আমাদের, কিন্তু পেরে উঠি না। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র খুবই গরিব। আমাদের টাকাপয়সার অসম্ভব কষ্ট। তবু ভিক্ষা করে হোক, হাত পেতে হোক, অনুনয় করে হোক, আমি চেষ্টা করব যাতে সুস্থ চলচ্চিত্রপ্রেমিকদের একটা আনন্দ ও উপকারের জায়গা হিশেবে এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে পারি। গ্রিকরা রাজনৈতিক জীবনে ছিল গণতন্ত্রের পূজারী, সংস্কৃতি-জীবনে আভিজাত্যবাদী। আমাদেরও লক্ষ্য আভিজাত্য ও বৈদগ্ধ্য সম্পন্ন-মানুষ গড়ে তোলা। নিজেকে অতিক্রম করে গড়ে উঠবে সেই মানুষ। শূন্যের চাইতে পাঁচ বড়। আমরা অন্তত সেটুকু হতে সবাইকে আহ্বান জানাই। পাঁচ হলে পঁচিশ হতে বেশি সময় লাগে না।

ওই আমগাছটার তলায় বসে বসে মাসুদদের জীবন একদিন পাপড়ি মেলেছিল বলে আজ ওরা বড় হয়েছে। আগেই বলেছি, এই পাপড়ি মেলার জন্য জীবনের

শুরুতে এমনি কোনো আমতলা, বটতলা, ছাতিমতলার নিচে সবাইকেই কিছুদিনের জন্যে ঘুরে যেতে হয়; না হলে হৃদয়ের কলি বিকশিত হয় না। গৌতমবুদ্ধ এমনি একটা গাছের তলা থেকে জন্মেছিলেন। সৌন্দর্যের সঙ্গে শ্রেয়ের সঙ্গে এই বয়সে একবার ছোট্ট একটু পরিচয় হওয়া দরকার। চোখাচোখি দেখাদেখি হওয়া দরকার। অশোকফুল ফোটার জন্য যেমন সুন্দরীর পদাঘাত দরকার, জীবনের রক্তমঞ্জরি ফোটার জন্যেও তেমনি এই চেনাচেনি দরকার। কেন্দ্রের ভেতর ওই আমগাছটাকে তাই আমরা দাঁড় করিয়ে রেখেছি। সম্পন্নতার সেই জগতে আজ তোমাদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি। তোমাদের সমৃদ্ধিটুকুই আমরা চাই, তারপর তুমি কী করবে সেটা তোমার আর তোমার পরিপার্শ্বের সঙ্গে বোঝাপড়া দিয়েই ঠিক হবে। কোন্ বেদনার তুমি উত্তর দেবে সে-বিবেচনা সম্পূর্ণ তোমার। ধন্যবাদ।

[বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের চলচ্চিত্র চক্র উদ্বোধনে : ১৯৯৮]

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে কিছু কথা

সুধীমণ্ডলী,

...বেশ কয়েকজন বক্তা নানান দিক থেকে বিদ্যাসাগরের ওপর আলোকপাত করেছেন। বিদ্যাসাগরের সব ভূমিকাই প্রায় স্পর্শ করা হয়েছে। তাই আমি ওই বিষয়গুলোর দিকে না-গিয়ে তাঁর একটা ছোট্ট দিক নিয়ে দু-চারটা কথা বলব।

কিছুদিন আগে 'ভোরের কাগজে'র একটা বিভাগে আমাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল। বিভাগটার নাম 'আমার আমি'। কী ভালো লাগে, কী মনে হলে হাসি পায়, প্রিয় অভিনেত্রীর নাম কী, এমনি সব হাস্যকর প্রশ্নের জবাব। একেক সপ্তাহে দিতে হয় একেকজনকে। একবার দেখলাম প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া স্বয়ং উত্তর দিয়েছেন। তাতে আমার সাহস বেড়ে গেল। প্রধানমন্ত্রীই যদি পারেন, আমার বাধা কোথায়। আমিও দিয়েছিলাম। অনেক প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল : যেসব উপদেশ সারাজীবন পেয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কোন্‌টি? আমি লিখেছিলাম ছেলেবেলায় শোনা আব্বার একটা উপদেশ। উপদেশটা হল : 'বোকা হোস'। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এখানে 'বোকা হোস' অর্থ এ নয় যে 'বেকুব হোস'। এর অর্থ : স্বার্থের ব্যাপারে বোকা হোস। স্বার্থ ভুলতে চেষ্টা করিস। ভোরের কাগজের বিভাগীয় সম্পাদক আমার এ উত্তরটা ছাপেননি। হয়তো ভেবেছিলেন স্বভাব-অভ্যাসে আমি তামাশা করে উত্তরটা দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ তা ছিল না। খুবই সিরিয়াসভাবে কথাটা আমি লিখেছিলাম।

বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে-শক্তিকে আমি সবচেয়ে বড় বলে অনুভব করেছি তা হল এই বোকা-হওয়ার শক্তি। যেসব কারণে তাঁর প্রতি আমার অনিঃশেষ শ্রদ্ধা তার একটা অন্তত ওই : তিনি বোকা ছিলেন।

আপনারা জানেন আমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্যোগে সারাদেশে ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা বইপড়ার কর্মসূচি চালিয়ে থাকি। আমরা কেবল বই পড়াই না। কে কটা ভালো বই কত ভালোভাবে পড়ল তার মূল্যায়নের পাশাপাশি তাদের মেধা মূল্যায়নেরও চেষ্টা করি। এই মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে তাদের নানারকম পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা আছে। তো, সেই মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে সব জায়গায় ছাত্রছাত্রীদের ধীশক্তি, মনন এবং বুদ্ধিমত্তাকে মূল্যায়ন করারই কেবল ব্যবস্থা আছে। মূল জোরটা মেধার ওপরেই। আমরা বহুদিন পর্যন্ত শুধু মেধাকে মূল্যায়ন করেই তাদের পুরস্কার দিয়েছি এবং মেধাকেই জীবনের মূলশক্তি হিশেবে চিহ্নিত করেছি। কার স্মৃতিশক্তি কত প্রখর, চিন্তাশক্তি কত ক্ষিপ্র, মৌলিকতা কত উজ্জ্বল—এইসবই ছিল ওইসব মূল্যায়নের ভিত্তি। কিন্তু একদিন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে মূল্যায়নের এই পদ্ধতি নিয়ে আমার মনে সন্দেহ জাগে। মনে হয়, কেবল মেধার মূল্যায়ন করে কি একজন মানুষের সম্পূর্ণ সত্তার মূল্যায়ন সম্ভব? মেধা তো মানুষের গোটা শক্তির একটা অংশ মাত্র। তার তো আরো অনেক শক্তি আছে যা মেধার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। যেমন শারীরিক শক্তি, পরিশ্রমক্ষমতা, মূল্যবোধ, দুঃসাহস, উদ্যম, হৃদয়ের শুভত্ব, পরার্থপরতা—এমনি আরো অনেক কিছু। কী করে এই সন্দেহটা জাগল সে-গল্পটা আপনাদের বলি।

ঘটনাটা ঘটেছিল এই ঘরটার মধ্যেই। একদিন একাদশ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে ক্লাস করছি। ক্লাসে একশো-সোয়াশোর মতো ছেলেমেয়ে। হঠাৎ পাশের ওই বস্তিতে আগুন লাগল। আমাদের দেওয়ালের একেবারে পাশেই বস্তি, কাজেই আগুনের ভয়ঙ্করতম তাণ্ডবের মধ্যে পড়ে গেলাম। একটা মহল্লা জুড়ে আগুন-লাগা ব্যাপারটা-যে কতটা ভীতিপ্রদ তা এত কাছে থেকে এর আগে দেখিনি। মুহূর্তের মধ্যে ডাকাতের মতো হিংস্র উন্মত্ত হাওয়া চারপাশ থেকে যে কী প্রচণ্ডভাবে ছুটে আসে, কী ভয়ঙ্করভাবে তার লেলিহান জিহ্বা সবদিক গ্রাস করার জন্য উন্মত্তের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকে, সেদিন প্রথম দেখার সুযোগ হল। আমি দুশ্চিন্তায় দিশাহারা হয়ে পড়লাম। ভয় হল আমাদের এত কষ্টে তৈরি লাইব্রেরিটা হয়তো পুড়ে যাবে। একশো-সোয়াশো ছেলেমেয়ে ক্লাসে; দেখলাম, তারা চোখের পলকে তিনটা দলে ভাগ হয়ে গেল। একদল লেজ তুলে ছুটল কেন্দ্রের গেটের দিকে, যত পেছনে তাকায় তত সামনে দৌড়ায়। আরেকটা দলকে দেখলাম, তারাও যাচ্ছে গেটের দিকেই, কিন্তু গেট পেরোচ্ছে না। গেটের কাছাকাছি একটা নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে সেনাপতির মতো বিশৃঙ্খল ছেলেমেয়েদের ক্রমাগত হুকুম দিচ্ছে : 'পানি আন্, বালু আন্'—শ্রীকান্তের সেই ছিনাথ বহুরূপীর গল্পের পিসেমশায়ের মতো : 'বন্দুক লাও,

শড়কি লাও।'—প্রশ্ন : 'লাও তো বটে কিন্তু আনে কে?' আমি ভীত-মরিয়া হয়ে আট-দশ জন ছেলেমেয়েকে ডেকে লাইব্রেরির দেয়ালগুলোতে বালতি বালতি পানি ঢালতে লাগলাম যাতে ভেজা-দেয়ালে আগুন সুবিধা করতে না পারে।

যাই হোক, ঘণ্টা-দুয়েক পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে এল। আমরা ক্লাসে ফিরে এলাম। ভেগে-পড়া সেই দুই পার্টি পরিস্থিতি নিরাপদ বুঝে বীরদর্পে আবার ক্লাসে এসে বসল, কিন্তু পড়াশোনায় আর মন বসল না। আগুনের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে এলোমেলো কথাবার্তা চলতে লাগল। যারা গেট পেরিয়ে সটকে পড়েছিল বা যারা গেটের এপাশ থেকেই কল্পিত আজ্ঞাবহদের উদ্দেশে বন্দুক-শড়কি আহরণ করার হুকুম দিচ্ছিল, তাদের গলার স্বরই তখন সবার ওপরে। শুনে মনে হয় আগুনটা যে নিভেছে তা তাদেরই কৃতিত্ব।

কিন্তু এই বাকসর্বস্বদের বাইরেও আরো একদল অপ্রত্যাশিত ছেলেকে দেখতে পেলাম সেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে। এই ক্লাসেরই ছাত্র তারা, কিন্তু এতই সাধারণ যে ক্লাসের প্রাত্যহিক পড়াশোনায় তাদের কোনোদিন দেখেছি বলেই মনে পড়ে না। রোজকার ক্লাসের সরগরম আলোচনায় অংশ নিয়ে লাঙ্গুল-আস্ফালনে এদের যেন প্রায় দেখিই-নি। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ওরা প্রায় সবাই কমবেশি আহত, কারো হাতে ফোস্কা, কারো গালে স্যাঁকা-লাগা কালো দাগ, কারো কনুইয়ের পাশ থেকে রক্ত ঝরছে, কারো জামা ছেঁড়া—এমনি সবার অবস্থা। ক্লাসের দৈনন্দিন পড়াশোনায় পেছনের বেঞ্চির অতি সাধারণ ছাত্র এরা, অনেকে এতই মেধাহীন যে প্রায় তিন-চার মাস নিয়মিত ক্লাস করার পরেও তাদের চেহারা আমার মনে কোনোরকম ছাপ ফেলেনি। তাদের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলাম : 'কোথায় গিয়েছিলে তোমরা? এসব হল কী করে?' তাদের অস্ফুট অসংলগ্ন কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল আমাদের বাকাবাগীশ বীর-পুঙ্গবেরা যখন গেট পেরিয়ে নিরাপদ জায়গার দিকে ছুটছিল তখন তারা করেছিল উল্টো ব্যাপার। আগুন নেভাবার জন্যে চলে গিয়েছিল বস্তির ভেতরে। এরকম আট/দশটা ছেলে দেখলাম এই দলে। তখন আমার সামনে বসে-থাকা ছাত্রদের মধ্যে আমি স্পষ্ট দুটো ভাগ দেখতে পেলাম। একদল—যারা পেছনে তাকিয়েছে আর সামনে দৌড়িয়েছে, নিজেদের নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করে পেছনের মানবিক বিপর্যয়ের সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্য উপভোগ করেছে, হুকুম-হাকাম দিয়েছে; আর একদল—যারা বোকার মতো সেই আগুন নেভাতে ছুটে গেছে।

না, কেউ তাদের যেতে বলেনি সেখানে। নিজেদের তাড়নাতেই তারা চলে গেছে। মানবতা বিপন্ন হচ্ছে অনুভব করে ভেতরের আকুতিতে বুক এগিয়ে দিয়েছে; নিজেদের ভালোমন্দ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেনি। হঠাৎ করে বুঝতে পারেনি কী করলে আগুন নেভানো যাবে, তবু এগিয়ে গিয়ে সাধ্যমতো দৌড়োদৌড়ি

করেছে, বিপদ দেখেও তার ভেতর ঢুকে গেছে, আহত হয়েছে, সাহায্য করেছে। কাজেই দুল দুটো : একদল যারা কাজ করেছিল নিজেদের বাঁচাতে, অন্যদল যারা ছুটে গিয়েছিল অন্যদের সাহায্য করতে। ছেলেগুলোর জন্য খুব মমতা হল আমার। মনে হল আমাদের কেন্দ্রের যে-মূল্যায়নব্যবস্থা তাতে মেধার দিক থেকে শাদামাঠা অথচ হৃদয়ের দিক থেকে শক্তিশালী এই ছেলেমেয়েদের পুরস্কৃত করার তো কোনো ব্যবস্থা নেই। নম্বর কি পাবে শুধু স্বার্থপর মেধা? লোভাতুর বুদ্ধিবৃত্তি? হৃদয় নয়? ভালোবাসা নয়? মানবিক অনুভূতি নয়?

আপনাদের সবার হয়তো মনে আছে যখন একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনের ডঙ্কা বেজে উঠেছিল তখন কীভাবে রাতারাতি একদল জ্বালাময়ী বক্তা ব্যাঙের ছাতার মতো জন্ম নিয়েছিল এই দেশের পথে-প্রান্তরে। স্বাধীনতার আগের অন্তত দুবছর তাঁদের অগ্নিময় ভাষণে সারাদেশ প্রকম্পিত ছিল। কিন্তু যখন যুদ্ধ আরম্ভ হল, পাকিস্তানি সৈন্যরা ক্ষুধার্ত পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশবাসীর ওপর, তাদের সেইসব বাগাড়ম্বর আর উদ্দীপনার ওপর যেন পানি ঢেলে দিল কেউ হঠাৎ। সবকিছু মুহূর্তে থেমে নীরব হয়ে গেল। আর সেই বাকসর্বস্ব যোদ্ধার দল দেশ ছেড়ে গিয়ে উঠল কলকাতায়, ভাষণ-সুযোগহীনভাবে মুক্তিযুদ্ধের বুকের ওপর বসে নিজেদের ভাগ্যান্বেষণ করতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়। স্বাভাবিকভাবেই একটা ভয়াবহ উৎকণ্ঠায় পড়ে গেল সারাদেশ। এই অবস্থাতে দেশকে বাঁচাবে কে? আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল কি চিরস্থায়ী হয়ে যাবে? যুদ্ধ করবে কারা? কোথায় জাতির পরিত্রাণকারী?

এই উদ্ধারহীন সময়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল সারাদেশে। একধরনের অপরিচিত অবোধ বেদনাকাতর যুবক জেগে উঠতে লাগল গ্রামবাংলার বুকের ভিতর থেকে। কেউ এদের এর আগে কোনোদিন দেখেনি। গ্রামবাংলার মতো তাদের হৃদয় নির্বোধ ও লাঞ্ছনা-ব্যথিত। আমি তখন গ্রামে। দেখতাম চারপাশের গ্রামগুলো থেকে এক-একদিন বিশজন-পঁচিশজন করে ছেলে চলে যাচ্ছে যুদ্ধে। এক-একদিন সকালে উঠেই দেখা যাচ্ছে গোটা একটা গ্রামের ছেলেপেলে প্রায় খালি।

এই অবোধ এবং মূঢ় যুবকেরা যুদ্ধ করে তাদের মূল্যহীন রক্তে জাতিকে উপহার দিয়েছিল স্বাধীনতা।

কিন্তু ১৬ ডিসেম্বরে ঘটল পুরো অন্য দৃশ্য। ওই জ্বালাময়ী বক্তারা, চোখের পলকে কীভাবে যেন ফিরে এল রাজধানীসহ সারাদেশের সবখানে। দখল করে নিল জাতির প্রাণকেন্দ্র ঢাকা মহানগরী। ১৬ ডিসেম্বর তাদের দেখা গিয়েছিল বলে দেশের হতাশাগ্রস্ত জনসাধারণ বিদ্রূপ করে তাদের নাম রেখেছিল 'সিক্সটিথ ডিভিশন'।

এদিকে যুদ্ধ শেষ না-হতেই যুদ্ধক্লান্ত ওই অবোধ যুবকেরা টের পেয়েছিল এই বিজয় তাদের জন্য নয়, এই মহানগরীতে তারা পুরো অবাঞ্ছিত, অতিরিক্ত। তারা

নিঃশব্দে মুছে গিয়েছিল বাংলার বুকের ওপর থেকে, যেভাবে একদিন তারা জেগে উঠেছিল, ঠিক সেভাবে। তাদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ এরাই তো ছিল সেদিনকার এই জাতির মূল শক্তি, অন্তর, উত্তাপ ও একমাত্র আশ্রয়। জাতির বিবেক, বেদনা, সংগ্রাম আর শক্তিমত্তাকে তো বহন করেছিল এরাই— নিজেদের রক্ত আর জীবনের বিনিময়ে। অথচ এর কোনো মূল্য নেই, স্বীকৃতি বা পুরস্কার নেই, অভিনন্দন বা আবাহন নেই—বরং আছে উল্টো আচরণ। যেন জাতির প্রতিপক্ষ এরা। এদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে গুঁড়িয়ে দিতে না-পারলে কারো স্বস্তি নেই, নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই।

সেদিন আমাদের আলোচনা-ক্লাসে আমার সামনে আগুনের-ঝাঁজ-লাগা, পুড়ে-ছড়ে-যাওয়া ছেলেগুলোকে দেখে আমার মনে নতুন ভাবনা এসে ভিড় করল। মনে হল কেন্দ্রে আমরা ছাত্রছাত্রীদের মেধা প্রতিভা অনেক কিছুরই মূল্যায়ন করি, কিন্তু তাদের ভেতর যে-আত্মোৎসর্গী হৃদয়টা রয়েছে, যে-পরোপকারী বেদনাতুর মানুষগুলো রয়েছে—একটা জাতির যা সবচেয়ে বড় সম্পদ—তাকে তো নম্বর দিই না। তো, ওই ঘটনার পরে আমি আমাদের মূল্যায়ন-পদ্ধতি পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিই। আমরা এখন শতকরা পঞ্চাশভাগ নম্বর দিই মেধার জন্য আর পঞ্চাশভাগ দিই নির্বোধ হওয়ার ক্ষমতার জন্য।

ওই-যে ছেলেগুলো আগুনের ভেতর চলে গিয়েছিল, কী শক্তি থাকায় ওরা তার মধ্যে চলে যেতে পেরেছিল? ওদের মধ্যে ছিল নির্বোধ হওয়ার ক্ষমতা, অন্যের দুঃখে নিজের স্বার্থকে ভালোমন্দকে ভুলতে পারার ক্ষমতা; প্রেমের ক্ষমতা, ভালোবাসার ক্ষমতা, অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট বলে অনুভব করে নিজের লাভালাভকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা। এ-ক্ষমতা-যে কেবল অসাধারণ মানুষের মধ্যেই থাকে তা নয়, বহু সাধারণ মানুষের মধ্যেও থাকে। আসলে মেধাবী মানুষ যা দিয়ে সত্যিকার অর্থে অসাধারণ হন তা তো এই ক্ষমতাই। এই ক্ষমতার একটা উদাহরণ দিই। গল্পটা সেকেলে, কিন্তু এখনো বাতিল নয়।

ঘুমের মধ্যে বায়েজিদ বোস্তামীর মা বায়েজিদ বোস্তামীকে বলেছিলেন এক গ্লাস পানি দিতে। বায়েজিদ বোস্তামী পানি নিয়ে এসেছেন। এসে দেখলেন মা ঘুমিয়ে গেছেন। আমরা যে-কেউ হলে এই অবস্থায় কী করতাম? হয়তো গ্লাসটা যত্ন করে কোথাও রেখে মাকে অনুসরণ করে অমনি গভীর ঘুমের ভেতর ঢলে পড়তাম। পরের দিন মা জাগার তিন ঘণ্টা পরে জেগে বলতাম : ও মা যে, তুমি যা তখন রাত্রে এমনভাবে ঘুমিয়ে গেলে যে আমি ভাবলাম সাত-আট ঘণ্টার মধ্যে আর হয়তো উঠবেই না। তাই একটু ঘুমিয়ে নিলাম আর কি।

কিন্তু বায়েজিদের ব্যাপারে কী হল? এমন কোনো অজুহাত তুললেন না তিনি। পানি নিয়ে এসে দেখেছেন, মা ঘুমিয়ে গেছেন। মা পানি চেয়েছেন, এখন ঘুমোচ্ছেন

তাঁর হাতে তা তুলে দিতে হবে, কিন্তু তিনি তো এখন ঘুমে। এখন পানি দিতে গেলে ঘুম থেকে তুলে তাঁকে কষ্ট দেওয়া হবে। এখন কী কর্তব্য? পানি হাতে বোকার মতো একঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন সারারাত, যেন মায়ের কল্যাণের শিয়রে প্রার্থনারত স্থির একরাশ হাসনাহেনা। মার ঘুম ভাঙতেই তাঁর হাতে তুলে দিলেন গ্লাসটা।

আমাদের মতো না করে কেন করলেন তিনি অমনটা? কারণ একটাই। তাঁর মায়ের জন্যে তাঁর ভালোবাসা ছিল আমাদের মায়ের জন্যে আমাদের ভালোবাসার চেয়ে অনেক বেশি। মায়ের সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দের জন্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। সেটা এতটাই জন্মান্ধ আর অবোধ আকুতিতে ভরা যে এমন একজন মেধাবী মানুষ হয়েও এমন অবোধ শিশুর মতো আচরণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়নি; যা কোনো সাদামাটা বুদ্ধির মানুষও হয়তো করত না।...

[আংশিক]

[বিদ্যাসাগরের ওপর আলোচনাসভায় বক্তৃতা : ১৯৯৭]

চাই স্বপ্নে-ভরা আনন্দময় শৈশব

প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা,

তুষার ওর বক্তৃতায় আমার এমন প্রশংসা করেছে যে আমার কান এখনো লাল হয়ে রয়েছে। আমার ছোটবেলায় এক স্যার ছিলেন, উনি একসময় প্রায় আমার কানের প্রেমেই পড়ে গিয়েছিলেন। পড়া না-পারলেও কান মলতেন, পারলেও মলতেন। মলতে মলতে পরম তৃপ্তির সঙ্গে গর গর করে বলতেন : বাহ্ বেশ বড়রে তোর কানদুটো, বেশ নরম তো রে!

তো, বুঝতেই পারছ তাঁর সেই আদর-আপ্যায়নে আমার কান কেমন লাল হয়ে উঠত। আজ আবার তা হল আমার ছাত্র আবদুন নূর তুষারের আপ্যায়নে।

তোমাদের সঙ্গে আমার বছরখানেকের সুন্দর সময় কেটেছে। সেটা আমার জন্য তো বটেই তোমাদের জন্যও হয়তো একধরনের সুন্দর স্মৃতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তোমাদের পরের ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের আমি খুব-একটা সময় দিতে পারিনি। এজন্য অপরাধবোধে ভুগি। বাইশ বছর ধরে এই বইপড়া কর্মসূচি চালাতে চালাতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তবে মন আবার চাঙা হলে আবার সময় দেবার ইচ্ছা আছে। ওদের দোষ নেই, দোষ আমার। রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষও বলেছিলেন, 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু'। অনেকদিনের একটানা কাজে মানুষ কখনো কখনো ক্লান্ত হয়ে যায়, এক-আধটু পিছিয়েও পড়ে। আমারও হয়েছিল তাই।

দেখ, বইপড়া ব্যাপারটা অত সোজা না। পৃথিবীর শতকরা ছয়-সাত ভাগের বেশি মানুষ বই পড়তে পারে না। না, আমি বাধ্য হয়ে পড়া পাঠ্যবইয়ের কথা বলছি না, শস্তা বিনোদনসর্বস্ব বইয়ের কথাও না, 'বই' বলতে বোঝাচ্ছি সেই বই যা মানুষকে ভাবায়, তাকে তার চেয়ে বড় করে তোলে। বইপড়া ব্যাপারটা কঠিন

বলে না-পড়ার মওকা পেলেই মানুষ পড়া থামিয়ে দেয়। তোমরাও অনেকেই হয়তো এরই মধ্যে তা করেছ। চাপে না পড়লে কে-ই বা পড়তে চায় বলো? যে পড়তে পারে সে তো জিনিয়াস। সেরা পাঠক তো সেই যে নিজের স্বেচ্ছা-আনন্দে পড়ে। পড়ার ভেতর দিয়ে নিজের বিকাশ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়।

সেদিন একটি মেয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মেয়েটি মানুষের জন্য অনেক কাজ করে। সে বলছিল কেউ তাকে এসব করতে বলে না, করলে সমালোচনা করে; তবু সে করে। আমি জিগ্যেস করলাম, কেন সে করে। সে উত্তর দিল, না করে পারি না, তাই।

ভেতরের আনন্দ থেকে এভাবে কাজ করার মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। অন্যের জন্য সত্যিকার বেদনা না থাকলে মানুষ এ পারে না। সাধারণত মানুষ কাজ করে 'আদিষ্ট হইয়া', নানান ঘটনা বা পরিস্থিতির চাপে। এসব বই পড়ার জন্য যদি পুরস্কারের ব্যবস্থা না থাকত, পড়লে জাগতিক লাভ না হত, তাহলে কজন পড়তে আসতে শেষপর্যন্ত? তবে আনন্দের বিষয় : মানুষ প্রথমে পুরস্কারের জন্যে এলেও পড়ার আনন্দে একসময় পুরস্কারের কথা ভুলে যায়। এটাই তার শ্রেষ্ঠত্ব। তবে তা-ও সবাই পারে না, খুব অল্প মানুষই পারে। তারা পড়তে আসে নির্জলা ভালোবাসার টানে, আনন্দের জন্য, বিকাশের স্বার্থে। এরা উচ্চতর মানুষ। এরাই পৃথিবীকে পরিবর্তন করে। সভ্যতাকে নতুন পথের খবর দেয়।

আবারো বলি, বই কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। এ বড় কঠিন জিনিশ। চিন্তাশক্তিহীন মানুষ বই পড়তে পারে না। তাকিয়ে দেখ যে জাতি যত বই পড়ে সে জাতি তত ওপরে। বাংলাদেশ আজো নিচে পড়ে রয়েছে তাদের মতো বই পড়ছে না বলে। বই মনের হাজারো জানালা খুলে দিয়ে মানুষকে বড় করে তোলে। এসব জানালা আজো আমাদের বন্ধ হয়ে আছে। তাই সম্পন্ন-জীবনকে আমরা আজো স্পর্শ করতে পারছি না। তাই বইয়ের কাছে আমাদের যাওয়া দরকার। বই মানে কেবল তথ্য বা তত্ত্ব নয়; বই মানে স্বপ্ন, জীবনবোধ, প্রজ্ঞা; বই মানে স্ফুরণ, উন্মোচন, বৃদ্ধি, ফুটে ওঠা।

কেন বাইবেল বই এর মাধ্যমে প্রেরিত হল? সৃষ্টিকর্তা তো সর্বশক্তিমান। তিনি তো চাইলে টেলিভিশন বা সিনেমার মাধ্যমেও তা পাঠাতে পারতেন। কেন তা করলেন না। কারণ বই ছাড়া আর কিছুই মানুষের গভীর মননজগৎকে পুরোপুরি ধারণ করতে পারে না। কেন মহানবী বললেন, দরকারে জ্ঞানার্জনের জন্য চীনদেশে যাও। চীনদেশে তো তখন ইসলামধর্ম পড়ানো হত না। তা হলে কেন চীনে যেতে হবে। যেতে হবে এজন্যে যে চীনে যাও মানে দূরে যাও, জানার জগৎকে আকাশ ভেঙে লুঠ করে আনো, নিজেকে প্রসারিত করো, মনের জানালা খোলো, বিশাল পৃথিবীটার একেবারে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াও।

এজন্যেই অনেকদিন ধরে আমরা বই পড়ানোর চেষ্টা করছি। হয়তো এখন একটু বেশিরকম চেষ্টাই করছি। আমার জীবন তো শেষ হয়ে আসছে। আর সময় নেই। এখন না করলে আর কবে করব? সভ্যতার অলিম্পিকে তো রিলে-রেসের মতো, একদল যাত্রা শেষ করে অন্য দলের হাতে মশাল পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেয়। শেষ হওয়ার আগে তাই একটু জোরেশোরে দৌড়োচ্ছি যাতে পরের জন্যে আরো একটু আগে মশালটা তুলে দিতে পারি। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নিই : বই-ই কী আর বই প্রেমই কী—এ জিনিশ সবার মধ্যে থাকে না, কারো কারো মধ্যে থাকে। তোমাদের মধ্যেও তাই। তোমাদের কেউ কেউ হয়তো মুখে বলবে পুরস্কার-টুরস্কার কিছু না, বই পড়াই আসল, কিন্তু মনে-মনে আবার পুরস্কারগুলোর দিকে আড়ে আড়ে তাকাবে। এক চোখ বলবে : পুরস্কারের কথা ভুলে গেছি, অন্য চোখ বলবে : কই কই। তবে তোমাদের মধ্যে যে অনেক বইপ্রেমিক আছে তাতে সন্দেহ নেই। (মেয়েদের দিকে ইঙ্গিত করে) আবার কিছু প্রেমিকাও আছে! (সবার হাসি)। তা না হলে তোমরা এখানে আসবে কেন? চারপাশে এতসব মজার জিনিশ থাকতে কেন এখানে আসতে গেলে? ঢাকাশহরে তোমাদের ক্লাসে আরো তো পঞ্চাশ হাজার ছাত্রছাত্রী আছে, কই তারা তো আসেনি। কেন তোমরা এই কয়েকশো মাত্র!

মানুষ বই পড়তে চায় না, এ আমি বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি, জন্মগতভাবেই অন্তত চার থেকে ছয় ভাগ লোক চিন্তাশীল স্বভাব নিয়ে জন্মায়। সারাক্ষণই তারা সিরিয়াস আর গভীর ব্যাপার খুঁজে বেড়ায়। এমনকি শিশু হলেও সে তা করে। টিভিতে হালকা নাচ-গান অনুষ্ঠান হয়তো সেও দেখে, কিন্তু তিনমাস দেখার পরেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার জন্মগত সিরিয়াস মন এসবের পাশাপাশি ওর ভেতর বড়কিছু, গভীর কিছু খুঁজতে থাকে। ওখানে না-পেলে অন্য কোথাও খোঁজে। এই সিরিয়াস মানুষদেরই নাম পাঠক। আমরা চেষ্টা করছি এই চিন্তাশীল গভীর মানুষদের গড়ে তোলার জন্যে। বাকি চুরানব্বই বা ছিয়ানব্বই ভাগ মানুষ এতে না এলেও খুব বড় কোনো ক্ষতি নেই। গোটা পৃথিবী তাকিয়ে আছে ওই ছোট্ট চার-ছ'ভাগ লোকের দিকে। তাদের নেতৃত্ব আর দিকনির্দেশনার দিকে। তারা কী করছে না করছে তার ওপরে নির্ভর করছে ভবিষ্যতের পৃথিবী। পৃথিবীকে পথ দেখাচ্ছে বা স্বপ্ন দেখাচ্ছে তো এরাই। কাজেই ওই চার বা ছয় ভাগ লোকের কাছে যদি আমরা পৌঁছতে পারলাম তো গোটা মানবজাতির কাছেই পৌঁছলাম। সেজন্যে আমরা টার্গেট করেছি আগামী পনেরোবছরে আঠারো লাখ পাঠকের কাছে পৌঁছতে—অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের সুশিক্ষিত মানুষদের শতকরা ছ'জন মানুষকে এর আওতায় আনতে।

আবারো বলি, টিকটিকির মতো বাঁচার কোনো মানে নাই। বেঁচে থাক তোমার

মতো। বিজেতার মতো। কেবল তুচ্ছ রুটি আর মাখনের জন্য কি জীবন? বাইবেলে আছে Man doesn't live by bread alone। শুধু দুবেলা দুটো খেতে পারলেই মানুষের চলে না। জীবজন্তুদের চলে। মানুষ অনেক বড় জিনিস। মানুষের মস্তিষ্কের রয়েছে বিস্ময়কর ক্ষমতা। এই বিশ্ব মহাবিশ্বের সে সমান। সেই অফুরন্ত ধারণক্ষমতা নিয়ে মানুষ কত বড় আর আনন্দময় জীবনই না যাপন করতে পারে পৃথিবীতে। সেই বড় আর সুন্দর জীবনকে আমাদের পেতে হবে। তবেই না আসল জীবন হল! শুধু ইঁদুরের মতো, তেলাপোকার মতো বেঁচে থেকে কী হবে? শুধু একবারের এই জীবন, আর এ তো আসবে না। এই জীবনে তোমরা ভালোভাবে বাঁচ, একে সম্পূর্ণ কর। একটাই জীবন, একে পরিপূর্ণতম সুপ্রচুরতমভাবে ব্যবহার কর। জীবনকে সোনালি সম্ভারে ভরে দাও। জীবনের ওপর জয়ের পতাকা উড়িয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নাও।

আমরা পুরস্কারের কথা বলে তোমাদের এখানে এনেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পুরস্কার তোমরা পাবে। কিন্তু সত্যি করে বলো তো পুরস্কারের যোগ্য কে তা কী করে বুঝব? পরীক্ষাপদ্ধতি দিয়ে তো একে ধরা যায় না। মানুষের প্রতিভা তো একটা আলোর মতো। পরীক্ষাহলের উত্তর থেকে তা কি বোঝা যাবে? আজ যাদের আমরা পুরস্কার দিলাম না, দেখা গেল তাদের মধ্যে একদিন অনেকে দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিশেবে দেখা দিল। তখন কী হাস্যকরই না হয়ে যাবে এসব পুরস্কার। আমরা কেবল এটুকু বলতে পারব, যারা আজ পুরস্কার পাচ্ছে, পরীক্ষাহলের তিন ঘন্টার জন্য এরা ছিল ভালো। জীবনের কুরুক্ষেত্র অনেক বড় জিনিশ। সেখানে কে জয়ী কে পরাজিত আমাদের ছোট্ট মূল্যায়ন পদ্ধতির তা অনেক ওপরে। আজকের এই পুরস্কারকে তাই বড় করে দেখো না। ধরে নাও এ একটা খেলা। আসল পুরস্কার পেতে হবে জীবনযুদ্ধে। জীবনের মাঠেই নির্ধারিত হবে তোমরা কে কোথায়।

বছর-দশেক আগে পর্যন্তও বহু ছেলেমেয়ে আসত এই কর্মসূচিতে, এখন সংখ্যা কমতির দিকে। প্রাইভেট পড়া আর কোচিং ক্লাসের জন্য দিনরাত দৌড়ে বেড়ানো, প্রশ্ন মুখস্থ, পরীক্ষার প্রস্তুতি—এতসবের জাঁতাকল থেকে তারা কিছুতেই আর বেরোতে পারছে না। বাপ-মা সপ্তাহে মাত্র দুটো ঘন্টার জন্যও তাদের এখানে আসতে দিতে নারাজ। পারলে দিনে পঁচিশ ঘন্টা করেই এদের দিয়ে পাঠ্যবই মুখস্থ করাত তারা। ইংল্যান্ডে ১৮১৮ সালে একটা আইন হয়েছিল। আইনটা হচ্ছে : দিনে বিশ ঘন্টার বেশি শ্রমিকদের কাজ করানো যাবে না। মানেটা কী? মানে আগে নিশ্চয়ই বিশ ঘন্টারও বেশি তাদের খাটানো হত। হয়তো বাইশ-তেইশ ঘন্টাই। ঘুমাতেও হয়তো দিত না। আমাদের অভিভাবকদের ভাবসাব অনেকটা এমনি। শিশুর নিষ্পাপ জীবন নিংড়ে এরা

কেবলি বার্ধক্যের লোল বৈষয়িকতা বের করতে চাচ্ছে।

একটা মজার গল্প হঠাৎ মনে পড়ছে। এক গ্রাম্য ডাক্তার একজনের ফোড়া কেটেছে। অপারেশনের পর লোকটা ডাক্তারকে জিগ্যেস করল : ডাক্তার সাহেব, এখন বিছানায় শুয়ে থাকতে পারব তো? ডাক্তার আঁতকে উঠলেন : এতবড় ফোড়া অপারেশন, আর এখনই তুমি শুতে চাও, তোমার আস্পর্ধা তো কম না! শুতে পারো, কিন্তু শুলেই ফটাস করে ফোড়া ফেটে যাবে। লোকটা তখন বলল : তাহলে কি বসতে পারব ডাক্তার সাহেব?' ডাক্তার অবাকচোখে বললেন : শুতেই যেখানে পারছ না, সেখানে বসতে চাও কোন্ সাহসে? করুণভাবে সে তখন বলল : তাহলে কি দাঁড়িয়ে থাকব? ডাক্তার বললেন, দাঁড়াতে পারো তবে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। উপায়হীন হয়ে সে জিগ্যেস করল, তাহলে কী করব ডাক্তার সাহেব? ডাক্তার কঠোরস্বরে বললেন : কী-ও করতে পারবে না।

আমাদের শিশুদের অবস্থা আজ ঐ বেচারি রুগীটার মতো। কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিচার আর পাঠ্যবই মুখস্থ করা ছাড়া আর কোনোকিছুই তারা করতে পারবে না। কী-ও না! তাহলে সে মানুষ হবে কী করে? সুন্দর জীবন কী করে তৈরি হবে তাদের? শৈশব মানে তো কেবল পড়াশোনা নয়। শৈশব মানে তো বন্ধুত্ব, আড্ডা, খেলাধুলা, স্বপ্ন, প্রজাপতির পেছনে ছুটে বেড়ানো, নীল আকাশ, খোলা মাঠ—কোথায় আজ এসব তাদের জীবনে?

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আমরা সবকিছুই করি কিছুটা ঢিলেঢালা চালে। ছকবাঁধা রুটিনের জাঁতাকলের নিচে আমরা তোমাদের সুন্দর তারুণ্যকে পিষে নষ্ট করি না। আমরা তোমাদের সময় দিই—বন্ধুত্বের, মেলামেশার, স্বপ্ন, অবকাশ আর আনন্দের সময়। আলসেমির আর অবকাশের সময়টাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে সৃজনশীল সময়। দেখবে যে-মানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে লেজ তুলে দৌড়োচ্ছে তাঁর মাথায় নতুন আইডিয়া আসে না। যে খুব বেশি কাজ করে, তার মাথা নিরেট হয়ে যায়। কিন্তু দাঁত মাজতে মাজতে আমাদের মাথায় অনেক সময় নতুন আইডিয়া এসে পড়ে। কেন আসে? কারণ অবসর আর আলসেমির ভেতর আমাদের মন তখন স্বপ্ন, কল্পনা আর আনন্দের উপযোগী হয়ে যায়। এজন্য বাথরুমে গোসল করতে গেলে গায়ক হয়ে ওঠে না এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই।

পৃথিবীর বহু বড়বড় চিন্তার জন্ম হয়েছে আড্ডার অলস আর খোলামেলা পরিবেশ থেকে। আজকে পৃথিবী-জোড়া বাণিজ্যিক সংস্কৃতিতে আড্ডার অবকাশ নেই। নিশ্চিন্ত মনে নিশ্বাস নেবার সময় নেই। খালি কাজ, খালি কাজ। বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ দিনরাত শুধু গুটিকয় মালিকের মুনাফা বাড়ানোর জন্য নিজেদের দুর্লভ জীবন উৎসর্গ করে চলেছে। এ ব্যাপারে একটা গল্প মনে পড়ে। গল্পটা ইবনে বতুতার জীবনের।

আটশ বছর আগে ইবনে বতুতা ভ্রমণ করেছিলেন এশিয়া আফ্রিকা ইয়োরোপের ৭৫ হাজার মাইল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণের সময় তিনি গিয়েছিলেন একটি দেশে, খুব সম্ভব মালয়েশিয়ায়। সেখানকার সুলতান তখন মুসলমান। সুলতানের সঙ্গে দেখা হলে সুলতান তাঁকে বললেন : কাল বিকেলে সময় পেলে আসবেন, একটা মজার ব্যাপার দেখাব। সময়মতো উনি সেখানে যেতেই দেখেন জায়গাটা লোকে লোকারণ্য। সুলতান সম্মান করে তাঁকে পাশে বসালেন। বসতেই তিনি দেখলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। সুলতানের সামনে তৈরি করা একটা মঞ্চের ওপর একজন বলিষ্ঠ গোছের লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা ঝকঝকে তলোয়ার। তলোয়ারটার দুপ্রান্ত দুহাতে ধরে সে তার ধারালো দিকটাকে ঘাড়ের ওপর চেপে ধরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। একসময় জনতাকে নীরব হতে নির্দেশ দেওয়া হলে গোটা এলাকায় পিনপতন নীরবতার সৃষ্টি হল। সেই নীরবতার ভেতর থেকে লোকটা উঁচু গলায় সুলতানকে বলল, "সুলতান, আমার পিতামহ আপনার পিতামহকে এমন ভালোবাসতেন যে আমার পিতামহ আপনার পিতামহের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। আমার পিতা আপনার পিতাকে এমন ভালোবাসতেন যে, আমার পিতা আপনার পিতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। আর দেখুন, এই আমি আপনাকে এমন ভালোবাসি যে, এই মুহূর্তে আমি আপনার জন্য নিজের প্রিয় প্রাণ আমি উৎসর্গ করে দিচ্ছি।" বলেই দুহাতে ধরা ঘাড়ের ওপরকার তলোয়ারটা ধরে এমন জোরে সে টান দিল যে তার মাথাটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সামনে ছিটকে পড়ে গেল। বলা বাহুল্য তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার সন্তানদের সম্মান অর্থ পদমর্যাদা বহুগুণ বেড়ে গেল এবং তার সন্তান আবার তৈরি হতে লাগল বর্তমান সুলতানের সন্তানের ভালোবাসায় জীবন আত্মাহুতি দেবার জন্য।

আজ সারা পৃথিবীর মানুষের অবস্থা ঐ মাথা কাটা মানুষটার মতো। মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতির মুনাফা বাড়ানোর জন্য দিনরাত এভাবেই তারা তাদের মাথা উৎসর্গ করছে। কিন্তু মানুষের তো কিছু আলসেমির সময়, কিছু অকাজের সময় থাকা উচিত—কিছু আনন্দ আর স্বপ্নচারিতার সময়। উনিশ শতকের এক কবি লিখেছিলেন, What's life if full of care,/ we have no time to stand and stare। একী জীবন হল আজ আমাদের। সারাক্ষণ কেবল কাজ আর ব্যস্ততা। শান্তিমতো দুদণ্ড দাঁড়িয়ে এমন সুন্দর পৃথিবীটাকে দেখার উপভোগ করার আনন্দ করার সময়ই আমরা পাচ্ছি না। আজকের এই পৃথিবীতে সময় বলে কারো কিছু নাই। আমাদের ছোটবেলায় বুড়োরা রিটায়ার করলে অন্তত কিছু সময় পেত—নাতি কোলে রাস্তায় হাঁটাহাঁটির বা তসবি হাতে আল্লাহ-বিল্লাহ করার। এখন কারো সময় নেই—না বৃদ্ধের, না যুবকের, না শিশুর।

আমাদের দেশে শিশুরাই আজ দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত। স্কুল, কোচিং, প্রাইভেট শিক্ষক আর মুখস্থের নির্দয় জাঁতাকলের নিচে শৈশবের আনন্দ পুরোপুরি গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তাদের। আজ মনে করি মানুষের গোটা জীবন আসলে তার শৈশবের সমান। এই সময় সে যে-মানুষটি হয়ে বড় হয়, মৃত্যু পর্যন্ত সে সে-মানুষটিই থেকে যায়। সেই শৈশব থেকে আমরা আমাদের শিশুদের পুরোপুরি বঞ্চিত করে ফেলছি। তাই তারা এমন নিষ্প্রাণ, ফ্যাকাশে আর নিঃসঙ্গ হয়ে বড় হচ্ছে। একটা দুঃখী রোবট ছাড়া তারা যেন কিছু নয়। এমন সুন্দর একটা জীবনকে দুদণ্ডের স্বপ্নে অবকাশে ভরে দেওয়া এমন কঠিন কিছু নয়। এতে জীবনটা মৌচাকের মতো সোনালি মধুতে ভরে উঠতে পারে। দিনে ঘণ্টাদুই নিজের আনন্দের জন্য রাখতে পারলেও জীবনটাকে সোনা দিয়ে মুড়ে ফেলা যায়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র দুটি ঘণ্টা। এই একমুষ্টি অবসর কি জীবনকে আমরা দিই?

ডেল কার্নেগি একটা বইয়ে চমৎকার একটা কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন : আমরা আজকের আমেরিকানরা সবাই সেলসম্যান, বিক্রেতা। এই কনজিউমারইজমের যুগে আমরা সবাই কিছু-না- কিছু উৎপাদন করি আর বিক্রি করি। আমি কারো কাছে স্নো বেচি তো সে আমার কাছে কলম বেচে, আমি টেলিভিশন বিক্রি করি তো সে গাড়ি বিক্রি করে। আমাদের এই আমেরিকা আজ বিক্রেতাদের দেশ। সারাদিন আমরা অন্যদের কাছে কিছু-না-কিছু বিক্রি করি বলে তাদের দেখলেই আমাদের মিষ্টি করে হাসতে হয়। না হাসলে জিনিশগুলো বিক্রি হয় না। তাই আরও বেশি বেশি হাসি। অথচ আশ্চর্য যে আমরা সারাদিন অন্যদের জন্য এত হাসি উপহার দিই—সন্ধ্যায় সেই আমরা যদি স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে শুধু আধঘণ্টা সময় একটু হেসে কাটাতাম তাহলে আমাদের দেশে বিবাহবিচ্ছেদ অর্ধেক হয়ে যেত, গোটা জাতির জীবনই সুখে-আনন্দে ভরে উঠত। কিন্তু দয়া করেও এটুকু আমরা করি না।

অন্যদের মতো নিজের দিকেও কিছুটা তাকাতে হয়, নিজের জন্যও কিছুটা সময় চাই। কেবল এটুকুর অভাবে আমাদের জীবনটাই যে বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। এমন মৌচাকের মতো জীবন পেয়েও বোলতার চাকের মতো রসহীন বিস্বাদ হয়ে আমরা বিদায় নিই। তোমরা সবাই নিজেদের জীবনকে এই ছোট্ট অবকাশ আর আনন্দের সময়টুকু অন্তত দিও।

[একাদশ শ্রেণীর বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের বক্তৃতা : ২০০৫]

চাই মহৎ পাগল

প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা,

এতদিনে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছ কেবল বই পড়াবার আর পুরস্কার দেবার জন্যে আমরা তোমাদের এখানে ডাকিনি। তোমাদের আমরা ডেকে এনেছি তোমাদের শৈশবকে সুন্দর করার জন্য যাতে তোমাদের গোটা জীবনটা সুন্দর হয়ে ওঠে। সেজন্যে কেবল বই আমরা পড়াইনি। যা-কিছুর সংস্পর্শে এলে জীবন সত্যি সুন্দর হয় সেসবকিছুর সংস্পর্শে তোমাদের আনার চেষ্টা করেছি। ফ্রান্সের রূপকথায় একটা অসাধারণ গল্প আছে, নাম 'বিউটি অ্যান্ড দ্যা বিস্ট'। গল্পটার মূল বক্তব্য হল : যদি কাউকে ভালোবেসে তার কষ্টে আমাদের চোখ থেকে দুফোঁটা পানি ঝরে তবে অমানবিকতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে সে সুদর্শন রাজপুত্রের চেহারা নিয়ে জেগে ওঠে। আমরা ভালোবেসে একটা বছর ধরে তোমাদের মনকে আলোকস্নাত করার চেষ্টা করেছি। হয়তো সেই চেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি।

আজ এই ঘরে তোমরা যেভাবে জড়ো হয়েছ, ঠিক সেভাবেই তোমাদের আগে আরো বিশটি ব্যাচ নিজ নিজ বছরের কর্মসূচি শেষে জড়ো হয়েছিল। তোমাদের মতো তারাও এভাবেই পুরস্কার নিয়ে ফিরে গেছে। এবার তোমরা এসেছ। আগামীতেও হয়তো অন্যেরা আসবে। একটা নিষ্ঠুর কাজ আজ আমাদের করতে হবে—তোমাদের পুরস্কার দিতে হবে। সত্যি সত্যি এটা দিতে আমরা চাই না। মূল্যায়ন পরীক্ষা দিয়ে কি প্রতিভার বিচার করা যায়? হয়তো ভুল বিচারের শিকার হয়ে অনেকেই আজ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে। অনেকের হৃদয় ভেঙে যাবে। কিন্তু না-দিলেও তো আবার নয়, তোমাদের অনেকেই হয়তো পুরস্কারের জন্যই প্রতিযোগিতায় এসেছ। না দিলে তারা দুঃখ পাবে। তবু না বলে পারছি না যে পুরস্কারের কিছু ভালো দিক থাকলেও ছোট্ট একটা খারাপ দিক

আছে। আমার এক ধনীবন্ধু ছিলেন, নাম বাদল ঘোষ। ঘটনাটা ১৯৮৮-৮৯ সালের। তখন কেন্দ্রের খুব আর্থিক দুর্দিন। বাদল ঘোষকে একদিন ফোনে বললাম, আমাদের কিছু টাকা দরকার, দিন না আমাদের জনাকয় মালদার আর দিলদার লোক জোগাড় করে। শুনে ফোনের ওধার থেকে তিনি অট্টহাসি করে উঠলেন। বললেন, এমন লোক কোথায় পাব ভাইরে! এই দুনিয়ায় যার মাল থাকে তার যে দিল 'থাকে না'; আর যার দিল থাকে তার যে মাল 'হয় না'। তোমরা ভুলো না যে পুরস্কার শেষপর্যন্ত একটা বৈষয়িক ব্যাপার। মাল। এটা বাড়লে দিল কমে যায়। কাজেই যত পারো পড়, গান গাও, ছবি আঁক, রসগোল্লা খাও, ফিল্ম দেখ, আনন্দে ফুর্তিতে থৈ থৈ করে ফেল জীবনকে, কিন্তু পুরস্কার চেয়ো না। জিনিশটা ভালো না। এতে হৃদয় শুদ্ধতা হারিয়ে ফেলে। ফুল চাওয়ায় আত্মার পবিত্রতা নষ্ট হয়।

এতদিনে তোমরা নিশ্চয়ই টের পেয়েছ আমাদের জীবন দুটো। একটা মালের একটা দিলের। একটা আসমানদারির, একটা দুনিয়াদারির। জীবনে এই দুটোকে মেলাতে হয়। তবেই তা হয় উচ্চতর জীবন। এর কোনো একটা দিক খুব বেশি হলে জীবন একপাশে হেলে পড়ে। অবশ্যি একথা বলার সাথে সাথে একথাও বলব, যা করবে পুরো জীবন দিয়ে করবে। আমাদের সঙ্গে এক ভদ্রলোক পরিবেশ আন্দোলন করেন—নাম যশোধন প্রামাণিক। তিনি পাখিদের ভালোবাসেন। পাখিদের কেউ যাতে না মারতে পারে, তাদের কষ্ট না দেয় তার জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা আর সংগ্রামের শেষ নেই। দেশের মানুষকে উদ্দেশ করে তাই তিনি লিখেছেন :

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি
মানুষের চাহিদা বিশাল,
পাখির চাহিদা শুধু
ছোট্ট একটি ডাল।

পাখিদের ছোট্ট এই ডালটুকুকে নিরাপদ করতে তার যে কী অসীম চেষ্টা! গণ্ডগ্রামের মানুষ তিনি। লেখাপড়াও তেমন নেই। কিন্তু ঘর-সংসার ফেলে সচিব- মন্ত্রী থেকে দেশের প্রতিটি বিবেকবান মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তিনি আবেদন করে বেড়াচ্ছেন যাতে দেশের পাখিদের বাঁচতে দেওয়া হয়। তিনি সামান্য মানুষ, কে তার কথায় কান দেবে। তবু সচিবালয় থেকে শুরু করে সরকারের দফতরে দফতরে ঘুরে অপরিসীম শ্রমে তিনি সরকারকে দিয়ে এয়ারগান নিষিদ্ধ করিয়েছেন। তিনি দেখেছিলেন বন্দুকের গুলির দাম বেড়ে যাওয়ায় বন্দুক দিয়ে কেউ এখন আর পাখিশিকার করছে না, করছে এয়ারগান দিয়ে। তাই ওটা নিষিদ্ধ করতে হবে। পাখিদের নিশ্চিন্ত জীবন দেবার জন্য স্কাউটদের সংগঠিত করে পাখিরক্ষার জন্যে সারাদেশে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। আনসার-ভিডিপির সাহায্য নিয়ে রাস্তাঘাটে

পাখিবিক্রিও কমিয়ে এনেছেন। এখন তিনি তাবৎ প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য আন্দোলন করছেন। পুরোনো ঢাকায় ঘুরে ঘুরে মুমূর্ষু বানরদের সকাল-বিকেল খাবার দিচ্ছেন। কেন করছেন তিনি এসব? প্রাণীদের ভালোবাসেন বলে, তাদের জন্য বেদনা অনুভব করেন বলে। কে জাতীয় নায়ক আজ দেশে? কালো টাকার মালিক, দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী আর রাজনীতিবিদরা, পরীক্ষায় ভালো করা মোটা বেতনের চাকরি করা বড় সাহেবেরা, নাকি এই যশোধন প্রামাণিক? আমি যশোধন প্রামাণিকদেরই আজকের বাংলাদেশের নায়ক মনে করি। বাকিরা দেশকে ধ্বংস করবে, খুব জোর টিকিয়ে রাখবে, যশোধনেরা এগিয়ে দেবে।

যশোধন কি বৈষয়িক মানুষ? পৃথিবীতে যাদের আমরা স্মরণ করি তারা কি বৈষয়িক? না, তারা বৈষয়িক নন। কারণ তারা নেন না, দেন। যে দেবে সে বৈষয়িক হবে কী করে? তাই দুনিয়াদারি ভালো, কিন্তু আসমানদারি—প্রেম, ভালোবাসা, স্বার্থহীনতা, অবৈষয়িকতা অন্যকে দেওয়া আরো ভালো। কী চান এই যশোধন? এই পৃথিবীর কাছে আর-একটু ভালো পৃথিবীকে তিনি শুধু চান। আরও একটু বাসযোগ্য, আরও একটু সুন্দর পৃথিবী। শ্রম দিয়ে কষ্ট দিয়ে সে জগৎ তৈরি করতে তিনি চেষ্টা করেন। তাই লোকে তাকে পাগল বলে। কিন্তু ভেবে দেখ, পাগল বলেই না তার এত শক্তি। এরা না হলে পৃথিবীকে এগিয়ে নিত কারা? সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হলে সে কি এতসব করতে পারত? সে তো দিনরাত টাকার পেছনে ছুটত!

একটা গল্প বলে কথা শেষ করি। আমার বয়স তখন বিশ-পঁচিশ। একদিন বাসায় ফিরতেই আব্বা বললেন, তোর কাছে একজন লোক এসেছিল। তোদেরই বয়সের। সে বলল, সুদূর বগুড়া থেকে সে শুধু তোর সঙ্গে দেখা করার জন্যই ঢাকায় এসেছে।

বগুড়া তখন সত্যি সত্যি ছিল অনেক দূরে। ঢাকা থেকে যেতে প্রায় ১২ ঘণ্টা লাগত। এখন তোমরা যে মসৃণ রাস্তা দিয়ে গাড়িতে চেপে চলে যাও, তখন রাস্তা সেরকম ছিল না। রাস্তার ওপরে গাড়ির চাকা বরাবর দুসারি ইঁট বসানো, মাঝখানে ঘাস। তার ওপর দিয়ে গাড়ি চলছে। একটু এদিক- ওদিক হলেই গাড়ি রাস্তা থেকে বেরিয়ে যেত। সেই রাস্তা দিয়ে বাসে চেপে সে সুদূর বগুড়া থেকে এসেছে।

আব্বার কাছে ঘটনা শুনেই আমি টের পেলাম কে এসেছিল। ষাটের দশকে আমরা তরুণদের যে সাহিত্য-আন্দোলন করছিলাম সে তার একজন উদ্দীপ্ত সমর্থক। চিঠি লিখে প্রায়ই এই আন্দোলনের ব্যাপারে তার শিহরনের কথা আমাকে জানাত।

আমি বললাম : আব্বা আপনি যখন ওর সাথে কথা বলছিলেন তখন কি কিছু টের পেয়েছেন। আব্বা বললেন : কী? বললাম : ওর মাথায় কিন্তু ছিট আছে। শুনে আব্বা বললেন : ছিট আছে বলেই তো এসেছে রে। তা না হলে তোর সঙ্গে দেখা করার জন্য সুদূর বগুড়া থেকে কোনো সুস্থ মানুষ কি আসতে পারে?

আমরা আজ এদেশে এমনি ছিটওয়ালা মানুষ চাই, পাগল চাই—মহৎ পাগল। যারা নিজের জীবন অন্যের জন্য দিতে পারবে সেই পাগল।

আমাদের সবারই মাথার খুলির ভেতর আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মতো এক মহাশক্তিধর দৈত্য আছে। স্বর্গমর্তপাতালে সে পারে না এমন কিছু নেই। কিন্তু নানান স্বার্থবুদ্ধি, বৈষয়িক বিবেচনা, ভীরুতা, দ্বিধা—এসব দিয়ে খুলির আবরণের ভেতর তাকে আমরা আটকে রাখি। কিন্তু জীবনের শুরুর দিকের কোনো মানসিক বা শারীরিক অভিঘাত বা প্রচণ্ড আবেগের আঘাতে সেই খুলির কোথাও যদি ছোট একটু ছিদ্র হতে পারি তবে তার ভেতর দিয়ে সেই পরাক্রমশালী দৈত্য বেরিয়ে পৃথিবীজুড়ে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। তখন বগুড়া থেকে ঢাকা কি, মার্কোপোলো বা ইবনে বতুতার মতো পৃথিবী তোলপাড় করে ঘুরে বেড়ানোও অসম্ভব নয়। এই অসীম পরাক্রমশালী দৈত্যটি বেরিয়ে এসেছিল বলেই না আলেকজান্ডার আলেকজান্ডার, কালমার্কস কার্লমার্কস, গৌতম বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধ।

আবারো বলি বইপড়ার জন্য, পুরস্কার নেওয়ার জন্য আমরা তোমাদের ডাকিনি। তোমাদের মধ্যে যাতে ঐ মহৎ পাগলটা বিকশিত হয় সেজন্য ডেকেছি। যাতে মাতালের মতো তোমরা বাঁচতে শেখো, বোকার মতো মরতে শেখো। যেন নিজের অজান্তে তুমি মানবজাতিকে ভালোবাসতে শেখো, তাদের জন্য নিজেদের দিতে শেখো। আজকাল ছেলেমেয়েরা অসুস্থ মানুষদের জন্য রক্ত দেয়, এই দেওয়াটা আমার অসম্ভব ভালো লাগে। ছেলেমেয়েরা যে অন্তত দিতে শিখছে, এতেই আমি খুশি। রক্ত তো মানুষের নিজের শ্রম ত্যাগ সংগ্রাম দিয়ে তৈরি না, নিজের জিনিশও না। মানুষের শরীরে এটা প্রকৃতি থেকেই আসে। তবু ভাবি, দিক না তা! দিতে শিখুক। বেশকিছু দিন দেওয়া হলে বলব : এবার আরো বড় কিছু দাও, নিজের জিনিশ দাও, নিজের কষ্ট দিয়ে, শ্রম দিয়ে, দুঃখ দিয়ে যা অর্জন করেছ তা দাও। এককথায় তোমার জীবনটাকে দাও।

আমি একটা ছেলেকে চিনতাম। নাম জীবন দে। তার নাম শুনলেই মনে হত নিজের জীবনটাকে দেবার জন্য সে যেন মুখিয়ে আছে। রসিকতা করে তাকে বলতাম : তোমার মা তোমার নাম রেখেছেন জীবন দে, আর সারাক্ষণ তুমি চেষ্টা করছ জীবন নিতে। এ কেমন কথা।

কাজেই অন্যেরা যাই করুক তুমি অন্তত ভালো হও। পৃথিবীর জন্য নিজেকে দাও, হোক না পৃথিবীর ভালো তোমাকে দিয়েই শুরু।

ধন্যবাদ।

[একাদশ শ্রেণীর বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের বক্তৃতা : ২০০৫]

চলো আলোর দিকে, সৌন্দর্যের দিকে

প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা,

তোমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এসে একবছরে বেশকিছু বই পড়েছ। আজ তার পুরস্কার পাবার দিন। শর্ত অনুযায়ী আমরাও তোমাদের তা দেব। দেব কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে বলব যে, যারা পুরস্কারের জন্য কাজ করে তারা উজ্জ্বল মানুষ, যারা বেদনার জন্য কাজ করে তারা শ্রেয় মানুষ। আশাকরি তোমরা বেদনার জন্য কাজ করবে, পৃথিবীর সবরকম দুঃখের সাধ্যমতো প্রত্যুত্তর দেবে। লাভহীন সেই কাজই হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাজ। প্রশ্ন করতে পার : কোন্ বেদনার জন্য কাজ করব আমরা? উত্তরে বলব : নিজের চারপাশে তাকাও। দেখ কত অভাব আর শূন্যতার গহ্বর তোমাদের চারপাশে। অশিক্ষার অজ্ঞতার দারিদ্র্যের দুঃখের কতরকম গহ্বর। এগুলোকে ভরতে হবে, তাহলেই পৃথিবীর সমৃদ্ধি। দেখ এসব দুঃখের মধ্যে কোন্‌টি দূর করার জন্য তোমার মন সবচেয়ে কাঁদে। সেই মন-কাঁদা দুঃখটা দূর করার জন্য এগিয়ে যাও। এস, তুমি আমি সবাই এগোই। পৃথিবীটাকে সুন্দর করি।

দেখ, পৃথিবীতে মানুষ একা বাঁচতে পারে না। তার মধ্যে রয়েছে হাজারো অশান্তি আর শূন্যতা। জন্য মানুষের সাথে সেগুলোকে ভাগাভাগি করতে পারলে তার প্রাণ বাঁচে। তখনি তার আসল সুখ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—গ্রামের গৃহবধূরা পুকুর থেকে পানি আনতে যায় কখন? একেকজন কি একেক সময়ে যায়? না, তা যায় না। বাড়িতে পানি আনা দরকার (তখন টিউবওয়েল, ট্যাপের পানি এসব ছিল না বলে পুকুর থেকেই তাদের খাবার বা রান্নাবাড়ার পানি আনতে হত), কোনো একসময়ে পুকুরে গিয়ে আনলেই তো হয়। কিন্তু দেখা যায় মেয়েরা যখন-তখন ঘাটে যায় না। যায় দুপুরে রান্না খাওয়া হয়ে গেলে শান্তিমতো একটা নির্দিষ্ট সময়ে।

কেন ঐ সময়টাকেই বেছে নেয় তারা? সেটা কি শুধুই পানি আনার জন্য, না কি আরও কিছু আছে এর মধ্যে? হ্যাঁ, সত্যিই আছে। সেই নির্জন অবসরে পুরবধূরা সবাই মিলে কিছুটা গল্পগুজব করবে, মনের কষ্টগুলো অন্যদের বলে নিজেকে হালকা করে নেবে—এসব কারণেই ঐ বিশেষ সময়টা তারা বেছে নেয়। পৃথিবীর নানা নিগ্রহ-অত্যাচার মানুষের মধ্যে সারাক্ষণ নানারকম ক্ষোভের-দুঃখের জন্ম দিচ্ছে। অন্যের কাছে সেসব বলে তাই নিজেদের কিছুটা হালকা হয়ে নিতে হয়। না হলে আমরা সুস্থ থাকি না।

একটা গল্প মনে পড়ছে। পূর্ব জার্মানি আর পশ্চিম জার্মানির দুই কুকুরের গল্প। পশ্চিম জার্মানি পুঁজিবাদী দেশ আর পূর্ব জার্মানি কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট সমাজে তো তখন কথাবলা ছিল নিষেধ। একনায়কত্ব সেখানে। পুঁজিবাদী সমাজ সে-তুলনায় অনেক মুক্ত, উদার। কিছু করতে পারো বা না পারো কথাবলার নিষেধ নেই। একদিন দেখা গেল পূর্বজার্মানির একটা কুকুর পশ্চিম জার্মানিতে এসে হাজির। আসতেই দেখা এক পশ্চিম জার্মানির কুকুরের সঙ্গে। পশ্চিম জার্মানির কুকুর তাকে দেখে বলল, 'এখানে এসেছ কেন? দেশে কি খাবার অভাব?' পূর্ব জার্মানির পুকুর বলল, 'না'। 'মালিক কি মারধোর করে? লাথি গুঁতো দেয়?' পূর্ব জার্মানির কুকুর : 'না।' ফের পশ্চিম জার্মানির কুকুরের প্রশ্ন : 'জিনিশপত্রের দাম কি বেশি?' 'না। সবই সস্তা যেখানে, সবই ভালো।' 'তাহলে এখানে এসেছ কেন?' পূর্ব জার্মানির কুকুর হেসে বলল, 'একটু ঘেউ ঘেউ করে যেতে। ওখানে তা করতে পারি না কী না।'

দুবেলা খেলেই মানুষের চলে না, মুক্তি আনন্দও তো কিছুটা দরকার, জীবনকে মেলে ধরা দরকার যাতে জীবনটা সাবানে কাচা কাপড়ের মতো উজ্জ্বল হয়ে ঝলমল করে। মনের দুঃখ, শরীরের দুঃখের মতো বহু বাস্তব-অবাস্তব দুঃখ আছে মানুষের। অনেক শূন্যতার গহ্বর আছে জীবনে। সেসব কী ভরাট না করলে আমাদের চলবে? জীবন তো তবে দুঃখ-অন্ধকারের নিচে তলিয়ে যাবে। এইজন্যই তো এত দরকারি-অদরকারি কাজ জগতে। এত বইপড়া, জীবনকে সুন্দর বিকশিত আর যোগ্য করে গড়ে তোলা, যাতে ঐসব অন্ধকার আর শূন্যতাকে আমরা হটিয়ে দিতে পারি। জীবন সুন্দর আর আলোকোজ্জ্বল হয়।

আমি জানি তোমাদের অনেকেই বই পড়তে এসেছিলে কেন। হয়তো কেউ 'অকারণ পুলকে'। এ-ও তো একটা লাভ! পুরো অর্থহীন কারণে কেউ কি কিছু করে? ছেলেবেলার গ্রামের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। মাতব্বরের বাড়িতে শালিশ বসেছে। কয়েকজন মিলে বিচার করছেন। বিচারের একপর্যায়ে এক মোড়ল যেই বলে উঠেছেন 'ঘটনাটা যখন ঘটেছে তখন এর কারণ নিশ্চয় আছে' তখন পাশ থেকে আরেক রসিক মোড়ল কথাটার সমর্থনে ফস করে দুটো কবিতার লাইন

শুনিয়ে দিলেন : 'শোনো বলি নিবারণ, তোমার ঝোলার মধ্যে বিলাই কান্দে কী কারণ।' ঝোলার মধ্যে বিলাই যখন 'কান্দে' তখন কারণ নিশ্চয়ই আছে। কথাটা শুনে খুব হাসি পেয়েছিল। কিন্তু একথা তো সত্য যে, কারণ সবকিছুরই আছে। তবে সে-কারণগুলো হয় সাধারণত বৈষয়িক। গড়পড়তা মানুষ সবকিছু নিয়েই ব্যবসা করে। কবিতা, শিল্প, সৌন্দর্য—সবকিছু নিয়ে। অধিকাংশ মানুষই চায় বস্তু। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা শুধু বস্তুকে চায় না। মৃত্যুর ঠিক আগের জুমায় হযরত মুহাম্মদ (স.) মোনাজাতের পরে হঠাৎ হু হু করে কেঁদে উঠলেন। সবাই জিগ্যেস করল : আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন : আল্লাহ একজন মানুষকে সবকিছুই দিতে চেয়েছিল কিন্তু সে কোনোকিছু না নিয়ে শুধু আল্লাকেই চাইল।

সবাই বুঝল 'একজন' বলে আসলে তিনি নিজেকেই বোঝাচ্ছেন। যে আল্লাহ তাঁকে সবকিছুই দিতে চেয়েছেন তাঁর কাছে অন্য কিছু না-চেয়ে তিনি শুধু তাঁকেই চেয়েছেন।

রসুলুল্লাহ তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে নিশ্চয়ই বিত্তর ধনসম্পদ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেসব না করে শুধু আল্লাহকেই চেয়েছিলেন। আল্লাহকে চাওয়া মানে কী? আল্লা কি কোনো বৈষয়িক জিনিশ? না, তিনি অতীন্দ্রিয় অলৌকিক আনন্দের জিনিশ? তবে একটা কথা আছে। যে আল্লাহকে ভালোবাসে তার জন্য আল্লাহ আনন্দের জিনিশ, যে ব্যবসা করে তার জন্য বৈষয়িক জিনিশ। যে ব্যবসা শুরুর সময় গরু জবাই দিয়ে বলে, 'আল্লাহ একটা গরু দিলাম কিন্তু, মনে রাখিস' সে বৈষয়িক মানুষ। আহা কী প্রেম আল্লার জন্যে! আল্লাহকে তুই-টুই ডেকে একাকার! যেন আল্লাহও তার মতোই জড়বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো সত্তা? যেন তিনি বুঝতেই পারবেন না গরু কোরবানি সে দিয়েছে কার জন্যে—নিজের ব্যবসার জন্যে না আল্লাহর জন্যে। এই অন্তহীন বিশ্বচরাচর যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই অনন্তবুদ্ধি দিয়ে তিনি কি বুঝতে পারবেন না লোকটার মতলব কী? কী নির্বোধ আর আত্মতৃপ্ত এই স্থূল লোকগুলো!

অধিকাংশ মানুষই এমন। তারা সাধারণত ব্যবসায়ী। বিনিয়োগকারী। সবকিছুতে তারা লাভ খোঁজে। কিন্তু বড়মানুষেরা, রসুলুল্লাহর মতো মানুষেরা, কাজ করেন আনন্দের জন্য, বেদনার জন্য, স্বপ্নের জন্য। পৃথিবী ছাড়িয়ে তাঁরা বড়কিছু খোঁজেন। রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় লিখেছিলেন : 'সেইতো ভালো লেগেছিল / আলোর নাচন পাতায় পাতায়।' দৃশ্যটা একেবারে চোখের সামনে যেন দেখা যায়, তাই না? গাছের পাতার ওপর সকালবেলার সোনালি আলো এসে পড়েছে। পাতাটা বাতাসে নড়ছে, মনে হচ্ছে যেন সারা পাতা জুড়ে সেই সোনালি আনন্দ নেচে বেড়াচ্ছে। এই-যে দেখার আনন্দ, একি বৈষয়িক আনন্দ? না, একে বলে অলৌকিক আনন্দ।

শরৎচন্দ্রের একটা বই আছে : 'শ্রীকান্ত'। এর চতুর্থ পর্বে একটা চরিত্র আছে, নাম গহর। গহর মুসলমান যুবক, কবি। রাতে ঘরে বসে শ্রীকান্তের সঙ্গে গল্প করতে দখিন হাওয়ার আঁচ পেতেই হঠাৎ সে অস্থির হয়ে উঠল। বলল : বাতাসি নেবুর গন্ধ পাচ্ছিস! পৃথিবীর সবকিছুতে সে মদিরতা আর আনন্দ দেখে। তাই নিয়েই তার মাতাল দিন কাটে। শরৎচন্দ্র জানান—গহরের দাদা ছিলেন গায়ক। কিন্তু বাবা ছিলেন উল্টো। বড়লোক। ব্যবসাবাণিজ্য করে টাকা করেছিলেন। কিন্তু গহরের মধ্যে টাকার আগ্রহ নেই। লিখেছেন 'ছেলে পাইল না বাপের বিষয়বুদ্ধি, পাইয়াছে ঠাকুরদাদার কাব্য সংগীতের অনুরাগ।'

কিছু কিছু মানুষ আছে যারা স্থূল বস্তুগত প্রাপ্তির জন্য বাঁচে না। যা সুন্দর সৃক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় তারই জন্য তাদের আকুতি। আজ পৃথিবী পুরোপুরি বস্তুর অধিকারে চলে যাচ্ছে। ভোগ আর বস্তুসর্বস্বতা সবকিছু গ্রাস করে ফেলছে। তবু যেন না ভুলি—যা উন্নত হৃদয়ের আকুতি তা ভোগ নয়, উপভোগ। আজ পৃথিবী যতই দানবের করায়ত্ত হোক, তবু মনে রাখতে হবে 'এই দিন দিন নয় আরো দিন আছে। এই দিনেরে যেতে হবে সেই দিনের কাছে।' স্থূল ভোগসর্বস্বতার চেয়ে জীবন উন্নতর ও মহত্ত্বমণ্ডিত। সেই অনির্বচনীয় মক্কাই হোক আমাদের গন্তব্য। তার জন্যই হোক আমাদের সংগ্রাম। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার কয়েকটা লাইন মনে পড়ছে : "যে ধনে হইয়া ধনি / মনি মনিরে মানে না মনি / তাহারি খানিক, / মাগি আমি নতশিরে / এত বলি নদী নীরে ফেলিল মানিক।" যা পেলে প্রাসাদ ঐশ্বর্য ধনসম্পদকে তুচ্ছ মনে হয় সে অলৌকিক আনন্দই হোক মানুষের সর্বোচ্চ কামা। বাকি যা-কিছু সবই তো আমাদের জান্তব সত্তার অংশ। সবই তো আমাদের আছে। সবই তো ক্ষণিকের। কিন্তু চিরকালের আনন্দের জিনিশও তো আমাদের পেতে হবে!

প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে তোমরা আজ পুরস্কার পাচ্ছ। একদিক থেকে এ আনন্দের। তবু অপ্রীতিকর হলেও বলি, প্রতিযোগিতা জিনিশটা আসলে ভালো না। শেষপর্যন্ত এ একটা বৈষয়িকতারই আকাঙ্ক্ষা, জয়ী হয়ে অন্যের মুখ মলিন করে দেবারই উল্লাস। শেষপর্যন্ত এ তাই আত্মঘাতী। আমাদের ভেতরটাকে এ ছোট করে ফেলে। মানুষের আসল প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত নিজের সঙ্গে। নিজের অক্ষমতা, অযোগ্যতা, লোভ ও পাপের সঙ্গে। নিজের হীনতা, অজ্ঞতা, মূঢ়তা ও দুর্বলতার সঙ্গে। আমি আলোর দিক যাব, শ্রেয়ের দিকে যাব, সৌন্দর্যের দিকে যাব, আমি আমার চেয়ে বড় হব—এইতো হওয়া উচিত আমাদের স্বপ্ন। আমাদের স্লোগান 'আলোকিত মানুষ চাই' কথাটা তো এমনি একটা স্বপ্নেরই নাম। কেউ কি কখনো পুরো আলোকিত হয়? হয় না, কিন্তু হওয়ার চেষ্টা করে। এই চেষ্টাটাই হওয়া। ঐ চেষ্টার ভেতর দিয়ে জীবনে আলোর পরিমাণ বেড়ে চলে।

তোমরা আলোকিত হও এই কামনা করি। যদি কেন্দ্র থেকে তোমাদের একটা

কণা পরিমাণ আলোও আমরা দিয়ে থাকি তাহলে আমাদের চেষ্টাকে সফল মনে করব। মানুষকে কি সবকিছু দিয়ে দেওয়া যায়? বড় জীবন কি ভিক্ষা দিয়ে তৈরি হতে পারে? আলো কি কাউকে দান করা যায়। নিজের আগুনে জীবন জ্বালিয়ে তা তৈরি করতে হয়। বিশ্বচরাচরের সৌন্দর্য থেকে তিল তিল আহরণ করে যেমন বিশ্বের তিলোত্তমাকে তৈরি করতে হয় তেমনি অস্তিত্বের আগুন থেকে কণাকণা আলো নিয়ে তৈরি হয় আলোকিত মানুষ। একদিনে হয় না, দীর্ঘ যাত্রা আর প্রতীক্ষার দুরূহ থেকে একটু একটু করে সে ফুটে ওঠে। কাল যতটুকু ছিল আজ তার থেকে যেন কিছুটা বেশি হয়। আজ থেকে আগামীকাল আরও বেশি। এভাবেই তো আলোর পরিমাণ বাড়ে। আমরা যেন না ভুলি এক থেকে দুই বেশি, দুই থেকে চার। এভাবে যতই আমরা বাড়ব ততই আমরা আলোকিত হব।

নিজের অগ্রহে বই পড়তে পারে খুব কম মানুষ। সবাই আরজ আলী মাতুব্বর নয়। তোমরা জানো, আরজ আলী মাতুব্বর একটা বই আনার জন্য সাত মাইল হেঁটে বরিশাল শহরে যেতেন, তারপরে আবার সাত মাইল হেঁটে বইটা নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। এভাবে প্রতি সপ্তাহে সাত মাইল হাঁটতেন। আমরা তো আরজ আলী মাতুব্বর নই অথচ জানার পিপাসা আমাদের কমবেশি নেই তাও নয়। তাই আমরা নিজেরা কিছুটা পারি, বাকিটা পারি চাপে পড়লে। আমাদের বইপড়া কর্মসূচি অমনি একটা চাপ। পৃথিবীতে যেখানে ভালো যা ঘটে, খুঁজে দেখবে সেখানে এমনি কোনো-না-কোনো চাপের ব্যাপার আছে। এমনি কোনো পুরস্কার বা লাভ বা লোভের ব্যবস্থা। অনেকেরই আকৃতি আছে বড় জীবনের জন্য। কিন্তু একার চেষ্টায় ঠিকমতো পেরে উঠছে না। একটু ধাক্কা দিলে দেখা যায় হয়ে যাচ্ছে। আমরা এটুকুই করার চেষ্টা করি। আশাকরি সহায়তা হিশেবে এ একেবারে ফেলনা নয়।

জাতির শৈশবকে আমরা সুন্দর করতে চাই যাতে জাতি একদিন সুন্দর হয়ে ওঠে। শৈশব মানে দিনরাত পাঠ্যবই মুখস্থ করা নয়। এসব বেশি করলে জীবনের বড় সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। আমাদের শিশুদের সারাক্ষণ এ এতই করতে হচ্ছে যে এরা পুরো শৈশবহীন হয়ে যাচ্ছে। অভিভাবকেরা পুত্রঘাতী রুস্তমের মতো তাদের সন্তানদের মূঢ়ের মতো কেবলি খুন করছে। শৈশবে পড়াশোনা খুবই জরুরি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি দরকার খেলাধুলা, বন্ধুত্ব, স্বপ্ন, আলস্য, আনন্দ। এসব ঝলমলে জানালার ভেতর দিয়েই বাইরের বড় জীবন শিশুদের মনের চত্বরে আলো ফেলে। তারা বড় হয়।

আজ এই রুচিশীল সাংস্কৃতিক পরিবেশে তোমাদের মনটা যেভাবে গড়ে উঠল, সারা জীবন, আমি জানি, তা সেরকমই থেকে যাবে। তোমাদের এই আলোকস্নাত মনটাকে মৃত্যু পর্যন্ত কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু এই বয়সে কারো মন যদি একবার স্থূলরুচির শিকার হয়ে যায়, মৃত্যু পর্যন্ত তারা খারাপ কাজ করতে থাকবে।

সেদিন এক টিভি প্রোগ্রামে একজন আমাকে প্রশ্ন করল : সবচেয়ে অসম্ভব একটা কথা বলুন। আমি উত্তরে বললাম : সবচেয়ে অসম্ভব একটা কথা অন্তত এই যে বাংলাদেশের মন্ত্রীরা কখনো মিথ্যা বলেন না। কেন তাঁরা এত মিথ্যা বলেন? বলেন এজন্য যে তোমাদের মতো ঐই বয়সে কেউ তাদের মনকে রুচিস্নাত বা দীপান্বিত করে দেয়নি। তোমরা এই সুযোগটা এই কেন্দ্রে কমবেশি পেয়েছ। জীবনে তোমরা কে কী হবে জানি না, তবে জানি তোমরা আজকের এ বয়সে চিরদিন থাকবে না। তোমরা একদিন বড় হয়ে জাতীয় জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে যাবে। আজ এই কেন্দ্র থেকে তোমাদের মধ্যে যা-কিছু ভালো জিনিশ তোমাদের অজান্তে আহরিত হল; যে মার্জিত পরিশীলিত জীবনবোধ, যে সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বা রুপু—তা—যেদিন তোমরা বড় হবে—সেদিন তোমাদের কাজ আর নির্মাণের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে একটা উন্নত বাংলাদেশ সৃষ্টি করবে এই আশা আমরা করছি।

তোমরা ভুলো না সফল হওয়া জীবনের বড় কথা নয়। বড় কথা হল সার্থক হওয়া। সাফল্য একটা দক্ষতা। এ এক স্বার্থসর্বস্ব স্থূল ও বিষয়বুদ্ধির জিনিশ। অনেক চোর-বাটপাড়ও জীবনে সফল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সার্থকতা অন্য জিনিশ। এর মানে যেসব অপার মহৎ সম্ভাবনা নিয়ে আমরা জন্মেছিলাম, প্রচুরতম সুন্দরতম সুব্যবহারের মাধ্যমে তাদের পরিপূর্ণতা দেওয়া। এ এক বড় কৃতার্থ ব্যাপার। তোমরা সার্থক হও, তোমার জন্মভূমিকে সার্থক করো।

[একাদশ শ্রেণীর বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের বক্তৃতা : ২০০৪]

রূপরেখা

[কেন্দ্রের পরিচিতি]

রূপরেখা : কেন্দ্রের বর্তমান পরিচিতি

ভূমিকা

অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মোৎসর্গের ভেতর দিয়ে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ। আজ তার নির্মাণের পর্ব। এই নির্মাণকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে হলে আমাদের আজ চাই অনেক সম্পন্ন মানুষ। সেইসব মানুষ যাঁরা উচ্চতর আদর্শ ও মূল্যবোধসম্পন্ন; আলোকিত, শক্তিমান, কার্যকর ও সংশপ্তক—যাঁরা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে শক্তিমান নেতৃত্ব দিয়ে এই জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে পারবে। তাঁদের আজ পেতে হবে আমাদের বিপুল সংখ্যায়—সারা দেশে, সবখানে। এককে দশকে নয়, সহস্রে লক্ষে। আর কেবল সংখ্যায় পেলেই চলবে না, তাদের পেতে হবে একত্রিত, সমবেত আয়োজনে। তাদের গ্রথিত করতে হবে শক্তিশালী সংঘবদ্ধতায়, উত্থান ঘটাতে হবে জাতীয় শক্তি হিশেবে।

সারাদেশের সবখানে এইসব আলোকিত মানুষ গড়ে তোলা, জাতীয় শক্তি হিশেবে তাদের সংঘবদ্ধ করা এবং এর পাশাপাশি জাতীয় চিত্তের সামগ্রিক আলোকায়ন ঘটানোই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লক্ষ্য।

কিন্তু আজ কোথা থেকে কীভাবে পাব এই মানুষদের? একটা সমাজে সম্পন্ন মানুষেরা জন্মায় মূলত দুটো জায়গা থেকে। জাতির শিক্ষাঙ্গনগুলো থেকে আর আলোকিত পরিবারগুলো থেকে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যদি জীবন-বিকাশের সমৃদ্ধ পরিবেশ তৈরি করা যায় তবে সেখান থেকে আলোকিত মানুষদের জন্ম হতে পারে। ইয়োরোপ-আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বেড়ে-ওঠা দেশের সম্পন্ন সন্তানেরাই ঐ দেশগুলোর বিভিন্ন অঙ্গনে নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা দেন, জাতিকে স্বপ্ন দেখান।

আরেকটা জায়গা থেকে এই মানুষেরা তৈরি হতে পারে : পরিবার।

রবীন্দ্রনাথ স্কুল-কলেজ থেকে বড় হননি। হয়েছিলেন একটা সম্পন্ন পরিবার থেকে। ঐ পরিবার ছিল একটি উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। সেই গভীর প্রদীপ্ত জীবন-পরিবেশই তাঁকে বড় করে তুলেছিল।

আমাদের সমাজে উচ্চায়ত মানুষ-জন্মের এই দুটো সুযোগের কোনোটাই আজ সুলভ নয়। গত কয়েক দশকে আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গন—স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো—প্রায় ধুলোর সঙ্গে মিশে গেছে। জ্ঞানের আদর্শ, শিক্ষার মান, উন্নত মূল্যবোধ, উচ্চায়ত লক্ষ্য—সব দিক থেকেই আজ এই অঙ্গন এক করুণাবহ অবক্ষয় ও নিম্নতার শিকার। সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিশেবে এদেশে পরিবারগুলো অবলুপ্ত। আজও পুরোপুরি অসংগঠিত, অরাজক।

তা হলে কোথায় আমরা পাব আমাদের সমাজের সেই আলোকিত মানুষদের? কীভাবে গড়ে তুলব তাদের? একটা পথ আছে তাদের গড়ে-তোলার। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোই হতে পারে তাদের জন্মের সেই ঈপ্সিত সূতিকাগার। আমাদের তরুণ-তরুণীরা—আমাদের ভবিষ্যৎ দিনের নাগরিকেরা—আজও তো এসে জড়ো হচ্ছে আমাদের এইসব স্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই। হয়তো আজ এই বিদ্যায়তনগুলোয় জ্ঞানের বর্তিকা, শিক্ষার আদর্শ, মূল্যবোধের শক্তি, চিত্তের আলোকায়ন—সবকিছুই দুঃখজনকভাবে মাটিতে গুঁড়িয়ে গেছে। তবু বাকি রয়েছে তো সবকিছুই। চেয়ার-টেবিল, দালান-কোঠা, আসবাব-কংক্রিট, চক-ডাস্টার, মাস্টার-ছাত্র সবই তো আছে। আর এর মধ্যেই রয়েছে আমাদের জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ—দেশের সবচেয়ে মেধাবী, প্রতিভাবান, উজ্জ্বল ও শক্তিমন্ত ছেলেমেয়েরা; বসন্তের তরুণ ফুলের মতো অগণিত সাধারণ ছেলেমেয়ের সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মেই তো তারা এসে জড়ো হচ্ছে এ-শিক্ষাঙ্গনগুলোয়—এই দীন শ্রীহীন স্কুল-কলেজের চত্বরেই। হয়তো পরবর্তিতে সযত্ন লালন ও পরিচর্যার অভাবে ব্যর্থ হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে; তবু আসছে তো তারা, অনিবার্য নিষ্কৃতিহীনভাবেই তো আসছে।

আমরা ভেবে দেখেছিলাম সারাদেশের সবখানে ঐসব উৎসুক অনুসন্ধিৎসু, উজ্জ্বল ও প্রতিভাবান ছেলেমেয়েদের তাদের স্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বেছে নিয়ে যদি কোনো আলাদা জায়গায় একখানে করা যায়, তারপর নিরন্তরভাবে মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ বইগুলো পড়ানোর ভেতর দিয়ে যদি তাদের চেতনাজগৎকে বড় করে তোলা যায়, আর এরই পাশাপাশি নানান ধরনের সাংস্কৃতিক-সামাজিক কার্যক্রম ও সাহিত্যিক কর্মসূচি, প্রতিযোগিতা, অতিথি-বক্তৃতা, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রদর্শন, শ্রেষ্ঠ সংগীত শ্রবণ, ভ্রমণ—এমনি সব অনিন্দ্য কর্মসূচির মধ্যদিয়ে এই কৈশোর ও তারুণ্যের দিনগুলোয় তাদের হৃদয়কে স্নিগ্ধ, সজীব, উৎকর্ষময় করে তোলা যায়; তবে আলোকিত, সমৃদ্ধ ও

উন্নতমূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিশেবে তারা সহজেই গড়ে উঠতে পারে।

কাজেই সবাইকে না হলেও অন্তত জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কৈশোরকে সুন্দর ও আলোকিত করে তোলা সম্ভব—যারা একদিন জাতির জীবনে অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, জাতিকে দিকনির্দেশনা দেবে। এই মানুষদের গড়ে তোলার জন্য আমরা হাতে নিয়েছি বেশক'টি কর্মসূচি। তা নিম্নরূপ :

১. দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রম

ক. শাখাভিত্তিক কর্মসূচি

ওপরের ভাবনাগুলো থেকেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম বড় কর্মসূচি 'দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রম'-এর সূচনা। দেশের যেখানেই একসঙ্গে দুটি বা তিনটি স্কুল ও একটি বা দুটি কলেজ রয়েছে সেখানেই—তা সে জেলা, উপজেলা বা ইউনিয়ন যা-ই হোক-না কেন—ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে, উপগ্রহের মতো করে গড়ে তোলা হচ্ছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের এক-একটি শাখা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, মেধাবী, উদ্যোগী ও প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের খুঁজে বের করে এই শাখাগুলোর সভ্য করে নেওয়া হচ্ছে। তরুণ-তরুণীদের আত্মিক নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা রাখেন এমন একজন সংস্কৃতিবান, যোগ্য ও উদ্যমশীল ব্যক্তির নেতৃত্বে আলোকিত পরিবারের আদলে পরিচালিত হচ্ছে এই শাখাগুলো।

এইসব শাখার কর্মসূচিগুলোর পরিচালনার ব্যাপারটিও খুব সহজ। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ থেকে সংগৃহীত সদস্যেরা সপ্তাহে মাত্র একবার (স্কুলের ছেলেমেয়েরা প্রতি শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে ১২টার মধ্যে এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিকেল ৩টা থেকে ৬টার মধ্যে) নির্ধারিত কোনো স্থানীয় মিলনায়তন বা স্কুল-কলেজের বৃহদায়তন কক্ষে এসে জড়ো হয়। এখানে দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের আওতায় তারা অংশ নেয় দুটি কর্মসূচিতে।

১. ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী—এই ৭টি শ্রেণীর সদস্যরা এখানে একটি বইপড়া কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে প্রতিবছর তাদের মন ও বয়সের উপযোগী ১৪টি সুন্দর রুচিসম্মত ও উন্নতমানের বই পড়ার সুযোগ পায়। অতিরিক্ত বই হিশেবে তাদের থাকে আরও ৯টি বাড়তি বই পড়ার সুযোগ। প্রতি শুক্রবার তারা প্রত্যেকে একটি করে বই বাড়িতে নিয়ে যায়। তারপর সারা সপ্তাহ ধরে বইটি পড়া শেষ করে পরের শুক্রবার সেটা ফিরিয়ে দিয়ে আবার নতুন বই বাড়িতে নেয়।

এভাবে এগিয়ে চলে তাদের বইপড়ার ব্যাপারটি। বইপড়াকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সদস্যদের জন্য রয়েছে পুরস্কারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। প্রতিবছর মোট বাইশ

সপ্তাহ স্থায়ী এই কর্মসূচির মধ্যে যারা ৭টি বই পড়ে শেষ করে তারা পায় 'স্বাগত পুরস্কার'—একটি বা দুটি চমৎকার সুন্দর বই। যারা আরও তিনটি বই অর্থাৎ মোট ১০টি বই পড়ে শেষ করতে পারে তারা পায় 'শুভেচ্ছা পুরস্কার'—স্বাগত পুরস্কারের চেয়ে বেশিসংখ্যক বই। যারা ১৩টি বই পড়ে শেষ করতে পারে তারা পায় 'অভিনন্দন পুরস্কার'—শুভেচ্ছা পুরস্কারের চেয়ে বেশি বই। যারা ১৬টি বই পড়ে তারা পায় 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পুরস্কার'—সর্বোচ্চসংখ্যক বইয়ের একটি চমৎকার উপহার। কোনো শাখায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পুরস্কার-পাওয়া সদস্যের সংখ্যা ১৫ জনের বেশি হলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণের দিন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পুরস্কার-পাওয়া সদস্যদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে একজনের নাম তোলা হয়। যার নাম ওঠে তাকে দেওয়া হয় এক হাজার টাকার বইয়ের একটি লোভনীয় বাড়তি পুরস্কার।

২. বইপড়া কর্মসূচির পাশাপাশি প্রতি শুক্রবার কেন্দ্রের সদস্যেরা অংশ নেয় একটি করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। স্কুল আর কলেজ কর্মসূচির অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় আলাদাভাবে। বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পঠিত বই-এর ওপর আলোচনা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, অতিথি-বক্তৃতা, সংগীতশ্রবণ কর্মসূচি, মানুষ ও দেশ সম্বন্ধে জানার বিভিন্ন কর্মসূচি, পরিবেশ-পরিচিতি, বছরের শেষে দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ, পিকনিক—এমনি নানাধরনের কর্মসূচির ভিতর দিয়ে ভাব ও অনুভূতির সজীব বিনিময় এবং আনন্দমুখর সহমর্মিতার পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়কে সুখিত করে গড়ে তোলা হয়। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহদানের লক্ষ্যেও অংশগ্রহণকারীদের জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা। বইপড়ার মাধ্যমে ঘটে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, অনুষ্ঠানগুলোর ভেতর দিয়ে হৃদয়বৃত্তির। এভাবে তারা বিকশিত হয় হৃদয়বান, মননশীল ও আনন্দময় মানুষ হিশেবে।

দেশভিত্তিক কর্মসূচি একটি ব্যাপক কর্মসূচি। সারাদেশে এ-পর্যন্ত এর শাখাভিত্তিক কার্যক্রমের প্রায় ৫০০টি শাখা স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রায় ১,০০,০০০ ছাত্রছাত্রী নিয়মিতভাবে এই শাখাগুলোতে অংশ নিচ্ছে। গত ২৫ বছরে এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে প্রায় ২,৫০,০০০ ছাত্রছাত্রী।

খ. স্কুল ও কলেজভিত্তিক কর্মসূচি

দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কর্মসূচির আওতায় সম্প্রতি ভিন্ন ভিন্ন স্কুল ও কলেজে আলাদাভাবে এই কর্মসূচি চালু করার একটি বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই চেষ্টা শুরু হয়েছে ২০০৪ সালে, শেষ হবে ২০০৯ সালে। কর্মসূচিগুলো চলে স্কুল-কলেজগুলোর প্রধানশিক্ষক ও অধ্যক্ষের সহযোগিতায় ও একজন যোগ্য ও সংস্কৃতিবান শিক্ষক/অধ্যাপকের উদ্দীপ্ত নেতৃত্বে। এই সময়ের মধ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় গড়ে ৪০টি করে স্কুল ও কলেজে অর্থাৎ দেশের মোট প্রায় ২৫০০ স্কুল ও

৫০০ কলেজে এই কর্মসূচি চালু হবে এবং ২,৫০,০০০ ছাত্রছাত্রী এর নিয়মিত কর্মসূচির আওতায় আসবে। এই মধ্যে প্রায় ৮০টি স্কুলের প্রায় ৪২,০০০ ছাত্রছাত্রী এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বইপড়ার পাশাপাশি এইসব স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্যও রয়েছে পর্যাপ্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন। পরিচালনা ও সম্প্রসারণের কথা বিবেচনা করে ভবিষ্যতে শাখাভিত্তিক কর্মসূচি কমিয়ে স্কুল-কলেজভিত্তিক কর্মসূচি বাড়িয়ে তোলা হবে।

পরিশিষ্ট

এর মানে কি এই যে এই কর্মসূচির ভেতর দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা একেবারে একেকজন 'বড়' বা 'পরিপূর্ণ' মানুষ হয়ে ওঠে? না, তা নয়। শুধু এটুকু বলা যায় : এইসব সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, বন্ধুত্ব আর আনন্দ-উদ্দীপনায় ভরা এমন প্রয়াসের মধ্যদিয়ে একটা বড় স্বপ্নের সামনে তারা দাঁড়ায়। একটা অনুভূতিশীল তারুণ্যময় হৃদয়কে—জীবনের স্পর্শকাতর ও সম্ভাবনাময় মুহূর্তে—এমনি একটা বড় জীবন-স্বপ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়াটাই বড় কথা; কোনো-এক মহত্তর আকাঙ্ক্ষার জন্য বড় উজ্জীবনে জাগিয়ে দেওয়াটাই বড় কথা। শুধু এটুকু হলে বাকিটা তারা নিজেরাই করে নিতে পারে।

আমাদের চেষ্টা এটুকুই—তাদের জীবনকে ঐ বড় স্বপ্নে, বড় উজ্জীবনে জাগিয়ে দেওয়া। তাদের কৈশোর-শৈশবকে সুন্দর করে তোলা। এরপর তাদের জীবন-বিকাশ তাদের ভেতরকার জাগ্রত অন্তর্শক্তির হাতে; চারপাশের দেশ ও জাতির বেদনার প্রত্যুত্তরে তাদের নিজেদের এগিয়ে যাওয়া দেখাতে। সেখানে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রদীপ।

এই কর্মসূচির সুফল অনেকগুলো

এক. এই কর্মসূচি যেসব এলাকায় চলতে শুরু করে সেসব এলাকার জনগণ এর দ্বারা বিপুলভাবে উপকৃত হতে থাকে। প্রথমত, এই কর্মসূচির ছেলেমেয়েদের মাধ্যমে ঐসব এলাকার ঘরে-ঘরে সুন্দর, রুচিশীল ও উন্নতমানের বই পৌঁছাতে থাকে। যে-পরিবারগুলোতে ওসব বই যায়, সেসব পরিবারে আমাদের সদস্যটিই যে কেবল ঐ বই-এর পাঠক হয় তা নয়, তার ভাই-বোন এমনকি বাবা-মায়েরাও ঐসব বই-এর পাঠক হয়ে ওঠে। কাজেই জাতীয় চিত্তকে দীপ্তিময় করার যে-উদ্দেশ্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের রয়েছে তা-ও এতে ব্যাপক সার্থকতা পায়। প্রত্যেকটি এলাকায় উৎকর্ষমণ্ডিত মানুষ বেড়ে যাবার ফলে সমাজের ওপর তার সুপ্রভাব পড়ে।

দুই. এই কার্যক্রমের ছাত্রছাত্রীরা জীবন ও জগৎ-সম্বন্ধে ধারণার ব্যাপারেই যে তাদের সমবয়সীদের থেকে এগিয়ে যায় তা-ই নয়, তাদের [illegible]

উঠতে থাকে অন্যদের চেয়ে গভীর ও সমৃদ্ধ। তাদের দৃষ্টি হয়ে ওঠে প্রসারিত, বুদ্ধি জাগ্রত ও স্বপ্ন দিগন্তপ্রসারী। ফলে ঐসব এলাকার বিভিন্ন অঙ্গনের নেতৃত্ব স্বাভাবিক নিয়মেই এই অগ্রসর ছেলেমেয়েদের হাতে এসে যেতে থাকে। এই কর্মসূচির ভেতর থেকে বেড়ে-ওঠা ছেলেমেয়েরা যে ইতোমধ্যেই নিজ-নিজ এলাকার সাংস্কৃতিক-সামাজিক এমনকি রাজনৈতিক অঙ্গনেও অর্থপূর্ণ নেতৃত্ব দিতে শুরু করেছে তা-ই নয়, জাতির শুভ ও সংঘবদ্ধ শক্তি হিশেবেও আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়া ব্যাপকভিত্তিক হয়ে উঠলে তা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনের নেতৃত্বকে শক্তিশালী ও সমন্বিত করবে এমন আশা করা অমূলক নয়।

তিন. এই কর্মসূচির ভেতর দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়ের ও মননের বিকাশের সঙ্গে ঘটে আরও একটা গভীর ঘটনা। এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে একটা এলাকার সবচেয়ে মেধাবী, সৃষ্টিশীল, অনুসন্ধিৎসু ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা অর্থাৎ দেশের ভবিষ্যৎ দিনের সুযোগ্য মানুষেরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে যায়। ব্যাপারটা একদিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আজ আমাদের দেশের সবখানে কেবলই অন্তর্ভেদ সংঘবদ্ধতা। কোথাও একটা দুর্বৃত্ত হেঁকে উঠলে মুহূর্তে সব দুর্বৃত্ত একখানে হয়ে যায়। এদের তুলনায় ভালোমানুষদের অবস্থা আজ অনেক হতাশাব্যঞ্জক। তারা আজ বিচ্ছিন্ন এবং যোগাযোগহীন; যে যার আলাদা ঘরে বসে কাঁদছে, কেউ কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রতিভাবান সন্তানদের এই বন্ধুত্ব আসলে আগামী দিনের জাতির পথনির্দেশকদের মধ্যে বন্ধুত্ব, এই জাতির শ্রেয়োবোধসম্পন্ন উচ্চায়ত মানুষদের বন্ধুত্ব। এই কার্যক্রম তাই আমাদের দেশের আলোকিত, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রগতিশীল ও কার্যকর মানুষদের শক্তিশালী করে তোলার পাশাপাশি তাদের সংঘবদ্ধ করারও কার্যক্রম।

২. পাঠচক্র কার্যক্রম

আমাদের দেশে আজ বিপুলসংখ্যাতেই তো এমন মানুষ দরকার যাঁরা বিশ্বজ্ঞানের জগৎকে গভীর ও সপরিসরভাবে জানেন—সেইসব জলাশয়ের মতো মানুষ যাঁদের কাছ থেকে দেশ ও জাতি প্রয়োজনের মুহূর্তে তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করতে পারবে—যাঁরা প্রতিনিয়ত নিজেদের মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডার দিয়ে জাতিকে সাহায্য করতে পারবেন।

উচ্চতর জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে এইধরনের মানুষসৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্রের বড় শাখাগুলোয় উন্নতমানের জ্ঞানচর্চা ও পঠনপাঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যে-কর্মসূচিটির ভেতর দিয়ে তা অর্জন করার চেষ্টা হচ্ছে, তার নাম পাঠচক্র কার্যক্রম। এই কার্যক্রম দুরকম :

ক. দীর্ঘমেয়াদি পাঠচক্র

দীর্ঘমেয়াদি এই পাঠচক্রগুলোয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুশো বই পড়ার সুযোগ রয়েছে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞানসহ বিশ্বজ্ঞানের সকল শাখার শ্রেষ্ঠ বইগুলোর পঠনপাঠন এই চক্রের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। সমবেতভাবে বইগুলো পাঠের পর সেগুলোর ওপর নিয়মিত টক্ক ও অন্যান্য ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অতিথি-বক্তৃতা, ভ্রমণ ইত্যাদির বাড়তি সুযোগ রয়েছে এই চক্রে।

খ. অন্যান্য পাঠচক্র

এই কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর স্বল্পমেয়াদি পাঠচক্র আয়োজিত হয়। এযাবৎ দর্শন পাঠচক্র, রবীন্দ্র-অধ্যয়ন চক্র, রাজনীতি পাঠচক্র, বিশ্ব-ইতিহাস পাঠচক্র, বাঙালির ইতিহাস পাঠচক্র, অর্থনীতি পাঠচক্র, বিজ্ঞান পাঠচক্র, মুক্তিযুদ্ধ পাঠচক্র—এমনি নানাধরনের পাঠচক্র আয়োজিত হয়েছে ও হচ্ছে। এই পাঠচক্র মূলত বিশ্ববিদ্যালয় পর্বের ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ জ্ঞানার্জীদের উৎকর্ষের জন্যে।

৩. দেশভিত্তিক লাইব্রেরি কার্যক্রম

'দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রম'-এর মতো 'দেশভিত্তিক লাইব্রেরি কার্যক্রম'-এরও লক্ষ্য দেশের উৎসাহী ও মননশীল মানুষদের কাছে বইপত্তর ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। তবে এর কর্মপদ্ধতি ভিন্ন। দেশভিত্তিক লাইব্রেরি কার্যক্রমের কর্মপদ্ধতি নিম্নরূপ :

ক. ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি

আমাদের দেশের লাইব্রেরি-ব্যবস্থা আজ প্রায় ভেঙে পড়েছে। লাইব্রেরিগুলোর ব্যবস্থাপনা দুর্বল, বইয়ের মান দুঃখজনক এবং পরিবেশ বিমর্ষ। ভালো বই বাড়িতে নিয়ে পড়ার সুযোগ এদেশের পাঠকদের আজ নেই বললেই চলে। একটা উদাহরণ দিই। ঢাকা মহানগরী আয়তনে বিশাল। এখানে এক কোটির বেশি মানুষের বাস, কিন্তু বাড়িতে বই নিয়ে পড়া যায় এমন লাইব্রেরি এই শহরে প্রায় নেই-ই। যে-দুয়েকটি এমন ছোট-বড় লাইব্রেরি এখানে রয়েছে, যাতায়াতের কষ্ট আর ব্যয়বহুলতার কারণে সেগুলোতে আসা-যাওয়া করাও পাঠকদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। লাইব্রেরি-ব্যবস্থার এই দুর্দশার কারণে এই মহানগরীর সাধারণ মানুষ আজ ভালো বই পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। গোটা দেশের চিত্রটি অবশ্য মর্মান্তিক। আজ একশোটি শস্তা ও রুচিহীন স্যাটেলাইট চ্যানেল আমাদের প্রতিটি বাড়ির

ড্রয়িংরুম দিয়ে ঢুকে বেডরুম-রান্নাঘর হয়ে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে অথচ বইকে আমরা তিনশো মাইল দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে তারস্বরে চিৎকার করছি—মানুষ বই পড়তে চাচ্ছে না। এটা কি বইয়ের প্রতি সুবিচার হল? এমন অবস্থা চলতে থাকলে দেশে কী করে সমৃদ্ধ মানুষ গড়ে উঠবে? জাতির মননশীলতা কী করে মজবুত হবে? বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমরা তাই দেশের প্রতিটি বাড়ির দোরগোড়ায় বই পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। জাতীয়ভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের পাশাপাশি সারা দেশে গড়ে তুলছি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি।

এই দৃষ্টিনন্দন লাইব্রেরিগুলো চারটি আলাদা আকারের—ছোট, ছোট-মাঝারি, মাঝারি ও বড়। এগুলোতে থাকে যথাক্রমে ৪০০০, ৭০০০, ১১০০০ ও ১৭০০০ বই। রাস্তার প্রশস্ততার ওপর নির্ভর করে কোন্ গাড়ি কোন্ রাস্তায় চলাফেরা করবে তা ঠিক করা হয়। প্রতিটি লাইব্রেরি প্রতি সপ্তাহে গড়ে শহর ও গ্রাম-এলাকার ৩০টি পাড়ায় গিয়ে প্রতিটিতে আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা বা দুঘণ্টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে সদস্যদের মধ্যে বই দেওয়া-নেওয়া করে। সপ্তাহের কোন্ দিনে কটার সময় কোন্ গাড়ি কোন্ পাড়ায় কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। লাইব্রেরি কর্মসূচি চালু করার আগেই স্থানীয় পাঠকদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এই লাইব্রেরির সদস্য করে নেওয়া হয়। অবশ্য পরেও সদস্যকরণ প্রক্রিয়া নিয়মিতভাবে চলতে থাকে।

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিকে সারাদেশের সবখানে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রতিটি জেলা-শহরে থাকবে দুই থেকে তিনটি করে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি। এরা সপ্তাহে এক থেকে দুদিন জেলা-শহরটির পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে পাঠকদের মধ্যে বই দেওয়া-নেওয়া করবে। সপ্তাহের বাকি দিনগুলোয় জেলা-শহর থেকে বেরিয়ে প্রতিটি উপজেলা শহর, ইউনিয়ন হয়ে জেলার সংযোগকারী রাস্তাগুলোর দুপাশের ছোট ছোট শহর, গঞ্জ-বাজার-হাট-স্কুল-কলেজ ইত্যাদির পাঠকদের ভেতর বই দেওয়া-নেওয়া করবে। ক্রমান্বয়ে দেশের মোট ৬০০০টি লোকালয়ে সপ্তাহে একবার করে বই নিয়ে পাঠকের দরজায় যাবে এ-লাইব্রেরি, অর্থাৎ সারাদেশে প্রায় ৬০০০ লাইব্রেরির কাজ করবে।

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি এক এক করে দেশের চারটি বড় শহরে প্রথমে চালু করা হয়েছে। শহরগুলো হল ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী। ঢাকা শহরে চালু করা হয়েছে ৫টি লাইব্রেরি, চট্টগ্রামে একটি লাইব্রেরি, রাজশাহী ও খুলনায় একটি করে লাইব্রেরি। ২৬০০০ পাঠক এই লাইব্রেরিগুলোতে সদস্য হয়েছে। অচিরেই শহরগুলোতে আরও ৮টি লাইব্রেরি চালু করা হবে।

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির আওতায় ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে দেশের ৪২টি জেলায় ২৬টি লাইব্রেরি চালু করা হচ্ছে। লাইব্রেরিগুলো ঐ ৪২টি জেলা-

শহরসহ প্রায় ১৫০টি থানায় কার্যক্রম পরিচালনা করবে। আশা করা যাচ্ছে এই লাইব্রেরিগুলোর সদস্যসংখ্যা হবে কমপক্ষে ৪০০০০।

প্রথমে আশঙ্কা ছিল ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি আদৌ সফল হবে কি না। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এ নিয়ে যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও আগ্রহ দেখা গেছে তাতে দ্বিধার অবসান হয়েছে। এর জনপ্রিয়তার একটি প্রমাণ এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে আমাদের দেশের বিভিন্ন জেলা বা থানা পর্যায়ে যে-ক-টি লাইব্রেরি রয়েছে তার (হাতে-গোনা কয়েকটি বাদ দিলে) অধিকাংশ লাইব্রেরিতেই প্রকৃত পাঠকসংখ্যা খুবই কম। পাঠক-রেজিস্টারে তাদের সংখ্যা একশো কি দুশো দেখা গেলেও যারা নিয়মিতভাবে চাঁদা দিয়ে বই নিচ্ছে তাদের আসল সংখ্যা পাঁচ-সাত থেকে দশ-পনেরো জনের বেশি নয়। এ থেকে আমাদের ধারণা, বাংলাদেশের দুশো লাইব্রেরিতে নিয়মিত পাঠকের সংখ্যা দেড় থেকে দু-হাজারের বেশি হবে না। অথচ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির একটি বড় আকারের গাড়িতেই এ-ধরনের নিয়মিত পাঠকের সংখ্যা তিন হাজারের বেশি। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা শহরের আটটি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিতে ২৬ হাজার সদস্যের মধ্যে ১৬ হাজারের মতো সদস্য নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করে বই পড়ে।

এই সাফল্য ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির ব্যাপারে আমাদের আশান্বিত করে তুলেছে এবং এরই ফলে আমরা সারাদেশে এই লাইব্রেরি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের ধারণা, দেশের প্রতিটি জেলায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি চালু হলে প্রায় তিন লক্ষ পাঠক বইপড়ার সুযোগ পাবে। লাইব্রেরি-সদস্যরা যখন বাড়িতে বই নিয়ে যায় তখন তারাই যে শুধু সেসব বই পড়ে তা নয়, তাদের পরিবারের আরও অনেকে এমনকি পাড়া-প্রতিবেশীরাও তা পড়ে। এ থেকে আমাদের ধারণা, আসল সদস্য তিন লক্ষ হলেও অন্তত চার-সাড়ে চার লক্ষ মানুষ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির পাঠক হবে। আমরা যেন না ভুলি যে এক লক্ষ ফুটবল-দর্শক আর এক লক্ষ পাঠক এক জিনিস নয়। একজন পাঠক একজন চিন্তাশীল, মননশীল মানুষ। তিনি একজন ছোট মাপের দার্শনিক। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জাতির তথা মানবসমাজের দিকনির্দেশক তিনি। কাজেই ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির পাঠকসংখ্যা সাড়ে চার লক্ষ হওয়া একটা বিরাট ঘটনা। অনেক উজ্জ্বল ও আলোকিত মানুষ-জন্মের সম্ভাবনা নিহিত থাকবে এই কার্যক্রমের ভেতর।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সূচনার সময়েই, ১৯৮৩ সালে আমরা একটি সম্পূর্ণ লাইব্রেরি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম। অনেক শ্রমে গড়েও উঠেছিল সে-লাইব্রেরি। কিন্তু পাঠকের পদপাত সেখানে আশানুরূপ হয়নি। এর কারণ আমরা খুঁজে বের করেছিলাম। আমরা দেখেছিলাম পাঠকের বাড়ি থেকে লাইব্রেরির দূরত্ব, যাতায়াতের অসুবিধা, যাতায়াত-ব্যয় এসব ছাড়াও আরও যে-কারণটি এর পেছনে

রয়েছে তা হল দেশে পড়াশোনার সংস্কৃতি গড়ে না-ওঠা। আমরা বুঝেছিলাম চারপাশে ক্রেতা আছে কি না তা জরিপ না-করেই আমরা দোকান খুলে বসেছি। তখন আমরা ঠিক করেছিলাম আমাদের এগিয়ে যেতে হবে অগ্রাসী লাইব্রেরি-আন্দোলনের পথে। কবে পাঠক আমাদের দরোজায় এসে দাঁড়াবে তার জন্য বসে না-থেকে আমরাই বই নিয়ে হাজির হব তাদের দরোজায়।

কিন্তু কথা হল : পাঠক তো ছড়িয়ে আছে সারাদেশে, কোথায় তাদের পাওয়া যাবে একসঙ্গে? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা দেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হাজির হবার চেষ্টা করেছি। এবার যাচ্ছি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির মাধ্যমে দেশের প্রতিটি লোকালয়ে। এর সঙ্গে আর একটি কথাও মনে হয়েছে আমাদের। আমাদের ছেলেবেলায় প্রতিটি পাড়ায় ছিল একটি করে লাইব্রেরি আর তাকে কেন্দ্র করে সক্রিয় ছিল প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক জীবন। আমরা তো এই ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিগুলোর মাধ্যমে পড়াশোনার পাশাপাশি সেই সাংস্কৃতিক জীবনটাকেও ফিরিয়ে আনতে পারি। যদি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি থেকে শুধুমাত্র বই নিয়ে সভোরা পড়াশোনা করে তবে তারা তো কেবল জনকতক যোগাযোগহীন ও বিচ্ছিন্ন পাঠক হয়ে রইল। কিন্তু আমরা যদি অনুঘটক হয়ে প্রতিটি পাড়া বা লোকালয়ের পাঠকদের দিয়ে একটি করে সাংস্কৃতিক সংঘ গড়ে দিতে পারি তবে তা কেবল তাদের মননজগতের নয়, তাদের সামগ্রিক জীবনবিকাশের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমরা সেই প্রক্রিয়া বেশ কিছুদিন হয় শুরু করেছি। এর সাফল্যও ঘটেছে ব্যাপকভাবে। এরই মধ্যে গড়ে উঠেছে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির বহুসংখ্যক সাংস্কৃতিক শাখা। আমাদের ধারণা, সারাদেশে এই চেষ্টা সফল হলে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরিও, দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের মতোই, কেবল মননজগতের বিকাশ ঘটাবে না, পুরো সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরই সূচনা করবে।

খ. ঢাকায় একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি

দেশের রাজধানীতে একটি বৃহদায়তন লাইব্রেরি গড়ে তোলা এবং তার মাধ্যমে বাড়িতে বই নিয়ে পড়ার সুযোগসুবিধার পাশাপাশি উচ্চতর জ্ঞানচর্চার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য ঢাকাস্থ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কার্যালয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এই লাইব্রেরি। ঢাকা মহানগরীতে বাড়িতে বই নিয়ে পড়ার সুবিধাসম্পন্ন লাইব্রেরির অভাবের পরিপ্রেক্ষিতেও এটি গড়ে তোলার কথা বেশি করে ভাবা হয়েছিল। এরই মধ্যে এই লাইব্রেরিতে সংগৃহীত হয়েছে এক লক্ষের মতো বই। ২০০৮ সালের মধ্যে এই লাইব্রেরির গ্রন্থসংখ্যা ২ লক্ষে উন্নীত করার কর্মসূচি রয়েছে। এই লাইব্রেরির নিয়মিত সদস্য ৪০০০। এ ছাড়াও বার্ষিকভাবে প্রায় ১০০০০ পাঠক-পাঠিকা এই লাইব্রেরির পাঠকক্ষ ব্যবহার করে উপকৃত হয়।

গ. সারাদেশে সুনির্বাচিত বই-সংবলিত ২০০টি ছোট আকারের লাইব্রেরি স্থাপন

একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করা গেছে দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রম চালাতে গিয়ে। এই কার্যক্রমের স্কুল ও কলেজ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে ছেলেমেয়েরা পড়ার সুযোগ পায় মোট ১১২টি বই। এ ছাড়া অতিরিক্ত পাঠের সুযোগ হিশেবে দেওয়া থাকে ৬৩টি বই। অর্থাৎ সব মিলে সাত বছরে ১৭৫টি বই। কিন্তু দেখা গেছে এতে তাদের অনেকের বইপড়ার আগ্রহ তো শেষ হয়-ই না বরং আরও প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। বই-এর অফুরন্ত ক্ষুধায় পেয়ে বসে তাদের। এই বইগুলো পড়ার মধ্য দিয়ে তাদের ভেতর যে-জ্ঞানগ্রাহী মানুষের জন্ম হয় তার প্রেরণায় তারা এইসব বইয়ের পাশাপাশি আরও নানাধরনের বই নিজেরাও খুঁজে নিয়ে পড়তে শুরু করে। বইপড়ার এই আকৃতি জাগিয়ে রাখার জন্য তাদের হাতে এই সময় ভালো বই নিরন্তরভাবে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা জরুরি। তাদের এইসব বই যোগান দেওয়ার জন্য দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের সফল শাখাগুলোতে ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে সুন্দর, রুচিশীল ও সুনির্বাচিত ২০০০ বই-এর একটি করে ছোট লাইব্রেরি। এগুলো গড়ে তোলা হচ্ছে কেন্দ্রের জাতীয়ভিত্তিক লাইব্রেরি কার্যক্রমের আওতায়। জাতীয়ভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের মোট ২০০ শাখায় এই ধরনের লাইব্রেরি গড়ে তোলা হবে। দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের সদস্যরা ছাড়াও এই লাইব্রেরিগুলো স্থানীয় পাঠকদের জন্য নিয়মিত বই পঠনপাঠনের সুযোগ অবারিত রাখবে। এ-পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে একরূপ ৪০টি লাইব্রেরি। আশা করা যায় ২০০৮ সাল নাগাদ এই লাইব্রেরিগুলো স্থাপিত হয়ে গেলে তা সারাদেশে প্রায় ৩০০০০ পাঠক-পাঠিকার উৎকর্ষচর্চার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে।

৪. প্রকাশনা কার্যক্রম

জাতীয় চিত্তকে দীপান্বিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রের আরও একটি কার্যক্রম রয়েছে। এটি হল প্রকাশনা কার্যক্রম। এই কর্মসূচির আওতায় বাংলা ভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ভাষার শ্রেষ্ঠ বইগুলো প্রকাশ করে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনটি সিরিজের আওতায় বইগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। সেগুলো হল :

ক. চিরায়ত গ্রন্থমালা
খ. চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
গ. কিশোর সাহিত্য গ্রন্থমালা।

ক. চিরায়ত গ্রন্থমালার আওতায় প্রকাশ করা হচ্ছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বইগুলোর অনুবাদ।

আমাদের দেশে ইংরেজিভাষার পঠনপাঠন গত তিরিশ বছরে বেশ কমে গেছে। অথচ পৃথিবীর জ্ঞানজগতের শ্রেষ্ঠ বইগুলো আজও বাংলাভাষায় অনূদিত হয়নি। ফলে মানবসভ্যতার উচ্চতর জ্ঞানজগতে প্রবেশ ও পঠনপাঠনের পথ আমাদের জন্য প্রায় বন্ধ হয়ে রয়েছে এবং বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের কার্যকর যোগাযোগ হারিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে চিরায়ত গ্রন্থমালার আওতায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলি ও রচনা-সম্পদকে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র। এরই মধ্যে এ-ধরনের একশো অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিতও হয়েছে। ২০০৭ সাল থেকে ব্যাপক কর্মসূচির আওতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ৭৫০টি বই অনুবাদ ও প্রকাশের ২৫ বছর মেয়াদি একটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হচ্ছে। এরই সঙ্গে ইতিপূর্বে বাংলাভাষায় বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বইগুলোকে এই প্রকল্পের আওতায় প্রকাশ করে জনসাধারণের কাছে সুলভ করে রাখার কাজও চলবে।

খ. চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালার আওতায় এযাবৎ প্রকাশ করা হয়েছে বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো—এই ভাষার সেরা লেখকদের সবচেয়ে সুন্দর, রক্তিম ও অনবদ্য বই ও রচনাসম্ভার। শুধুমাত্র উন্নতমানের বিদগ্ধ পাঠকদের জন্য এগুলো বের করা হচ্ছে না; বের করা হচ্ছে সেইসব নতুন ও প্রাথমিক পাঠকদের কথা ভেবে যারা জানার আনন্দময় জগতে নতুন পা রেখেছে। আমাদের আশা বাংলাভাষার অনন্যসাধারণ লেখকদের সবচেয়ে সজীব রক্তিম ও উষ্ণ লেখাগুলো পড়ার মাধ্যমে তারা জ্ঞান, শিল্প এবং পড়ার আনন্দে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে। আসলে চিরায়ত বাংলা সাহিত্যের নতুন পাঠকসমাজ গড়ে তোলা এ-সিরিজটির মূল উদ্দেশ্য। তবে অগ্রসর পাঠকেরাও এগুলোর দ্বারা একইরকম উপকৃত হবেন।

গ. কিশোর সাহিত্য গ্রন্থমালার আওতায় বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ভাষার কিশোরসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে।

এ ছাড়াও বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ লেখাগুলোকে ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার লক্ষ্যে একটি বড় ধরনের উদ্যোগের কথাও সম্প্রতি ভাবা হচ্ছে।

এ-পর্যন্ত প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় প্রকাশিত হয়েছে প্রায় পৌনে তিনশো বই। ২০০৭ থেকে প্রকাশনা কার্যক্রমকে ব্যাপকভিত্তিতে সম্প্রসারিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৫. শ্রবণ-দর্শন বিভাগ

শ্রবণ-দর্শন বিভাগের মাধ্যমে কেন্দ্রের দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের সদস্য ছাড়াও কেন্দ্রের অন্যান্য কর্মসূচির সভ্যদেরও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র দেখার ও শ্রেষ্ঠ সংগীত শোনার ব্যবস্থা রয়েছে কেন্দ্রে এবং তাদের চেতনাজগৎ, শৈল্পিক বোধ ও রুচিকে উৎকর্ষময় করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ক. সংগীত বিভাগ

১. এই বিভাগের আওতায় ঢাকাস্থ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কার্যালয়ে একটি সংগীত-শ্রবণ কর্মসূচি চালু রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ভাষার শ্রেষ্ঠ সংগীতের সংগ্রহ-সম্বলিত একটি সংগীত-লাইব্রেরি রয়েছে এখানে, আর রয়েছে সেসব সংগীত শ্রবণের সুযোগ।

ঢাকাস্থ দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের সদস্য এবং সাধারণ সংগীতপিপাসু ও আগ্রহী শ্রোতারা এইসব সংগীত শ্রবণের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। প্রতিদেশের প্রখ্যাত গায়ক, সুরকার ও সংগীত-অঙ্গনের প্রতিভাবান ব্যক্তিরা কেন্দ্রের এই লাইব্রেরি ব্যবহার করে তাঁদের সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ নিয়ে থাকেন।

২. সংগীত-শ্রবণ কর্মসূচির আওতায় কেন্দ্রের দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের শাখাগুলোয় ক্রমান্বয়ে সংগীত-শ্রবণ কর্মসূচি চালু করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বেশকিছু শাখায় এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

খ. চলচ্চিত্র শাখা

শ্রবণ-দর্শন বিভাগের ভিডিও শাখার আওতায় বর্তমানে যেসব কর্মসূচি চলছে তা নিম্নরূপ :

১. চলচ্চিত্র চক্র : এই বিভাগের আওতায় ঢাকাস্থ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে সক্রিয় রয়েছে একটি চলচ্চিত্র চক্র। এই চক্রের আয়োজনে সদস্য ও আগ্রহীদের বছরে ২০০টি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ রয়েছে।

চলচ্চিত্রের গভীর অনুধাবন ও রসাস্বাদনের ভেতর দিয়ে বিদগ্ধ দর্শক গড়ে তোলা এই চক্রের উদ্দেশ্য।

২. চলচ্চিত্র রসাস্বাদন (অ্যাপ্রিসিয়েশন) কোর্স : এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর দুটি থেকে তিনটি চলচ্চিত্র রসাস্বাদন কোর্স আয়োজিত হয়। এই কার্যক্রমকে প্রসারিত করে ভবিষ্যতে অনানুষ্ঠানিক ভিত্তিতে চলচ্চিত্রের নির্মাণ ও রসাস্বাদন-সংক্রান্ত উচ্চতর পঠনপাঠনের সুযোগসুবিধা গড়ে তোলা হবে।

৩. চলচ্চিত্র উৎসব কর্মসূচি : এই কর্মসূচির উদ্যোগে দেশভিত্তিক কর্মসূচির ৫০০ শাখার প্রতিটিতে প্রতি তৃতীয় বছরে একটি করে চলচ্চিত্র-উৎসব আয়োজিত হয়। এতে কেন্দ্রের শাখাগুলোর সদস্যরা ছাড়াও স্থানীয় সুধীসমাজ অবারিতভাবে আমন্ত্রিত হন। দেশের ব্যাপক জনসাধারণকে চলচ্চিত্রের উন্নত আঙ্গিকের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলাই এই উৎসবগুলোর লক্ষ্য।

৬. অনুষ্ঠান বিভাগ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অন্যতম প্রাণবন্ত বিষয় হল এর অনুষ্ঠান বিভাগ আয়োজিত উন্নতমানের অনুষ্ঠানগুলো। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মননশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ঢাকাস্থ অনুষ্ঠান বিভাগ উচ্চপ্রশংসিত। প্রতিবছর ঢাকাস্থ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মিলনায়তনে আয়োজিত হয় অন্তত ৩০টি উপভোগ্য অনুষ্ঠান।

এছাড়াও দেশভিত্তিক কার্যক্রম ও ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির সাংস্কৃতিক শাখাগুলোয় ব্যাপকভাবে আয়োজিত হয় বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এগুলোতে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সংখ্যা বিপুল। বছরে এর সংখ্যা ৪০০০টির কম নয়। এই কর্মসূচিটি কেন্দ্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি।

৭. অন্যান্য

এসব ছাড়াও কেন্দ্র আর যেসব গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে তার কয়েকটি হল :

ক. বাঙালির চিন্তা কর্মসূচি,
খ. বিরল গ্রন্থ কর্মসূচি,
গ. ইংরেজি শিক্ষা কর্মসূচি।

ক. বাঙালির চিন্তা কর্মসূচি : এই কর্মসূচির আওতায় গত দুশো বছর ধরে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীরা শিক্ষা, ধর্ম, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ ইত্যাদি ১৮টি বিষয়ে যেসব মৌলিক চিন্তা করেছেন সেগুলোকে ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করে প্রতিটি বিষয়ের মূল্যবান রচনাসম্ভারকে বহু খণ্ডে প্রকাশ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ চার বছর ব্যাপক পড়াশোনা চালিয়ে এই কর্মসূচির ১৮ জন সম্পাদক নিজ-নিজ বিষয়ের পঠনপাঠন সমাপ্ত করেছেন। এখন ১৭৫ খণ্ডে ৬৮,০০০ পৃষ্ঠার এই আকরিক মহাগ্রন্থটি প্রকাশের পর্যায়ে এসে পড়েছে।

খ. বিরল গ্রন্থ কর্মসূচি : লাইব্রেরি কার্যক্রমের একটি কর্মসূচি। বাংলাভাষার যেসব মূল্যবান বই পুনর্মুদ্রণের অভাবে সম্প্রতি বিরল হয়ে আসছে সেগুলোকে বিভিন্ন সূত্র থেকে ফটোকপির মাধ্যমে সংগ্রহ করে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লাইব্রেরির 'বিরল গ্রন্থ' শাখায় সংরক্ষণ করা হয়। এইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রকাশিত যাবতীয় বইয়ের একটি সংগ্রহ গড়ে তোলা হচ্ছে এই কর্মসূচির আওতায়।

গ. ইংরেজি শিক্ষা কর্মসূচি : উঁচুমানের ইংরেজিশিক্ষায় আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন। এই কর্মসূচির আওতায় ইংরেজিসাহিত্যের ২০টি

অনিন্দ্য বই পড়ার ভেতর দিয়ে সহজ ও উপভোগ্যভাবে সম্পূর্নমানের ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। একজন ছাত্র বা ছাত্রী ঐ ২০টি বই ক্রমান্বয়ে পড়ার ভেতর দিয়ে সাহিত্যপাঠের আনন্দের পাশাপাশি ইংরেজিভাষায় ভালোরকম দখল অর্জন করতে পারবে।

উপসংহার

আগেই বলেছি দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যায় আলোকিত, কার্যকর ও উচ্চমূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা, জাতীয় শক্তি হিশেবে তাদের সংঘবদ্ধ ও সমুন্নত করা এবং জাতীয় চিত্তের সার্বিক আলোকায়ন ঘটানোর লক্ষ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিয়োজিত। জাতীয় জীবনে উচ্চায়ত চৈতন্য ও আলোকের পদপাত আজ ঘটাতেই হবে যদি একটা বড় দেশ আর বড় জাতি গড়ার কথা আমরা ভাবি। ক্ষুদ্র মানুষ আর বড় জাতি একসঙ্গে থাকতে পারে না। কিন্তু একটি জাতির বৈষয়িক প্রবৃদ্ধির মতো তার চিত্তের সমৃদ্ধি রাতারাতি ঘটানোর কোনো পথ নেই। এটা কোনো সামাজিক টিউবওয়েল নয় যে, একদিক থেকে চাপ দিলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে পানি ছলকে উঠবে। আত্মিক বিকাশের গতি চিরকাল মন্থর ও দীর্ঘমেয়াদি। তার যাত্রা রহস্যালোকিত। মানবজীবনের চেতন-অবচেতনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অসংখ্য ছায়াঢাকা অনুষঙ্গের অন্ধকার পথে তার যাত্রা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আজকের স্বপ্ন, চেষ্টা ও আয়োজনের পথ ধরে আগামীতে যদি দেশের সবখানে শুভ্র শুভ্র প্রদীপের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত আলোকিত সন্তানেরা জন্ম নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারে, তবে, অনেক পরে, একদিন, ঐসব মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন, উদার ও প্রগতিশীল মানুষের উৎকর্ষমণ্ডিত বেদনাবান হৃদয়, নিজ-নিজ কর্মজীবনের বিচিত্র উদ্যোগ ও নির্মাণের ভেতর দিয়ে যে-দেশ ও জাতিকে রচনা করবে তা সমুদ্ধতর হবে বলেই আশা করি।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিসে পেরিক্লিসের আমলে এথেন্সের যুবকদের আঠারো বছরে পদার্পণ উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে একটি শপথবাক্য উচ্চারণ করতে হত। সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হত : 'আমি সারাজীবনে এমন কিছু করে যাব যাতে জন্মের সময় যে-এথেন্সকে আমি পেয়েছিলাম মৃত্যুর সময় তার চেয়ে উন্নততর এথেন্সকে পৃথিবীর বুকে রেখে যেতে পারি।' আমাদের চেয়েও তেমনি এক উন্নততর বাংলাদেশেরই জন্য।

পরিশিষ্ট

একলক্ষ আলো হাতে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন : আনিসুল হক

বাতিওয়ালা, স্মৃতির শহরের সেই জাদুকরি লোকটা।
যখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়, চরাচর ছেয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে,
লোকটা তখন আলো হাতে চলেছে এক স্তম্ভ থেকে আরেক স্তম্ভে, জ্বেলে দিচ্ছে
বাতি। আকাশ থেকে অন্ধকার নামছে নিচের দিকে, যবনিকার মতো ; আর
লোকটা মইয়ের সাহায্যে নিচ থেকে উঠছে উপরে, আলোকস্তম্ভের চূড়ায় চূড়ায়।
অন্ধকারের বিরুদ্ধে, পতনের বিরুদ্ধে এই এক প্রতীক্ষমানবের প্রতীকসংগ্রাম।

আমাদের বৈদ্যুতিক আলোর (ও লোডশেডিংয়ের) এ শহরে আর-কোনো বাতিওয়ালা নেই। কিন্তু আছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। একলক্ষ আলো হাতে নিয়ে যিনি চলেছেন বাংলাদেশের তরুণ প্রাণপ্রদীপগুলোর কাছে। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই; নিয়তিতাড়িত বাতিওয়ালার মতোই যেন তাঁর এই ভবিতব্য। মানুষের প্রাণে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া। আলোকিত মানুষ গড়ে তোলা। আলোকিত মানুষ চাই। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, 'বাংলাদেশ একটা নতুন দেশ। এখন এর নির্মাণের সময়। নির্মাতা প্রয়োজন। একজন দুজন নয়, চাই সহস্র লক্ষ নির্মাতা। চাই আলোকিত মানুষ, সম্পন্ন মানুষ। আমরা ৫০০ জায়গা থেকে চেষ্টা করছি সেই আলোকিত মানুষ গড়ে তোলার।'

তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল ১১ অক্টোবর '৯৭ সকালে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিজস্ব ভবনের দোতলায়, বারান্দা-কাম তার বসার ঘরটায়। তিনি যখন কথা বলছিলেন, তাঁর মুখমণ্ডলে এসে পড়েছে এক অপার্থিব আলো, যার নাম স্বপ্ন। তিনি কথা বলছিলেন স্বপ্নের অন্যপার থেকে। যেন তাঁর সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ তিনি দেখতে

পাচ্ছেন। সহস্র-লক্ষ আলোকিত মানুষ গড়ে উঠছে, শুরু করেছে কর্মযজ্ঞ, ঘুচিয়ে দিচ্ছে দেশমাতার মলিন বেশ।

না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে

সকাল ১০টায় স্যারের থাকার কথা ছিল তাঁর বাসায়। সেখা গেল তিনি নেই। কেন্দ্রে গেছেন। বাসা থেকে কেন্দ্র, পদব্রজে পাঁচ মিনিট। কেন্দ্রের মিলনায়তনের বাইরে বারান্দায় অগণিত জুতা, স্যান্ডেল। ভিতরে ছেলেমেয়েরা বসে আছে গালিচায়। স্যার ক্লাস নিচ্ছেন। আবৃত্তি-কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস।

স্যারের লেকচার শোনার লোভে ক্লাসে ঢুকে পড়া গেল। এসএসসি, এইচএসসি কিংবা তার ওপর-ক্লাসের ছেলেমেয়েরা বসে আছে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার দিকে। তিনি একটা কঠিন জিনিশ পড়াচ্ছেন। কবিতার রস, কাব্যরস। চিনি মিষ্টি, কিন্তু তার কেমিক্যাল সংকেতটা কঠিন। কবিতা শুনে মজা লাগতে পারে, কিন্তু কাব্যরস আলোচনাটা মজার হওয়ার কোনো কারণ নেই।

হি হি হি হি। হাসির ঢেউ বয়ে গেল। সব ছেলেমেয়েরা গড়িয়ে, বাঁদিকে পড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ না-যেতেই হাসির আরেক ঢেউ আছড়ে পড়ল, হাসির ধাক্কায় তরুণ শিষ্যদল হেলে পড়ল ডানে। স্যার বলে চলেছেন কবির বেদনার কথা—

না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা
বিদায়ের আগে দুচারিটি কথা
রেখে যাব সুমধুর।

(পুরস্কার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শ্রোতারা ঢুকে গেল ভাবের গভীরে। আশ্চর্যরকম প্রাণবন্ত স্যারের ক্লাস। বোঝা যাচ্ছে কেন বন্ধুদের কাছে শুনেছি ঢাকা কলেজে স্যারের লেকচারের খ্যাতি। ওই লেকচার শুনতে বন্ধুরা অন্য ক্লাস ফাঁকি দিয়ে, কখনো-কখনো ঢাকার অন্য কলেজ থেকে ছুটে যেত স্যারের ক্লাসে। টিভি-উপস্থাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে চেনা যাবে না। তরুণ শ্রোতা সংঘের সামনে তিনি অফুরান, খরাট, অনন্ত প্রাণধারার জীবন্ত উৎস। (এর তুলনায় উপস্থাপক সায়ীদ যেন ঘড়ায় তোলা জল)।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এখন

ঢাকার বাংলামোটরের কাছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন। গাছগাছড়ায় ঢাকা। লাল সিরামিক ইটে বানানো খানিকটা কুটিরশিল্প ধরনের বিল্ডিং। এখানেই তার লাইব্রেরি, এখানেই পরিচালিত হয় ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ও কর্মসূচিগুলো। সারাদেশে ৩২৮টি শাখা আছে। ৬২ হাজার ছেলেমেয়ে এ-শাখাগুলোর মাধ্যমে বই পড়ে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়-উত্তর ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের জন্য দেশের বড় শহরগুলোতে আছে আলাদা উৎকর্ষ কার্যক্রম। পৃথিবীর ও বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ বইগুলো বাংলাভাষায় প্রকাশ করার জন্য আছে প্রকাশনা কার্যক্রম। এখানে আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংগীত শোনার ও শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলো দেখার ব্যবস্থা। ঢাকাসহ সারাদেশে প্রতিবছর অন্তত ৫০০০টি মননশীল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

মানে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বড় হয়েছে। সুবিস্তৃত এর কার্যক্রম। ১৯৯৭-৯৮ সালে এর বাজেট ১ কোটি টাকা। যদিও স্যার জানেন, ৫০ লাখ টাকার বেশি তাঁরা হয়তো জোগাড় করে উঠতে পারবেন না।

এতবড় একটা সংগঠন গড়ে উঠল কীভাবে? বাংলাদেশে সন্দেহ করার, সমলোচনা করার লোকের অভাব নেই। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিয়েও অনেকের মনে এখনো সন্দেহ। সন্দেহ এর অর্থের উৎস নিয়ে। কেউ ভাবে এটা এনজিও, কেউ ভাবে বিদেশি এজেন্টদের কারসাজি। কেউ ভাবে রাজনীতি। আসলে কিন্তু এটা এক একরোখা স্বপ্নবান মানুষের কাঁটাময় পথে রক্তাক্ত পায়ে হেঁটে যাওয়া। মানুষের দ্বারে-দ্বারে ঘুরে দেশি মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে তাঁরা গড়ে তুলেছেন একে। তার সঙ্গে এখন যুক্ত আছে সরকারের সাহায্য। এ-বছর সরকারি বরাদ্দ ২৪ লাখ টাকা। এনজিও ব্যুরো-তালিকায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে ভুক্ত করা হয়েছে বটে, কিন্তু এরা বিদেশি সাহায্য নিতে চান না। 'বিদেশি বইয়ের অনুবাদ প্রকাশের মতো ক্ষেত্রগুলোতেই কেবল বিদেশী সাহায্য আমরা নেব'—আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন। 'এ-পর্যন্ত কেন্দ্রের বার্ষিক ব্যয়ের শতকরা পাঁচ-ছয় ভাগের বেশি বিদেশি সাহায্য নেয়া হয়নি'—তিনি জানান। তাদের নিজেদেরও কিছু আয় আছে—মিলনায়তন ভাড়া দিয়ে, কম্পিউটারে বাইরের কাজ করে বা প্রকাশনা বিভাগ থেকে যা আসে। এছাড়া আছে নানান লোকহিতৈষী ব্যক্তি আর প্রতিষ্ঠানের অনুদান। কেন্দ্রের ট্রাস্টি বোর্ড পাঁচজনের। অন্য চারজন হলেন মোহাম্মদ ফরিদউদ্দিন, এ কে এম রফিকউদ্দিন, লুৎফর রহমান সরকার, মাহবুব জামিল।

জ্ঞানের বিহনে প্রেম নাই

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, বোঝা যাচ্ছে, আজ বড়সড় হয়েছে। এর চেয়েও বড় হবে চলেছে অদূর ভবিষ্যতে। কিন্তু এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়া যায়, গড়ে তোলা উচিত—এ-ধারণাটা মাথায় এল কীভাবে? আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন : "এ ধারণাটা প্রথমে মাথায় আসেনি। শুরুটা হয়েছিল সম্পূর্ণ আলাদাভাবে। আমি জড়িত ছিলাম ষাটের দশকের সাহিত্য-আন্দোলনের সঙ্গে। সে আন্দোলনে আমরা অনেক মেধাবী লেখক এক হয়েছি, উন্মাদনার মধ্যদিয়ে একটা সাহিত্যযাত্রাও সংঘটিত হয়েছে। আমাদের মধ্যে যে-আগ্রহ, বন্ধুত্ব ও উন্মাদনা ছিল, একই রকম ছিল 'কল্লোল'-যুগেও। কিন্তু আমাদের সাফল্য কল্লোলের সমান হয়নি। আমি মনে করি না, প্রতিভার অভাবের জন্য এটা হয়েছে। আসলে আমরা হেরে গেছি জ্ঞানের অভাবে। কল্লোলের যাঁরা ছিলেন, তাঁদের জন্ম হয়েছিল বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিতে। আমরা জেগে উঠেছিলাম বাংলাসাহিত্যের প্রেক্ষাপট থেকে। তখন আমার মনে হয়েছিল আমাদের জাতির যে-কোনো সাফল্যের জন্য আমাদের চাই জ্ঞান, আরো জ্ঞান। আমাদের প্রেমের জন্যও জ্ঞান চাই। জীবনানন্দ দাশের একটা লাইন আমাকে তখন উদ্বুদ্ধ করেছিল : 'জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই'।"

তখন তিনি ছিলেন ঢাকা কলেজের শিক্ষক। কয়েকজন মেধাবী ছাত্র নিয়ে গড়ে তুললেন এক অধ্যয়ন-চক্র। নামধাম ছাড়া। এল মুক্তিযুদ্ধ। তারপর বঙ্গবন্ধুর ডাকে সোনার বাংলা গড়ার কাজ। দলটা ভেঙে গেল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝলেন, সোনা বানাতে হয় মানুষের শ্রম দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে—সোনা আপনাআপনি হয় না।

'৭৮-এর শেষে আবার বই-পোড়োদের নিয়ে দলগড়া। প্রতি সপ্তাহে একটা করে বই বাড়ি নিয়ে যাওয়া। যে কজন সভ্য, সে কটা বই কিনে প্রতি সপ্তাহে হাতে-হাতে বদলানো। তখন বই-কেনার চাঁদা চাইতে গিয়ে শুনলেন পথা প্রিন্টার্সের মালিক ইকবাল সাহেবের পরামর্শ : 'ঠিক আছে, আমি পাঁচ হাজার টাকা দেব, কিন্তু এভাবে তো হবে না, একটা প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে।' তখন থেকেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভাবনা কার্যকরভাবে আকার পেতে শুরু করেছে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ৬ মার্চ ১৯৮০-তে।

তো, ওই পাঠচক্রটা চলেছিল বছর-পাঁচেক। ২৫ জন সভ্য বছরে গড়ে প্রায় ৫০টা করে বই পড়েছিল পাঁচবছর ধরে। বই কী করল? তাদের জীবন, দৃষ্টি, মন ধীরে ধীরে কীভাবে পাল্টে দিল, অধ্যাপক সায়ীদ লক্ষ্য করলেন। তারা উদ্বুদ্ধ হল, নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল হল। কিন্তু তাঁর দুঃখ, তাঁদের হৃদয় খুব-একটা পাল্টাল না।

এবার তিনি ভাবলেন : না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়, আরেকটু কমবয়সী

ছাত্রদের নিলে হয়তো হৃদয়ের দিক থেকে আরো সুবিধা হবে। '৮৪ সালে কলেজের ছাত্রদের নিয়ে একবছরের একটা কার্যক্রম নিলেন তিনি। কী দেখতে পেলেন? দেখলেন, আশ্চর্য, এদের বুদ্ধিও উজ্জ্বল হল, হৃদয়ও বিকশিত হল।

এরপর স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজ। ঢাকার ভিসি বদিউর রহমানের কাছ থেকে দু লাখ টাকা নিয়ে। তিন হাজার ছেলেমেয়ে পড়ুক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বইগুলো। তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করুক। সপ্তাহে একটা দিন সমবেত হোক। বই নিক। 'দেখলাম স্কুলের ছেলেমেয়েরা হল একেকটা সোনার টুকরো।' এখন স্কুলছাত্রদের বইপড়া কর্মসূচি চলছে ৩২৮টা জায়গায়, খুব তাড়াতাড়ি এটা ৫০০-র কাছাকাছি নেওয়ার চেষ্টা চলছে।

নগরে তপোবন এই ভবনটি

শাহবাগ মোড় থেকে ভিআইপি সড়ক দিয়ে বাংলামোটরের কাছাকাছি এলে বাঁদিকে গলির মুখে বড় সাইনবোর্ড : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। গলিতে কিছুদূর এগোলে প্রথমে চোখে পড়ে এর অভ্যর্থনা-ঘরটা—সুরঞ্জনা।

এমন দামি জায়গায় এমন একটা ভবন, হেঁ হেঁ হেঁ, এটা হল কী করে? টাকা এল কোথা থেকে? সিআইএ দিল, নাকি কেজিবি? আমাদের চোখ টাটায়। মন পুড়ে যায়। মুখে সর্বজ্ঞের হাসি। জানি জানি, সব জানি। ধাক্কা।

স্যারকে বলি, স্যার এই ভবনটা পেলেন কী করে?

জায়গাটা ছিল পরিত্যক্ত সম্পত্তি, একাত্তরে পলাতক পাকিস্তানিদের। পূর্ত মন্ত্রণালয় ছিল এর মালিক। সেখান থেকে এটা ব্যবহারের মালিকানা পায় নগর-করপোরেশন। নগর-করপোরেশনের কাছ থেকে এটা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কার্যালয় হিশেবে ব্যবহারের অনুমতি আদায় করা হয় নানা তদবির করে।

১৯৮৩ সালে পাওয়া যায় এ-জায়গাটা। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন : "আর্কিটেক্ট উত্তম তখন সবে পাস করে বেরিয়েছে, হাতে কাজ নেই। আমি বললাম, 'উত্তম, তুমি একটা প্লান করো'। উত্তম করে ফেলল। আমার হাতে তখন মাত্র ১০ হাজার টাকা। উত্তম বলল, 'স্যার আপনি কোদাল দিয়ে প্রথম কোপটা দেন।' আমি বললাম, 'না, উত্তম, তুমি তো আর্কিটেক্ট, এটা তোমার স্বপ্ন, তুমিই দাও।' উত্তম শুরু করল। আমি হাসি। আমার কাছে টাকা মোটে ১০ হাজার আর উত্তম দিচ্ছে কোপ। স্বভাবতই দালানের কাজ কিছুদূর উঠে আর উঠল না। তখন বিভিন্ন লোক এসে কিছু কিছু টাকা দিয়ে যেতে লাগলেন।

এর মধ্যে একদিন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত বিশিষ্ট শিল্পপতি সাইদুল হাসানের স্ত্রী একজন ভদ্রলোককে ধরে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোক ছোটখাটো। দেখে খুব-একটা আস্থা এল না। ওই ভদ্রলোক

আমাদের সবকিছু দেখে বললেন, আপনাদের দালানটা শেষ করতে কত লাগবে? আমি বললাম, দেড় লাখ। উনি বললেন, দেড় লাখে তো হবে না, দুই লাখ লাগবে। আপনি কালকে একজনকে পাঠিয়ে দেবেন, আমি চেকটা দিয়ে দেব। পরে ওই টাকা দিয়ে আমরা মিলনায়তনের বাকি অংশটা করি। ভদ্রলোকের নাম এন. এইচ. জাহেদ। তিনি ব্র্যাকের প্রধান ফজলে হাসান আবেদের বড়ভাই।"

তো, এসব করতে গিয়ে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে সরকারি অফিসে ধর্না দিতে হয়েছে। চাঁদার জন্য যেতে হয়েছে ধনীদের দ্বারে। সেসব কি কোনো সুখের অভিজ্ঞতা! তাঁর তবু ছিল জনপ্রিয় টিভি-উপস্থাপকের বর্ম।

বিভিন্ন সরকারের আমলে কেন্দ্রকে কম দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়নি। সরকার বাহাদুর সহজেই সব দুঃখকষ্ট নাশ করে দিলে আর তিনি বাহাদুর কেন? আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছেন : "স্বৈরাচারী সরকারের আমলে আমাদের দুঃখকষ্ট গেছে। জাতীয়তাবাদী দলের আমলেও যাচ্ছে। যে-প্রগতিশীল ধ্যানধারণায় আমরা বিশ্বাসী তার নিকটতর ধারক আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেও আমি জানি একই ঘটনা ঘটবে। ওই দলের চেয়ে আরো আলোকিত এবং আরো প্রগতিশীল কোনো দল ক্ষমতায় এলেও এর কোনো ব্যত্যয় হবে না। আমার ধারণা, কোনোদিন যদি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সরকারও ক্ষমতায় আসে, তবু এই দুর্দশাই চলবে।" (২৮.১০.৯৩/*আমার অনুভূতিতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র*)

সরকার সম্পর্কে এই উক্তি দুই আর দুইয়ে চারের মতোই ধ্রুব।

আর চাঁদা চাইতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা?

তিনি লিখেছেন : "দেশের উঠতি বড়লোকরা ছিল আমার পৃষ্ঠপোষক ও শিকার। ভালোমানুষ এদের মধ্যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তাদের অনেকেই সরল বিশ্বাসে সাহায্য করতে গিয়ে অনেক জায়গায় মুখ পুড়িয়েছেন। ফলে এদেশের তথাকথিত সমাজসেবীদের ওপর এদের অবিশ্বাস কুসংস্কারের মতো। একেকদিন একেকজনের সামান্য কথায় আচরণে নিজেকে এমন অসম্মানিত মনে হত যে প্রায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতাম। বিবমিষায় কয়েকদিন মাথা ঘোলাত। অনেকে আবার এমন ভাব করতেন যেন কেন্দ্রকে নয়, আমাকেই দিচ্ছেন টাকাটা। কেউ অফিসে টাকা নিতে আসতে বলে দিনের-পর-দিন ঘোরাতে থাকতেন। কেউ আমরা যারা সৎশিক্ষকের জীবনযাপন করতে চেষ্টা করেছি, হাজার হাজার ছাত্রের সামনে শ্রদ্ধার বেদিতে আজীবন অধিষ্ঠিত থেকেছি, তাদের পক্ষে, যতবড় দরকারেই হোক, এ-ধরনের অসম্মান সহ্য করা শক্ত।" শক্ত, কিন্তু করেছেন। করেই চলেছেন!

লোকটা পিছনে হেঁটে পুরস্কার পেয়েছিল যে!

পিছনে হেঁটে পুরস্কার

"আমি ছোটবেলায় পিছনদিকে দৌড় দিয়ে একটা প্রাইজ পেয়েছিলাম। থার্ড পুরস্কার, একটা চামচ। এ পুরস্কার দিয়ে আমি সারা পৃথিবীকে অস্থির করে তুলেছিলাম। কোনো মেহমান বাড়িতে এলে আমি ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে চামচটা মুখের সামনে এনে নাড়াচাড়া করতাম। উদ্দেশ্য, কেউ জিজ্ঞেস করুক, 'কী খোকা, তুমি চামচ নাড়ো কেন?' শিশুরা পুরস্কার পেলে তাদের আগ্রহ বেড়ে যায়। তাই ছেলেমেয়েরা বই পড়লেই আমরা তাদের কমবেশি পুরস্কার দিই। ৭টা বই পড়লে ১টা বই পুরস্কার দিই। ১০টা বই পড়লে ২টা দিই। ১৩টা পড়লে ৩টা, ১৬টা পড়লে ৪টা। আর কোনো শাখায় ১৬টা বইপড়া ১৫ জন থাকলে তাদের নিয়ে লটারি করা হয়। লটারিতে যার নাম ওঠে তাকে দেওয়া হয় এক হাজার টাকার বই। এভাবে পুরা ব্যাপারটা জমজমাট হয়ে ওঠে। ব্রিটিশরা যেভাবে আমাদের চা ধরিয়েছিল আমরা সেভাবে বই ধরাতে চাই।"

ঢাকার লাইব্রেরিতে তাঁদের আছে এক লক্ষাধিক বই। শাখাগুলোর লাইব্রেরিগুলো তিনি ঋদ্ধ করতে চান। স্বপ্ন দেখেন একটা মোবাইল লাইব্রেরির। "ঢাকায় তিনটি ইউনিট থাকবে। একটা গাড়িতে থাকবে ১২ হাজার বই, ঐ গাড়ি সপ্তাহের নির্দিষ্ট ক্ষণে নির্দিষ্ট এলাকায় দাঁড়াবে। প্রতিদিন তিন-চার জায়গায় যাবে গাড়িটা। সপ্তাহে যাবে ২৩টা এলাকায়। তিনটা গাড়ি যাবে ৬৯টা জায়গায়। এ সপ্তাহে এক গাড়ি যাবে, পরের সপ্তাহে যাবে অন্যটা। মোট ৩৬ হাজার বইয়ের সুবিধা পাবে পাঠক।"

আর তাঁর স্বপ্ন একটা ১২তলা সাংস্কৃতিক ভবন। মোট ৮ কোটি টাকা দরকার হবে। তাতে লাইব্রেরি, মিলনায়তন, শিশুকেন্দ্র, নাট্যমঞ্চ ইত্যাদি থাকবে। এটা হলে বছরে ১ কোটি টাকা আয় হবে। তখন, তাঁর ধারণা, প্রতিষ্ঠানটা স্থায়ী হবে। আর ওই ৮ কোটি টাকা? না, তিনি এটা বিদেশী তহবিল থেকে নেবেন না। পুরোপুরি দেশের ভেতর থেকে সংগ্রহ করা হবে। অধ্যাপক সায়ীদ বলেন, "আমরা ১৫০ জন লাইফ মেম্বার সংগ্রহ করছি, যারা প্রত্যেকে অন্তত এক লাখ টাকা করে দেবেন। এতে দেড় কোটি টাকা হবে। এ হলে বাকিটাও হবে।" হবে যে তাতে আর সন্দেহ করে লাভ নেই। সায়ীদ এত করে দেখিয়ে দিয়েছেন, সম্ভব। ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব এদেশে প্রতিষ্ঠান গড়া। এদেশ তো চিরকাল এনজিও আর মিশনারিদের দানে চলেনি, এই সমাজের নিজেরও একটা কল্যাণমুখী ঐতিহ্য ছিল। স্কুল বানানো, পুকুর কাটা ... । আর তাঁর প্রিয় বাণী, যেটা তিনি প্রায়ই লিখে দেন অটোগ্রাফ প্রার্থীদের—'মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়।'

লাল ইটের আনন্দ-বেদনা

তাঁর জন্ম ১৯৩৯-এ। এখন বয়স ৫৮। '৬২ সাল থেকে '৯২ পর্যন্ত সরকারি কলেজে শিক্ষকতা। তারপর ছেড়ে দিয়েছেন। শিক্ষক হয়ে যখন দেখেছেন নিষ্প্রাণ অর্থহীন শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার অধঃপতন—ছেড়ে দিয়ে দিয়েছেন এই চাকরি। কাজ করে চলেছেন। মূল্যায়ন করে দেখেননি, এই কাজে কী ফল মিলল। বলেন : "এটা তো সামাজিক নলকূপ নয় যে একদিকে চাপ দিলে অন্যদিক থেকে গলগল করে পানি ছলকে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মুকুল আসে কত কিন্তু আম হয় কটি' বোঝার উপায় নেই, কারা উজ্জ্বল হবে। আমি সবার জন্য এ কার্যক্রম চালাব। এই প্রক্রিয়া-যে সফল হবে তা বোঝা যাবে আর ১০ বছরের মধ্যেই। তখন শিল্পসংস্কৃতিতে যারা ভালো করবে তাদের ৬০ ভাগ হবে কেন্দ্রের কর্মসূচির।"

বলেন : "প্রথমে মনে করেছিলাম শুধু সাহিত্য দরকার। পরে দেখলাম শুধু সাহিত্য দিয়ে হয় না, বিদ্বান হলেই চলে না। হৃদয়টা বিকশিত করতে হবে। এজন্যে এখন নাম দিয়েছি : মৌলিক উৎকর্ষ কার্যক্রম। মৌলিক মানুষটাকে আলোকিত করে দেওয়া। তাকে সজাগ করে দেওয়া। বেদনার্ত করে দেওয়া। তারপর তাকে তার শক্তিতে এগিয়ে যেতে হবে। মৃত্যুর আগে গৌতমবুদ্ধকে অনুসারীরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখন আমরা কী করব? কোনদিকে যাব?' বুদ্ধ বলেছিলেন, 'নিজেই নিজের প্রদীপ হও।' এই-যে আমাদের কাছে ছেলেমেয়েরা আসছে, তাদের প্রত্যেকের ঘরে একটা করে লাইব্রেরি গড়ে উঠছে। বইপড়ার অভ্যাস গড়ে উঠছে। তারা চিন্তাশীল মানুষ হয়ে গড়ে উঠছে। এ সবই কি মিথ্যা হয়ে যাবে?"

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লাল ইটের ভবনে এইসব কথামালার স্রোতে ভাসতে ভাসতে তিনি দুহাতে লাইফবোটের মতো আঁকড়ে ধরে থাকেন বইগুলি।

বইয়ে এক জায়গায় লিখেছিলেন : "কেন্দ্রের লাল ইটের দেয়ালগুলো আমরা কোনোদিন প্লাস্টার করব না। এই কেন্দ্র-যে আমাদের রক্ত দিয়ে তৈরি—এই ইটগুলো তার সাক্ষী থাকুক।" প্রায় একই কথা বলেছিলেন রোকেয়া, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের মেয়েদের। বলেছিলেন, "এই দালানের জন্য বহু মাটি পুড়ে ইট হয়েছে, বহু ঝিনুক পুড়ে চুন হয়েছে, বহু গাছ কর্তিত হয়ে তক্তা হয়েছে।" রোকেয়া নেই, কিন্তু আজ সারাদেশের মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে আসছে তো।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের হাতের আলো শুধু আলো নয়—আগুনের ফুলঝুরি। ওই আলো থেকে জ্বলে উঠবে কোটি কোটি আলো।

"হয়তো স্যার, আপনি তখন থাকবেন না।"—তাঁকে বলি।

"না থাকলাম।" তিনি আবৃত্তি করেন ইকবাল থেকে—

আসবে সুরের হারানো রেশ
কিংবা সে আর আসবে না,

হেজাজ হাওয়া আসবে অশেষ
কিংবা সে আর আসবে না।
সীমান্তে আজ পড়ল আসি
এই ফকিরের দিনগুলি,
আসবে নতুন সুখী এদেশ
কিংবা সে আর আসবে না ॥

সে আর আসবে না, কিন্তু সুখী দেশ তো আসবে!

দৈনিক ভোরের কাগজ : ১৯৯৭

প্রবাসী আনন্দবাজার থেকে

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন : আবেদ খান

'মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়।' প্রথম যখন এই কথাটি শুনেছিলাম তখন স্বপ্নের পরিধি নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু এই সংশয়ের অপনোদন ঘটালেন প্রিয়দর্শন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। বাংলার অধ্যাপক। বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় উপস্থাপক, কবি, প্রবন্ধকার এবং সংগঠক হিশেবে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব এই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তিনি বলেছিলেন, আকাশই হল স্বপ্নের শেষ সীমা। সায়ীদ সেটা প্রমাণও করেছেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন তিল তিল করে। এই কেন্দ্রের পিছনে গত এগারো বছর ধরে তিনি দিয়ে চলেছেন শ্রম, স্বেদ আর সাধনা। কীভাবে এই কেন্দ্রের সূচনা হল—সে এক মজার কাহিনী।

আটাত্তর সালের জুলাই কিংবা আগস্ট মাসের কোনো-এক সন্ধ্যায় আমার সেগুনবাগিচার বাসায় আড্ডা বসেছিল। কথায় কথায় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলে উঠলেন এমন একটা কিছু করা উচিত যা তৈরি করবে সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষ। আড্ডা সমস্বরে বলল : 'উচিত তো বটেই, কিন্তু করার পথটি কী?' সায়ীদ বললেন : 'আমাদের দেশে পড়াশোনার পাট প্রায় চুকে গিয়েছে। ধরতে হবে ওই জায়গাটাই। মানুষকে সাহিত্য দর্শন এইসবের দিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডার খুলে ধরতে হবে চোখের সামনে। টেনে নামিয়ে ফেলতে হবে অন্তত্বের কালো পর্দা। তবে বুড়োদের দিয়ে হবে না। অজ্ঞানতা এবং মূর্খতা তাদের মজ্জায় ঢুকে গিয়েছে। এজন্যে চাই টগবগে তরুণ, যে দ্বিধাহীন চিত্তে পুরোনো আবর্জনা ঝেড়ে ফেলবে। প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, তাকে রক্ষা করবে।'

আমরা বললাম : 'তাহলে কী করতে হবে?'

'একটা আন্দোলন তৈরি করতে হবে—আলোকিত এবং সম্পন্ন-মানুষ তৈরির

আন্দোলন। এই আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টির জন্যে চাই একটি কেন্দ্র। এই কেন্দ্র থেকে সঞ্চারিত হবে অনুপ্রেরণা, সাহায্য, সহযোগিতা। এই কেন্দ্রে থাকবে বিশ্বসাহিত্যের যাবতীয় উপকরণ, অত্যন্ত সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, থাকবে মিউজিক লাইব্রেরি, থাকবে প্রকাশব্যবস্থা, সবরকম শিল্পের শাখা। এই কেন্দ্রে গড়ে উঠবে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ওপর পাঠচক্র, সেমিনার হবে, ওয়ার্কশপ হবে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে এক-একটি পাঠচক্র। প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাধ্যমিক পর্যায়, তারপর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হবে সেই পাঠক্রম।'

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ যখন এই কথাগুলো বলছিলেন তখন তাঁর গভীর দুই চোখে গোটা পৃথিবীকে আদ্যোপান্ত আবিষ্কারের তৃষ্ণা। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন : 'এজন্যে তো অনেক অর্থ দরকার। কে দেবে এত টাকা? অসম্ভব স্বপ্ন দেখছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। ইউটোপিয়ান স্বপ্নবিলাস।' দুম্ করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তিনি : 'এ আমি করবই। মানুষের মধ্যেও মানুষ থাকে। তাঁদের খুঁজে বের করতে হবে। এই কেন্দ্র হবেই।'

এই ঘটনার কয়েক মাস পর একদিন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ খবর দিলেন ঢাকা কলেজ সংলগ্ন এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টারের (এখনকার 'নায়েম') একটি কক্ষে শুরু হচ্ছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম অনুশীলন। হাজির হলাম আমরা কয়েকজন। সাতষট্টি বছরের প্রবীণ ছাত্র এবং রেডিওর সাবেক মহাপরিচালক জনাব আশরাফউজ্জামান খান দিলেন পঁয়ত্রিশটি টাকা। সেটিই হল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম অর্থ-সংগ্রহ। এই ঘটনাটি ১৯৭৮ সালের ১৭ ডিসেম্বরের।

সেই থেকে চলছে কেন্দ্র। পরিসর স্ফীত হচ্ছে—পরিচয়ের গণ্ডি প্রসারিত হচ্ছে। ১৯৮২ সালের ১৮ জুন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র একটি সুপরিসর ভবন ভাড়া নিল ইন্দিরা রোডে। ততদিনে কেন্দ্রের নিজস্ব গ্রন্থাগার হয়েছে, মিউজিক লাইব্রেরি হয়েছে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নিয়মিত ক্লাসও নেয়া হচ্ছে—বাড়ছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। দলে দলে ভিড় করছে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী।

১৯৮৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র চলে এল রাজধানীর কেন্দ্রস্থলের একটি ঠিকানায়—১৪, ময়মনসিংহ রোড—সোনারগাঁ হোটেল আর শেরাটন হোটেলের মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। ঠিকানাটি সম্পূর্ণ নিজস্ব, ঢাকা-নগর-করপোরেশনের বরাদ্দকৃত ভবন। সামনে প্রশস্ত আঙিনা। সেখানে সাজানো ফুলের বাগান, দুপাশে সারিবদ্ধ নানা ধরনের গাছ। এসব কেন্দ্রেরই সাজানো। পিছনদিকে দোতলা ভবনে আছে অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরি। এই ভবনটির একটি শাখা প্রসারিত হয়ে কম্পিউটার কক্ষ, বসার এবং অফিসঘর হয়েছে।

এ তো গেল ভবন-কাঠামোর কথা। এরপর কার্যক্রম। বিভিন্ন শিল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষাপদ্ধতি

এখানে অনুসরণ করা হয়। সপ্তাহ জুড়ে চলে কার্যক্রম। নির্দিষ্ট করা রয়েছে সময়। মন ও মননের উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রয়োজনে এখানে জ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলিকে উপস্থাপন এবং সকল বিষয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করার পরিকল্পিত পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে যে-সমস্ত বিভাগের কার্যক্রম চলছে তা হল : স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রাক-মৌলিক উৎকর্ষ বিভাগ, মৌলিক উৎকর্ষ বিভাগ, সাহিত্যচক্র, রাজনীতি চক্র, অর্থনীতি চক্র, আবৃত্তি চক্র, রবীন্দ্র অধ্যয়ন চক্র, অনুষ্ঠান বিভাগ, চারুকলা বিভাগ, চলচ্চিত্র বিভাগ। এই সমস্ত বিভাগে যোগদানের অন্যতম যোগ্যতা হচ্ছে জ্ঞানজিজ্ঞাসার ন্যূনতম তৃষ্ণা।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের গ্রন্থাগার বাংলাদেশের সেরা গ্রন্থাগারগুলির একটি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিরায়ত সাহিত্য থেকে শুরু করে বাংলাসাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জিতে সমৃদ্ধ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের গ্রন্থাগারটি। সর্বশ্রেণীর পাঠকের জন্যে গ্রন্থাগার উন্মুক্ত থাকে বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

কেন্দ্রের অনুষ্ঠান বিভাগটি অত্যন্ত সক্রিয়। প্রতিটি বিভাগের জন্যে মাসে একবার করে বড় আকারের অনুষ্ঠান হবেই এবং তাতে আমন্ত্রিত হয়ে আসবেন দেশের নামিদামি ব্যক্তিরা।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্যোগে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে মাসিক কিশোর পত্রিকা 'আসন্ন'। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন এবং অর্থনীতি ও রাজনীতিসংবলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে নিয়মিত। এছাড়া প্রকাশনা বিভাগের উদ্যোগে বের হচ্ছে বাংলাভাষা ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বইগুলো। প্রকাশনা বিভাগের মূল উদ্দেশ্য হল, বাংলাভাষা ও বিশ্বজ্ঞানের ক্রমাগত বই প্রকাশ করে যাওয়া।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একটা বড় অবদান হল আড্ডা। 'ক্যান্টিনে আড্ডা, সবুজ চত্বরে আড্ডা, খোলা বারান্দায় আড্ডা, সর্বত্রই আড্ডা। তরুণ-প্রবীণ কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, শিল্পী, সাংবাদিক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী সবাই আসছেন—নাড়ু-মুড়ি-পায়েস-চিঁড়াভাজা চলছে অবিরাম—আর চলছে অবিরাম আড্ডা।' আর-একজন কবির মন্তব্য : 'দিনে অন্তত একবার নিজের মুখোমুখি হই এখানে।' একজন সংস্কৃতিপ্রেমীর মন্তব্য : 'কোথাও কিছুই হচ্ছে না। তবু এখানে কিছু হচ্ছে।' কারো মতে : 'এটা হল বিখ্যাত হওয়ার মঞ্চ।'

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান স্কুল-কলেজ কর্মসূচি। দেশের সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে চালু হয়েছে এই পড়াশোনার কর্মসূচি। ইতোমধ্যে ছেচল্লিশটি জেলার স্কুল-কলেজে ছড়িয়ে পড়েছে এই কর্মসূচি। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠক্রম। বিশ্বের সেরা গ্রন্থাবলি এই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। পড়া হয়, আলোচনা হয়, মূল্যায়ন হয়, সার্টিফিকেট এবং পুরস্কার

বিতরণ করা হয় প্রতিটি স্কুল-কলেজের প্রতিটি শ্রেণীতে আলাদা আলাদা করে। পাঠক্রমের বইগুলো সরবরাহ করা হয় বিনামূল্যে। একমাত্র লক্ষ্য সম্ভাবনাময় পাঠক সৃষ্টি করা, আলোকিত শিক্ষিত নতুন প্রজন্ম তৈরি করা। এই লক্ষ্য সামনে রেখে সারাদেশের ছেচল্লিশটি জেলায় গড়ে উঠেছে একই ধরনের সুযোগসুবিধাসম্পন্ন ছোট ছোট বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ কেবল একটি কথাই বলেন : 'বিরাট সমৃদ্ধ ও আলোকিত জাতি সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন সম্পন্ন ও আলোকিত মানুষ, আর এই মানুষ গড়ে-তোলার জন্যে দরকার একটি দেশভিত্তিক আন্দোলন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এই আন্দোলনেরই উৎসস্থল। সব সমাজেই কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের সংখ্যা কম কিন্তু যাঁদের মধ্যে থাকে জ্ঞানের ব্যাপ্তি, উন্নত-মূল্যবোধ, জীবনোৎকর্ষ, আত্মমর্যাদার মহিমা। এসবকিছুর অসাধারণ বিকাশ সমাজকে রক্ষা করে, সামনের দিকে নিয়ে যায়। কেন্দ্র এই মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির আন্দোলন রচনা করেছে।'

গোড়াতেই বলেছিলাম : মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ নামের আটচল্লিশ বছর বয়স্ক সুপ্রিয় ব্যক্তিটি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তোলার ভিতর দিয়ে নিজের মাপটিই আমাদের জানিয়ে দিলেন। তাঁর স্বপ্ন যদি আকাশ স্পর্শ করে, তবে তিনিও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই দীর্ঘতর হবেন। স্বপ্নকে চ্যালেঞ্জ করে সত্যে পরিণত করার মতো ক্ষমতা থাকে ক'জনের?

১৯৮৯

স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়

শঙ্খ ঘোষ

চারদিক থেকে নানা খবর এসে পৌঁছয় আমাদের জীবনে, সে-খবরের বড় অংশটাই ভরা থাকে কেবল না-এর কথায়, বিপর্যয়ের কথায়, ভ্রষ্টতার কথায়। কোথায় কতখানি কলঙ্ক ঘটল, তারই ওপর আমাদের সর্বাত্মক ঝোঁক। কিন্তু সুন্দরের খবরও কি খবর নয়, স্বপ্নের খবরও কি খবর নয়? কোথাও যদি একটু সুস্থতার চিহ্ন দেখা যায় কখনো, যত সামান্যই হোক-না কেন সে-চিহ্ন, সেটাকেই কি তবে অনেকখানি খবর করে তুলতে পারি না আমরা? মন যখন ঝিমিয়ে আসে, নিষ্ক্রিয়তা যখন গ্রাস করে নিতে চায় শরীর, সবদিকে তাকিয়ে যখন মনে হতে থাকে আশা করবার কিছুই আর মানে নেই যেন, ওইরকম এক-একটা সুস্থতার বা স্বপ্নের চকিত খবরে হঠাৎ হয়তো মুছে যেতে পারে সব বিকলতা, জেগে উঠতে পারে মন, বিশ্বাস হতে পারে যে, স্বপ্ন আজও স্বপ্নই নয় শুধু।

বাংলাদেশে গিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে। প্রায় এগারো বছর পরে এই আবার বাংলাদেশে যাওয়া, কোনো কাজের দায় নিয়ে নয়, এমনি-এমনি। এগারো বছরে কতই-না বদল ঘটে গেছে পৃথিবীর! আর এই উপমহাদেশে সে-বদল আমাদের তাড়না করে ফিরেছে দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে, নিরাশা থেকে নিরাশায়। ভাবা নিশ্চয় বাতুলতা যে, সেই এগারো বছর আগেকার সম্পূর্ণ ছবিটাকেই ফিরে পাব আবার। এ তো হওয়ারই কথা যে ভিন্ন এক পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পৌঁছব। কিন্তু সে-ভিন্নতা কতদূর ভিন্নতা? সে কি আবারও কোনো হতাশার অতল গহ্বরের মধ্যে ফেলে দেবে আমাদের?

এমন নয় যে দুরবস্থার কোনো ছবি দেখিনি সেখানে, কেমন করেই-বা তা আশা করা যায়। দারিদ্র্যের, বিচ্ছিন্নতার, উগ্রতার নানারকমেরই ইশারা ছড়ানো আছে

এখানে-ওখানে, যেমন আছে এদেশেও। আতিথ্যের সহৃদয় সমাদরে আপ্লুত হতে-হতেও তার কিছু ছায়া ছড়িয়ে পড়ে মনে। কিন্তু এরই মধ্যে মাঝেমাঝে চোখে পড়ে এমন সব ঘটনা, এমন সব মানুষ, এমন সব ভিতর থেকে উঠে-আসা আন্তরিক উচ্চারণ, যে আরও একবার দু-চোখ ভরে স্বপ্ন দেখবার ইচ্ছে জাগে তখন।

আরও অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে এবার সেরকম বিশেষ এক স্বপ্নিল আয়োজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে হল, আগে কেন জানতে পারিনি এর খবর। এই দশ-বারো বছরে চেনাজানা আরও কতজনই তো ঘুরে গেছেন বাংলাদেশ থেকে, কারও কাছেই কেন শুনিনি এটা? যে-আয়োজনের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল যেন সত্যিই আমি দাঁড়িয়ে নেই সেখানে, যেন অলীক কোনো ঘটনা সেটা, তা কি আগে দেখেননি আর কেউ? না কি দেখেও তেমন উত্তেজনার বোধ হয়নি তাঁদের? তবে কি এটা তত বড় ঘটনা নয়, যত বড় করে মনে হচ্ছে আমার? না কি বাংলাদেশ বলেই আমি একটু বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছি, পক্ষপাতদোষে?

অবশ্য আরও তো একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। হয়তো অনেকেই জেনেছেন ওই আয়োজনের কথা, অনেকেই হয়তো গিয়েছেন সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে। অনেকেরই হয়তো চমকে উঠেছে মন, আর এখানে ফিরে এসে হয়তো-বা সে-কথা তাঁরা বলেওছেন কারো কারো কাছে। সবারই স্বর-যে আমার কাছে পৌঁছবে, এমন তো নয়। আমার এত উত্তেজনার খবরটাই-বা জানবে কেমন করে অন্যে? সবাইকে ডেকে যা বলতে ইচ্ছে হয়, সব সময়ে কি তা বলবার কোনো পথ পাই আমরা?

কথাটা প্রথম বলেছিলেন আবুল মোমেন, চট্টগ্রামের এক সন্ধ্যায়। বলেছিলেন স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের বেড়ে-উঠবার সমস্যার কথা। এদেশেও আমাদের অজানা নয় সে-সমস্যা। সিলেবাসের চাপে কুঁজো হয়ে-যাওয়া, প্রতিযোগিতার দৌড়ে দমবন্ধ হয়ে-যাওয়া ছেলেমেয়েরা অন্য কোনওদিকে তাকাবার অবসর পায় না আর, যতটুকু-বা পায় তা-ও টেনে নেয় দূরদর্শনের ঝলমলে পর্দা। কমিকস আর টিভি, এর বাইরে বেরোবার আর-কোনো উপায় রাখেনি পরিবেশ। কিন্তু ত্রাণের কি পথ নেই কোনো? কোনো প্রতিরোধ কি হতে পারে না এর? এই ভাবনা নিয়েই বাংলাদেশে একদিন হয়েছিল 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র'-র পত্তন, প্রায় পনেরো বছর আগে ছিল তার ক্ষীণ সূচনা, একজনমাত্র ব্যক্তিমানুষের চেষ্টায়। আর পরের কয়েক বছর জুড়ে সেই চেষ্টা দেশব্যাপী এক প্রতিষ্ঠানের চেহারা পেয়ে গেছে আজ, বাংলাদেশের শহরে-গ্রামে ছড়ানো আজ একশো চুরাশিটা তার শাখা, স্কুলের প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার ছেলেমেয়ে এখন তার সদস্য, বই পড়া, ছবি দেখা, গান শোনার সমৃদ্ধ আয়োজনের মধ্যদিয়ে নানাদিকে বেড়ে উঠছে তাদের মন।

এটা ঘটিয়ে তোলবার সংকল্প যে-মানুষটির মনে প্রথম জেগেছিল, ঢাকায় পৌঁছে কথা হল সেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সঙ্গে। নিছক অধ্যাপক ছিলেন

একসময়ে। বাবাও শিক্ষক ছিলেন বলে তাঁর মনে হয়েছিল, শিক্ষকতার চেয়ে বড় ব্রত জীবনে আর নেই। কিন্তু সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা অঙ্গে-অঙ্গে সমস্ত প্রত্যাশা থেকে অনেক দূরবর্তী করে দিল তাঁকে। মনে হয় তাঁর, অবস্থানের জড়তা না-ভাঙতে পারলে ঠিক-ঠিক চলবার পথে ছাত্রদের দীক্ষিত করবার কোনো উপায়ই নেই আর। সমস্ত পৃথিবীর বিকাশের সঙ্গে কতটুকু যোগ তৈরি হয় এদেশের বাইরের খোলা হাওয়ার সঙ্গে যথার্থ পরিচয়ের অভাবে কত আবদ্ধ হয়ে আছে এদের মন। কে ভাঙবে সেই আবদ্ধতা? কোনো আয়োজন কি আছে কোথাও শিক্ষা আর মূল্যবোধের সমস্তরকম বিশৃঙ্খলা আর উদভ্রান্ততা থেকে সরিয়ে এনে ছেলেমেয়েদেরকে একটা অনুকূল পরিবেশ গড়ে দিতে পারবে কে, স্বপ্নের দিকে এগোবার জন্য অনুকূল? আত্মমর্যাদার বিকাশ ঘটে যে-চর্চার মধ্যদিয়ে, কে করে দেবে তার আয়োজন?

কোনো সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানের ভরসায় না-থেকে আবু সায়ীদ অল্প কয়েকজন মানুষকে নিয়ে নিজেই একদিন শুরু করেছিলেন সেই আয়োজন, ছেলেমেয়েদেরই কাছে জ্ঞানের মুক্তিকে পৌঁছে দেওয়ার আয়োজন। নাম দিয়েছিলেন 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র', যদিও কেবল সাহিত্যেরই জন্য নয় সে-কেন্দ্র; সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের সমস্ত দিকেই এতকাল জুড়ে যেসব সিদ্ধি ঘটেছে দেশে-বিদেশে, স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছে তার পরিচয় বয়ে নিয়ে গেলেন তাঁরা। লাইব্রেরি তো ধরে নেয় যে, সকলে এসে পৌঁছবে তার কাছে, সে নিজে থাকবে স্থির। কিন্তু ওঁরা তা ভাবেননি। ওঁরা ভেবেছেন, লাইব্রেরিই পৌঁছবে সকলের দুয়োরে-দুয়োরে। এক-এক ক্লাসের এক-এক বয়সের উপযোগী কিছু বইয়ের তালিকা করে নেন তাঁরা, সে-বই পৌঁছে দেন ছেলেমেয়েদের হাতে, এক-একখানি বই পড়ে ফেলবার পর তাদের সমবেত করেন কোনো সাপ্তাহিক বৈঠকে, ছোট-ছোট পড়ুয়ারা তাদের পঠিত বই নিয়ে কথা বলে পরস্পর, করে তর্ক, ভাবনা বিনিময়। উৎসাহ দেওয়ার জন্য তাদের পুরস্কৃতও করে কেন্দ্র, বই পড়বার জন্য বই পুরস্কার। তারপর, শুধু আর বইপড়াই নয়, গানের বা ছবির বা চলচ্চিত্রের আস্বাদন করতে হয় কীভাবে, তারও জন্য এইসব ছেলেমেয়ে পেয়ে যায় যথাযোগ্য উপকরণ, কোনো বিশেষজ্ঞ এসে একটি-দুটি প্রাথমিক কথা বুঝিয়ে বলেন তাদের, তারপর শোনানো হয় গান কিংবা দেখানো হয় ছবি। এইভাবে জানায়-শোনায়, গল্পে-গুজবে, আনন্দে-উৎসবে ভরে ওঠে দেশব্যাপী একটা সঙ্ঘ, তরুণ সঙ্ঘ। সে তরুণেরা একদিন বলতে পারেন পরে : 'জানছি নিজে আমরা কতখানি। নিজেকে জানার এ আনন্দ তুলনাহীন। .... কেন্দ্র আমাদের সাহসী করে তুলছে, যুক্তিনিষ্ঠ করে তুলছে। অন্তত নিজের কথাকে, নিজের চিন্তাকে নির্ভয়ে বলতে শেখাচ্ছে। মনের ভিতর প্রতি মুহূর্তে জন্ম নিচ্ছে প্রশ্ন, কৌতূহল, জিজ্ঞাসা। — বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আমাদের স্বপ্নিল ভালোবাসা।'

কোনো কি প্রতিরোধ ছিল না এই আয়োজনের? তা কি আর হয় না কি, প্রতিরোধ তো থাকবেই। অভিভাবকেরা ভেবেছেন, সময় নষ্ট করে স্কুলের পড়াশোনার ক্ষতি ঘটে যাচ্ছে অবিরত, সন্দিগ্ধরা ভাবছেন কোনো গোপন পথে বৈদেশিক টাকার ষড়যন্ত্র চলছে পিছনে। কিন্তু এসব ভাবনার সঙ্গে অকারণে কোনো লড়াইয়ের চেষ্টা করেননি আয়োজকেরা, তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে প্রাথমিক স্তরে একেবারে অবশ্যম্ভাবী এই প্রতিক্রিয়া। এ-অপধারণা প্রতিহত করবার চেষ্টায় বলক্ষয় বা কালক্ষয় করবার মানে নেই কিছু, বুঝেছিলেন তাঁরা। আর সেইটে বুঝেছিলেন বলেই অল্পে-অল্পে একদিন স্তিমিত হয়ে আসে এসব বিরোধিতা, অনেকেই আজ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এ-কেন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ান। আবু সায়ীদের মতো হয়তো তাঁরাও আজ বিশ্বাস করেন যে, 'বিরাট এবং সমৃদ্ধ ও আলোকিত জাতি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সম্পন্ন-মানুষ তৈরি করা। আর এজন্য দরকার একটি দেশভিত্তিক আন্দোলন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এই আন্দোলনেরই উৎসস্থল।'

একজন ব্যক্তিমানুষের স্বপ্ন নয়, তিনি ঘটিয়ে তুলেছেন সবই, তিনি আর তাঁর বন্ধুরা। আর এতটাই যদি ঘটে উঠতে পারে, অন্যসব হীন সংকীর্ণতার আয়োজনকে কেনই-বা তবে মুছে দিতে পারবে না মুক্তবুদ্ধির দিকে এগিয়ে-যাওয়া এইসব ছেলেমেয়ের দল, কোনো একদিন? পারবে বলেই ভাবতে ইচ্ছে হয় না আমাদের?

আজকাল : আগস্ট ১৯৯৮

আলোকচিত্র : এম. এ. তাহের

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। অধ্যাপনা করেছেন তিনি তিরিশ বছর—১৯৬২ সাল থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত। অধ্যাপক হিসেবে তাঁর খ্যাতি কিংবদন্তিতুল্য। ষাটের দশকে বাংলাদেশে যে নতুন ধারার সাহিত্য আন্দোলন হয়, তিনি ছিলেন তার নেতৃত্বে। সাহিত্য পত্রিকা 'কণ্ঠস্বর' সম্পাদনার মাধ্যমে সেকালের নবীন সাহিত্যযাত্রাকে তিনি নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা দিয়ে সংহত ও বহমান করে রেখেছিলেন এক দশক ধরে। বাংলাদেশে টেলিভিশনের সূচনালগ্ন থেকে মনস্বী, রুচিমান ও বিনোদন-সক্ষম ব্যক্তিত্ব হিশেবে আবির্ভূত হন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। টেলিভিশনের বিনোদন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় তিনি পথিকৃৎ ও অন্যতম সফল ব্যক্তিত্ব।

এইসব ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সাহিত্যচর্চায় নিবিষ্ট। কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটক, অনুবাদ, জর্নাল, জীবনীমূলক বই ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থভাণ্ডারও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ২৭টি।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ব্যক্তিত্বের প্রায় সবগুলো দিক সমন্বিত হয়েছে তাঁর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সংগঠক সত্তায়। তিনি অনুভব করেছেন যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের প্রয়োজন অসংখ্য উচ্চায়ত মানুষ। 'আলোকিত মানুষ চাই'—সারা দেশে এই আন্দোলনের অগ্রযাত্রী হিশেবে সাতাশ বছর ধরে তিনি রয়েছেন সংগ্রামশীল। ২০০০ সাল থেকে সামাজিক আন্দোলনে উদ্যোগী ভূমিকার জন্য তিনি দেশব্যাপী-অভিনন্দিত হয়েছেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধ আন্দোলন, পরিবেশ দূষণ-বিরোধী আন্দোলনসহ নানান সামাজিক আন্দোলন তাঁর নেতৃত্বে প্রাণ পেয়েছে।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, পিতা মৃত আযীম উদ্দিন, জন্মস্থান : পার্ক সার্কাস, কলকাতা। জন্মসাল: ২৫ জুলাই ১৯৪০। পৈতৃক নিবাস : কামারগাতি, কচুয়া বাগেরহাট। বর্তমান ঠিকানা: ৩৬৭/১/এ ফ্রিস্কুল স্ট্রিট, ঢাকা। শিক্ষা : মাধ্যমিক : পাবনা জিলা স্কুল (১৯৫৫); উচ্চমাধ্যমিক : প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ, বাগেরহাট ১৯৫৭; স্নাতক সম্মান (বাংলা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬০), স্নাতকোত্তর (বাংলা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬১)। পেশা : অধ্যাপনা, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

পুরস্কার : জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার (১৯৭৭), মাহবুব উল্লাহ ট্রাস্ট পুরস্কার (১৯৯৮), রোটারি সিড পুরস্কার (১৯৯৯), বাংলাদেশ বুক ক্লাব পুরস্কার (২০০০)। র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার : (২০০৪) একুশে পদক (২০০৫)।

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET